সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য

অধ্যাপক ড. হাসান জামান

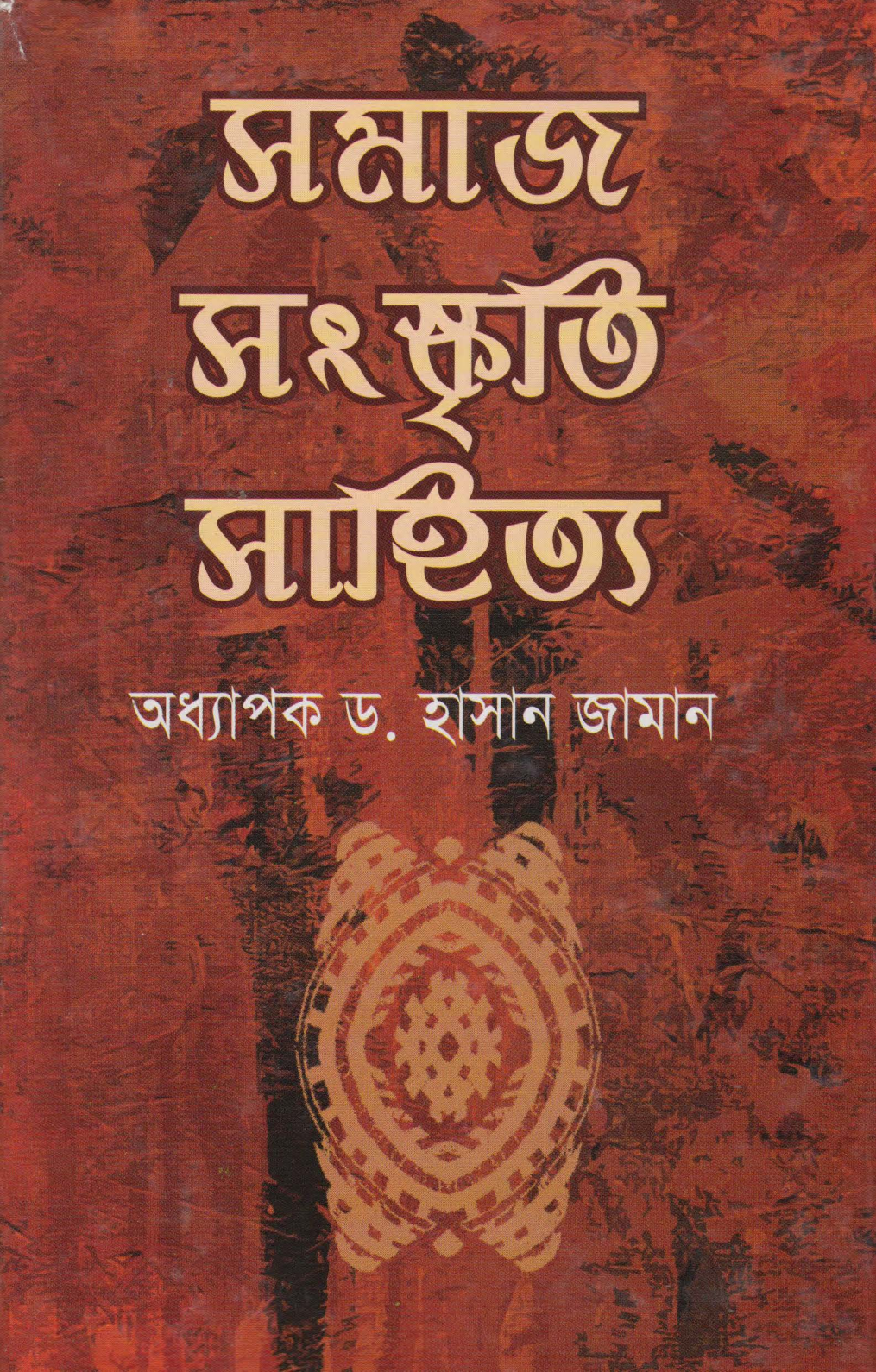

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য

www.pathagar.com

সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য

অধ্যাপক ড. হাসান জামান

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.com

স্বত্ব
লেখক

জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১২

প্রচ্ছদ
আক্কাছ খান

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম
জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষর বিন্যাস
শাহীন কম্পিউটার
ইসলামী টাওয়ার (৪র্থ তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর-১৯৬৭ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ জুন-১৯৮০ইং

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি. কে. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেস রেল গেট, বড় মগবাজার, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
২০০ টাকা U.S. $-7.00

Samaj Sangskriti Sahita(Society Culture Literature)
Writing By Dr. Hasan Zaman
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitarani, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-74-5

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

'সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর হাসান জামানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সঙ্কলন গ্রন্থ। গ্রন্থের শিরোনামেই বুঝা যায় আজকের বিশ্বের বিভিন্ন বহুল আলোচিত বিষয়ে লেখক এ গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন।

লেখকের ভূমিকা থেকেই জানা যায় এ গ্রন্থে সঙ্কলিত অধিকাংশ প্রবন্ধই তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এ গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় লেখক জীবিত থাকাকালে বাংলা একাডেমী থেকে। পরবর্তীকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিবারই প্রকাশের পর পর দ্রুত এর সব কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। বহু দিন পর জ্ঞান বিতরণীর জনাব সহিদুল ইসলাম এ গ্রন্থ খানি প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন এটা খুশীর কথা। অতীতের মত এবারও এ গ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আমি আশা করি।

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
০৫/০১/২০১২

আবদুল গফুর
ফিচার সম্পাদক

www.pathagar.com

আমাদের কথা

"সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য" ড. হাসান জামানের বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ-সংকলন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক ড. হাসান জামান এ-সব প্রবন্ধে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেগুলো যেমন ইসলাম সম্পর্কে, তেমনি আধুনিক সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। ইসলামকে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের পটভূমিতে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কথা স্বীকার করেও আমরা বলতে পারি তাঁর কোন কোন বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণের অবকাশ আমাদের রয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য, গ্রন্থে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব।

প্রায় দু'দশক পূর্বে বাংলা একাডেমীর কল্যাণে এ গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতদিনে আমরা এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারছি, এজন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরানা আদায় করছি। বিশিষ্ট দার্শনিক-সাহিত্যিক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজরফ 'প্রসঙ্গ-কথা' শিরোনামে গ্রন্থখানির জন্যে একটি মুখবন্ধ লিখে এর মূল্য আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা তাঁকে এজন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ঢাকা/২৬-৬-১৯৮০

আবদুল গফুর

আবাসিক পরিচালক

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

অধ্যাপক ড. হাসান জামান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মহলে একটা অতি পরিচিত নাম। সাহিত্য, শিল্প, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জীবনের নানাবিধ দিক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণাজাত আলোক পতিত হয়েছে আমাদের তমদ্দুনের নানা ক্ষেত্রে। এরূপ তত্ত্ব এবং তথ্যের একত্র সমাবেশ অতি অল্পসংখ্যক লেখকের মধ্যে পাওয়া যায়। এ সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তকের বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে তিনি না করে, কালচারকেই ধর্মের এক অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। ধর্ম বলতে তিনি ইসলাম ধর্মের মত এক সর্বাঙ্গীণ ধর্মকেই গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে নানাদিক রয়েছে এবং সেই এক-একটা দিকের পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা হচ্ছে কেবলমাত্র আমাদের সমাজে নয় এ দুনিয়ার সর্বত্র। তার ফলে যে ধর্মের যোগ ছিল মানব-জীবনের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠ, সেই ধর্মই মানব-জীবন থেকে পৃথক হয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতির পটভূমিকায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। উদাহরণস্থলে বলা যায়, ইসলামের মত সর্বাঙ্গীণ ধর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জন্যে এবং গভীরভাবে গবেষণা করার জন্যে রয়েছে খুব জোরালো তাগিদ। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগকে ভাবা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। তার কারণ কি? সমগ্র মধ্যযুগে ইউরোপের বুকে যে ধর্ম জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, তাতে ব্যষ্টির পক্ষে স্বকীয় অনুপ্রেরণার ফলে কোন গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ-জন্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বুকে যে রেনেসাঁ দেখা দেয়,— তাতে ধর্মকেই ব্যষ্টি-জীবনের স্বাধীনতা হরণের জন্যে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হয়। তার ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন শাখা ধর্ম-রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব লাভ করে। তাতেও আপত্তি করার মত কোন কারণ থাকত না, যদি না বাস্তবক্ষেত্রে তার ফল মারাত্মক হয়ে না দাঁড়ায়। স্বকীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করে এ মনোভাব ব্যষ্টি-জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে

www.pathagar.com

ধর্মকে নানাবিধ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। প্রথম পর্যায়ে মধ্যযুগীয় পোপ-প্রধান ধর্মের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে খৃস্টধর্মে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হলেও, এবং তার পরিণতিতে ষোড়শ শতাব্দীতে রিফরমেশন আন্দোলন দেখা দিয়ে মার্টিন লুথার কর্তৃক অপর এক অসহিষ্ণু ধর্মে পরিণত হয়—অপরদিকে মধ্যযুগীয় খৃস্টধর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে রাজনীতিতে ব্যষ্টি যে স্বাধীনতা লাভ করে তার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ গৃহীত হয় তার মধ্যে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্র ছিল সত্যিই, তবে ধর্মীয় প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে তার মধ্যে নিষ্ঠার চেয়ে শ্লোগানের প্রভাব ছিল বেশি। এ জন্যে সামন্তবাদের কাঠামো গঠিত সমাজ-জীবন এ বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে, তার সাক্ষাৎ বংশধররূপে যে প্রজাতন্ত্রীয় সমাজ গঠিত হয়েছিল তা মানব জীবনকে নানাবিধ শোষণ ও শাসন থেকে মোটেই মুক্ত করতে পারেনি। এত রাষ্ট্রের প্রতি মানব-জীবনের শ্রদ্ধা ক্রমেই অন্তর্হিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার বিপ্লবে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাতে রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যমানকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। রাষ্ট্র হয়ে পড়ে নিরেট জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণভাবে অচেতন ও গুণবিহীন এক প্রতিষ্ঠান।

রেনেসাঁর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের যে সব দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়, তার মধ্যে ইংল্যান্ডের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তার দিশারী হয়ে ফ্রান্সিস বেকন যে সব বুথ (Idol) মানব-মানস থেকে উচ্ছেদ করে গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করার জন্যে আহ্বান করেছিলেন, তাতে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় সংস্কার পরিত্যাগ করার নির্দেশ ছিল Idola Tribus, Idola specus বা Idola Theater এ তিন পর্যায়ে বুথের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার ছিল কার্যকরী। কাজেই পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় অনুষঙ্গ সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত হয়। বৈজ্ঞানিক জগতে কোন মূল্যমানের স্থান থাকে নি। রেনেসাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, স্পেনের সার্ভেনটীস বা ইংল্যান্ডের শেক্সপীয়র যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে পূর্বোক্ত স্রষ্টা তার সৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্যের পরিবর্তে প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি রোমাঞ্চকারী মূল্যমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অপরদিকে শেক্সপীয়র পাপপুণ্যের বিচারের ক্ষেত্রকে পরকাল থেকে টেনে এনে একালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাচীন গ্রীকদের অনুসরণ করে কোন আল্লাহ বা ভগবানের বিচারের প্রত্যাশা থেকে মানব-মনকে মুক্ত করে, এ দুনিয়ায়ই—পুণ্যের ফল ও পাপের শাস্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তাতেও আপত্তির কোন কারণ ছিল না। তবে পরবর্তীকালে তার প্রদর্শিত এ Poetic justice-এর নীতি অন্যান্য কবি বা

www.pathagar.com

সাহিত্যিকগণ অনুসরণ করেননি। ক্রমেই এ প্রত্যয়ে শিথিলতা দেখা দেয়। Industrial Rivolution বা শিল্প বিপ্লবের ফলে আইন করে একদল লোকের জমিজমাকে গোচারণ ভূমিতে পরিণত করে—তাদের বাধ্য করে নানাবিধ কারখানায় দিন মজুরী গ্রহণ করতে যে সব আইন প্রণীত হয়েছিল,—তাতে মানব-দরদী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আর্তনাদ ছিল মর্মস্পর্শী : What man has made of man. তবে তিনিও শিল্পের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যমানগুলোকে স্পষ্টভাষায় স্বীকৃতি দান করেননি। এ ভাবে শিল্প থেকেও মূল্যমানগুলো ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে, অসকার ওয়াইল্ড অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে সমর্থ হলেন—Art for art sake. অতি আধুনিক কালে—ফরাসী কবি বোদলেয়ার আর্টকে এ বিশ্বের জঘন্যতম রূপ প্রদর্শনের এক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে—আল্লাহর অনস্তিত্ব প্রমাণ করা, এবং যে সব মূল্যমান ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে শ্রদ্ধ লাভ করে এসেছে, এগুলোকে উপহাস করা। তার ফলে আর্ট হয়ে পড়েছে মূল্যমানের এক ভয়ানক শত্রু।

সাম্যবাদী মহলে আর্টের দুটো সংজ্ঞাই প্রচলিত। আর্ট হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের ধারালো অস্ত্র। অপরটি : আর্ট হচ্ছে একটা সংবেদনশীল সমাজ সচেতন সত্তার ওপর সমাজের অন্তর্গূঢ় সত্তার প্রতিফলন। প্রথমোক্ত সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— আর্টের সঙ্গে মূল্যমানের কোন যোগই নেই। শ্রেণী সংগ্রামকে সফল করতে হলে আর্ট যে কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলির সেই সুপরিচিত নীতি—The end justifies the means-ই অবশ্যই গ্রহণীয়। দ্বিতীয়টিতে আর্টকে বলা হয়েছে সমাজের অন্তর্গূঢ় সত্তার প্রতিফলন। সে প্রতিফলন হবে সমাজ-সচেতন সত্তার ওপর। সে সত্তা সমাজ-সচেতন না হলে তাকে আর্ট বলা যাবে না। সে সত্তা যদি প্রকৃতি-সচেতন হয় অথবা আত্মসচেতন, তাহলে তাকে আর্ট বলা যাবে না। কাজেই আর্ট বা সাহিত্য হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রনীতির মত এক মাধ্যম মাত্র—তার স্বকীয় স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই।

এভাবে মানব-জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে তার এক-একটা দিকের বিকাশের জন্যে অনুশীলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। তার জন্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় :

জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি—

দণ্ডে দণ্ডে লয়—

www.pathagar.com

আপাততঃ কোন লয় আমাদের কাছে প্রতিভাত না হলেও, বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ শক্তির ভবিষ্যৎ ব্যবহার নিয়ে যে আশংকা দেখা দিয়েছে, তার শান্তির জন্যে কোন মন্ত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরলোকগত দর্শন তত্ত্ববিদ নাস্তিক্যবাদী ও মানবতাবাদী বার্ট্রান্ড রাসেল তাই নৈতিক জীবনে বিজ্ঞানের অনধিকার প্রবেশকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণামতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর প্রয়োগ হবে নৈতিক মূল্যমানের আলোকে। তবে যদি নৈতিক মূল্যমানকেও অস্বীকার করা হয়? তার উত্তর রাসেল দিতে যাননি। কাজেই আধুনিক বিশ্বে দেখা দিয়েছে যে দ্বন্দ্ব তাকে অম্লানবদনে মানব জীবনের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের দ্বন্দ্ব বলা যায়।

জীবনকে এভাবে খণ্ড খণ্ড করে দেখার ফলে, শুধু যে রাজনীতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা নয়, জীবনের এ খণ্ডতা-চেতনার ফলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার দ্বন্দ্ব, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা মানব-জীবনে দেখা দিয়েছে। এ-সব সমস্যারই নানাবিধ ভৌগোলিক সংস্করণ উপ-সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাদের সমাধানের জন্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আজকের দুনিয়ায় চিন্তান্বিত।

অধ্যাপক ড. হাসান জামান বর্তমান পুস্তকে এসব সমস্যারই নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—এ সব সমস্যাগুলো পৃথকভাবে আলোচনা না করে মানব জীবনের সামগ্রিক রূপের আলোকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। তা থেকে দেখা যাবে—একমাত্র সত্যিকার ধর্মকে জীবনপথের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করলে, সে সব সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে পড়ে। মানুষের পক্ষে এ দুনিয়ায় মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে তাকে এ নিখিল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এমন এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে, যিনি এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারীরূপে তাকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে মহৎ থেকে মহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যিনি মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিভূ হিসেবে এ কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে। মানুষকে তাই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে—তাঁরই এ সৃষ্টিকে সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে এই : এ বিশ্বের সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র সে সৃষ্টিকর্তার। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এসেছে বলে, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন সম্পদ তার প্রয়োজনমত ভোগ করতে পারে বা ভোগ-দখলে রাখতে পারে। তবে তাকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করতে হবে যে, সে এ-সব সম্পদের মালিক নয়—সে ভোগ দখলকারী বা Custodian মাত্র। তার ইচ্ছামত এ সম্পদকে সে

www.pathagar.com

যেমন নিজে ভোগ করতে পারে না তেমনি, অন্য কাউকে এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতেও পারে না। তার ফলে অবশ্য রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির জীবনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা autonomy থাকবে না সত্য, তবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বেরও কোন সুযোগ থাকবে না। রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার তিনি রাষ্ট্রকে সেই মূল স্রষ্টারই নীতি রূপায়ণের এক মাধ্যম হিসেবে গণ্য করবেন এবং যাতে সেই স্রষ্টার সর্ববিধ গুণাবলী সম্যকভাবে বিকাশ লাভ করে তার জন্যে আজীবন সাধনা করবেন। বিজ্ঞানবিদ এ বিশ্বের গুঢ় রহস্য আবিষ্কারে মনোনিবেশ করবেন এবং সে আবিষ্কৃত নীতিকে সে স্রষ্টারই সবচেয়ে প্রিয় মানব নামক বান্দার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে ফলিত রূপ দেবেন। শিল্পী ও সাহিত্যিক মানব-জীবনের মধ্যে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে—তা তাদের অংকনের মাধ্যমে পরিস্ফুট করবেন এবং কোন্ পথে মানব-জীবন চরমভাবে বিকাশ লাভ করে—তার ইঙ্গিত দেবেন। মনস্তত্ত্ববিদ মানুষের আদি বৃত্তির স্বরূপ উদঘাটন করবেন এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষ কি চায় তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন। তাতে একদিকে মানুষ যেমন তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে তার জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র বা সাহিত্য কোন পথ অবলম্বন করে সফল হতে পারে তারও নির্দেশ দিতে পারবে।

অধ্যাপক ড. হাসান জামান এ-সব সমস্যারই সমাধান প্রসঙ্গে বাংলাদেশবাসীর মুসলিম সমাজের নিজস্ব কতগুলো সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন— বাংলাদেশের কেন, এ ভারতের মুসলিমদের তমদ্দুন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী তমদ্দুন নয়। এ পার্থক্য এ শতাব্দীতে মরহুম মনীষী আবুল হাশিম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপরে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ ইসলামের মূলনীতির আলোকে ওগুলো ছাড় নিয়ন্ত্রিত হলে তাতে নিষিদ্ধ হওয়ার মত কিছুই নেই। ইকবাল সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে, তিনি ইসলামের সেই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। ইকবাল এ জগতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাকে যেমন প্রকৃত গণতন্ত্র বলে স্বীকার করেন নি, তেমনি মোল্লাতন্ত্রকেও কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁর জীবন-দর্শনের মূলমন্ত্র হচ্ছে খুদীর পরিচয়। ব্যষ্টি তার খুদী বা আত্মসত্তার সঠিক পরিচয় পেলে সে অতি সহজেই ইনসানে কামিল হতে পারে, তেমনি জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র সে-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মুসলিম জীবনে আবার কিভাবে সে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা যায়—তার জন্যে ইজতিহাদের যে প্রয়োজন, তা স্পষ্ট ভাষায় অধ্যাপক হাসান জামান বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন। তবে ইজতিহাদ কোনকালেই কুরআন-উল-করীম বা হাদীসের বিপরীত কোন মতবাদ গ্রহণ করতে পারে না এবং ইজতিহাদ করার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজন।

তবে ভূমিকায় ব্যক্ত তাঁর কোন কোন মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার কিছুটা অবকাশ রয়েছে। তিনি বলেছেন— "ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্তবাদ, ধনবাদ ও সমাজবাদ সামাজিক বিবর্তনের এক-একটা স্তর ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পন্থামাত্র" (পৃষ্ঠা ২০)। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এ সকল মতবাদকে মোটেই স্বীকার করেনি। ওগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কতগুলো মাধ্যম বা Category মাত্র। এ দুনিয়ায় কোনকালেই সামগ্রিকভাবে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র বা সাম্যবাদ দেখা দেয় নি। সামন্তবাদের প্রাধান্যের সময়ও নানাদেশ কৃষির স্তরে ছিল এবং ধনবাদের স্তরও সামন্তবাদের পর্যায়ে ছিল। বর্তমানে সাম্যবাদের নামে যে শোরগোল চলছে তা সত্ত্বেও এ দুনিয়ার সকল মানুষ তাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেনি। এখনও নানাদেশে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক মতবাদ রয়ে গেছেই। সালামের দৃষ্টিতে এগুলো হচ্ছে—মানব-মানসের কতগুলো বিষয়ীমুখীন (Subjective) ধারণা, যাদের মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতার গতিকে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

এরূপ দু'একটা বিষয়ে তাঁর মতামতের সঙ্গে আমরা একমত হতে না পারলেও—এ পুস্তকের অন্তর্গত অন্যান্য সকল বিষয়ের সঙ্গে আমরা একমত। পুস্তকখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ইতোপূর্বে প্রকাশিক হওয়া উচিত ছিল। যা'হোক ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা এ মহৎ কাজে হাত দিয়ে আমাদের সমাজের এক মহা-উপকার করেছেন।

মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	ভূমিকা	১৫
১.	ইসলামী সংস্কৃতি	৩১
২.	জীবন-দর্শনে ধর্মের ভূমিকা	৪২
৩.	প্রগতি কোন্ পথে	৪৭
৪.	অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম	৫১
৫.	আগামী দিনে ধর্মের ভূমিকা	৫৩
৬.	ইসলামের জীবনদর্শন	৫৬
৭.	বিশ্বদৃষ্টি : মার্কসবাদ ও ইসলাম	৬২
৮.	সাহিত্যের ভবিষ্যৎ	৭৫
৯.	পুঁথি-সাহিত্যের ভূমিকা	৮৩
১০.	ইকবালের জীবনদর্শন	৮৭
১১.	ইকবাল-সাহিত্যে সমাজদৃষ্টি	৯৪
১২.	ইকবাল ও মুসলিম চিন্তাধারার কয়েকটি কথা	১০১
১৩.	ইসলামী সমাজ গঠনে ইজতিহাদ	১০৯
১৪.	লেখক ও তাঁর সামাজিক দায়িত্ব	১২৫
১৫.	শিল্পকলা ও সাহিত্যের সমালোচনা	১৩৩
১৬.	সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য	১৪৫
	গ্রন্থ-সূত্র	১৭৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে এ বইতে স্থান পেল। এগুলো 'আজাদ', 'মোহাম্মদী', 'মাহেনও', 'পূবালী', 'বিবর্তন', 'মীনার', 'তাহযীব', 'লেখক সংঘ পত্রিকা', 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা', 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী', 'নয়া দুনিয়া', 'আজ' ও 'সৈনিক'-এ প্রকাশিত হয়। 'ইসলামী সংস্কৃতি' প্রবন্ধটি অবশ্য ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পরিবেশিত হয়। 'লেখক ও তাঁর সামাজিক দায়িত্ব' প্রবন্ধটি 'Congress for Cultural Freedom'-এর সেমিনারে পাঠ করা হয়। আর একটি কথা— ইকবাল সম্পর্কে সাধারণ একটি আলোচনাও এ বইতে স্থান পেয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানে সংস্কৃতির বাইরের রূপটাকে অনেক সময় অসম্ভব রকম গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে বাহ্যিক সাদৃশ্য বা পার্থক্য দুই সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য নির্দেশ করে। আদর্শগত সংস্কৃতির বেলায় কিন্তু এ কথা প্রয়োগ করা চলে না। বিভিন্ন সমাজের নানান উপকরণ, রীতিনীতি ও সংস্কার আদর্শিক সংস্কৃতির মাল-মশলা যোগায় মাত্র। এদিক দিয়ে দেখলে, আদর্শিক সংস্কৃতি যে কেবল দুনিয়ার সব জাতির ভাষা ও সমাজকেই স্বীকার করে নেয় তা'ই নয়, নিবিড়ভাবে আত্মগত করে নেবার জন্য থাকে সদা নিয়োজিত এবং আদর্শের বা বিশ্বদৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুরটি এর মাঝে অনুরণিত হয়। ভিন্ন দেশের হলেও তা আদর্শের আওতায় নিজস্ব রূপ ধারণ করে। এক-একটি সংস্কৃতির মধ্যে যেমন বাহ্যিক রূপ ও দেশের ধাত ফুটে ওঠে, তেমনি আদর্শের নিজস্ব ভঙ্গিমার পূর্ণ স্বাক্ষরও বিদ্যমান থাকে। ইসলাম এমনি একটি আদর্শিক সংস্কৃতি। এর জীবনদর্শন তওহীদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ থেকে যে মানবিকতা ও দায়িত্ববোধের জন্ম হয়, তা হলো এ দর্শনের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক দিকে এর পরিবেশ প্রয়োজনানুগ বাস্তব রূপায়ণ না হলে এ জীবনাদর্শের প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। আর এ শুধু মুখের কথায় বা ঘোষণায় নয়— কর্মস্থলে ও

www.pathagar.com

কার্যপদ্ধতিতে জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে সত্য। চলিষ্ণু সমাজও বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদর্শের রূপায়ণ না হলে বাংলাদেশের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উভয়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আদর্শিক কার্যক্রম রূপায়ণের মধ্যে সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সাহিত্য মানুষের সংবেদনশীল প্রেরণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন। সৃজনশীল মহৎ সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতঃ অনুভূতি ও আনন্দ এবং মানবিকতা ও ইনসাফের বাণী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীলতা তাই কেবল আনন্দের বাহন নয়, মানব-কল্যাণেরও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। আর যা আনন্দ দান করবে তা'ই শুধু সৃজনশীল, একথা খুব যুক্তিসিদ্ধ নয়। মানব-কল্যাণ ও শালীনতাই সৃজনশীলতার মাপকাঠি হওয়া উচিত। তাই মানব-মনে আনন্দ দানের সাথে সাথে, মানব-সমাজের সুষ্ঠু সংগঠনের প্রশ্নটি সংবেদনশীল সাহিত্যিকের মনে দাগ না কেটে পারে না। আমাদের সাহিত্যিকদেরকে দু'দিকেই সমান সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাহিত্য সমালোচকদেরও এ-কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন। যথাসম্ভব উদার ও দলমত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে কাজে হাত দিতে হবে। শোভনতা ও শালীনতার খাতিরে, 'কেল্লা ফতে' মনোবৃত্তি সর্বাংশে বর্জনীয়।

সাহিত্যের উন্নয়নে বাংলা ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ভাষাও সাহিত্য এবং সম্ভবমত অন্যান্য বিদেশী ভাষাও সাহিত্যের চর্চা বাড়ানো আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। নইলে সংকীর্ণতা ও আত্মবদ্ধতা ঘুচবে না। এ-কথা সবাই জানেন যে, ক্লাসিকাল ভাষাও সাহিত্যে জ্ঞানের অভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে মহান সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ত পিছিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য আরবি ও ফারসীর চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর যাঁরা ইসলামী দর্শন সম্পর্কে গবেষণা করতে চান, তাঁদের পক্ষে এ দুটো ভাষা ছাড়াও ফরাসী ও জার্মান ভাষায় দক্ষতা নিতান্ত অপরিহার্য। আমাদের সংস্কৃতিতে ফারসীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কারণ এ ভাষা উপমহাদেশের মুসলিম সাংস্কৃতিক বিন্যাসের প্রধান বাহন ছিল। কাজেই আমাদের সাহিত্যিকদের পক্ষে এ ভাষা চর্চা বাদ দিয়ে রাখা চলে না। বিশেষ করে, যাঁরা ইতিহাস ও বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেন, তাঁদের পক্ষে আরবি ও ফারসী ভাষাও শিক্ষা করা উচিত। কারণ এর ফলে আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যেমন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, তেমনি সংকীর্ণতা হীনমন্যতারও অবসান হবে। এ সম্পর্কে আমি শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সুপরিকল্পিতভাবে দেশী-বিদেশী ক্লাসিক ও অন্যান্য বিদেশী বই-এর অনুবাদ অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের উন্মেষের পথে অনুবাদ যেমন মহামূল্যবান, তেমনি বাংলাকে শিক্ষার বাহন করার ব্যাপারেও এর গুরুত্ব সমধিক।

পুঁথি সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কেও দু'একটি কথা বলতে চাই। একথা সত্য যে, পুঁথির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল। তবে পুঁথির মধ্যেই যে কেবল মুসলিম সংস্কৃতির নজির পাওয়া যাবে এ-কথা ঠিক নয়— আর পুঁথি সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই কেবল রেনেসাঁ লুকিয়ে আছে–একথা মনে করাও সঙ্গত নয়। পুঁথির আঙ্গিক দুর্বল। তবু স্মরণ রাখা ভালো যে, আঙ্গিকের জটিলতাই উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের একমাত্র বাহন নয়। পুঁথির ভাষা গতানুগতিক হলেও কৃত্রিম নয়। সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে পুঁথি সাহিত্যে যে স্বচ্ছ সৌন্দর্য ও সাধারণ সারল্য আছে, নতুন সাহিত্য ও শিল্পকর্মে তার মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

আমাদের সংস্কৃতির বাস্তবরূপ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে পড়ছে।

সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভাবপ্রবণতা অবাঞ্ছিত। কথাটি সত্য। কারণ, পর্যালোচনা ও অনুশীলনের পদ্ধতি যথাসম্ভব মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন। তবে কাজটা সহজ নয়, কেননা—

No group is trustworthy critcria of its own promises... the group directs is member and who will direct the (Scientific) group?[১]

তাছাড়া সমাজ বৈজ্ঞানিক কেবল মিস্ত্রী বা মেকানিকের কাজ করেন না, তিনি বিজ্ঞানী। তাই প্রয়োগ-রূপায়ণের পথে মূল্যবোধের পদ্ধতিতে তাঁকে আসতেই হয়। কারণ মানুষের সত্তা জৈবিক ও অনুভূতিময়— যান্ত্রিক নয়।

বাস্তব সমস্যার আর একটি প্রশ্ন দাসপ্রথা। ইউরোপীয় দাসপ্রথার স্বীকৃতি ইসলামে নেই। মুসলিম সমাজের 'আব্‌দ' সাধারণ ভৃত্যের চাইতেও উচ্চ পর্যায়ের। তবে মধ্যপ্রাচ্যে ও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে যে ব্যবসাগত দাসপ্রথা এখনও চালু আছে, তা ইসলামের ঘোর বিরোধী। হযরত (সা.) হঠাৎ করে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেন নি, কারণ তখনকার দিনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এর নিবিড় সংযোগ ছিল। তিনি সদ্ব্যবহারের নীতিগত ও আইনগত ভিত্তি স্থাপন করেও দাসমুক্তির ব্যবস্থা করে, দাসপ্রথার বিলুপ্তির পথ সুগম করে দেন। মানবতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রভু-ভৃত্যকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। আল-কুরআন[২] ও

www.pathagar.com

হাদীসে এ সম্পর্কে বার বার নসিহত করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের শেষ বাণীতেও হযরত (সা.) একথার প্রতিধ্বনি করে গেছেন। যথেচ্ছভাবে দাসীদেরও অবিবাহিত উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা ইসলাম-সম্মত, একথার প্রতিধ্বনি করে গেছেন।

কোন কোন মহলে এ ধারণা প্রচলিত আছে যে, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ স্ত্রী ভিন্ন ঠিক নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা আল-কুরআনের বাণীর সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ দাসীকে অন্যতম স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র (সূরা নিসা)। অন্যত্র বলা হয়েছে : 'দুনিয়ার ক্ষণিকের সুবিধার জন্য তাদেরকে পাপকার্যে আহ্বান করো না'।[৩] ইসলামের দৃষ্টিতে সামন্তবাদ, ধনবাদ ও সমাজবাদ সামাজিক বিবর্তনের এক-একটি স্তর ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পন্থা মাত্র। এগুলো এমন কোন দর্শন নয়, যা মানবজীবনের সুষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের ইঙ্গিত দিতে পারে। প্রাথমিক যুগে ইসলাম সামন্তবাদ ও বিশৃঙ্খল পরগাছা সমাজ-বিন্যাস ধ্বংস করে নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজনার হার হ্রাস করা হয় ও কৃষকই হয় জমির মালিক। লিখিত আইন ও নির্দিষ্ট বিচারব্যবস্থা ও একক শাসনতন্ত্র গঠনের মাধ্যমে আরব বিজেতারা এমন একটা প্রাণচাঞ্চল্যের ও সামাজিক জাগরণের সূচনা করেন, যা মানব সভ্যতার সৃষ্টিময় যুগে অপরিহার্য।[৪] ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে যখন পৌর-অধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নাম-গন্ধও ছিল না ও এসব দেশের কৃষক সমাজ দাসপ্রথার চাপে জর্জরিত ছিল, তখন মুসলিম দেশগুলোতে সত্যিকার গণতন্ত্র-সুলভ স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

সামাজিক চাহিদাও প্রয়োজন অনুসারে ইসলামের জীবনদর্শন যদি সত্যিকারভাবে রূপায়িত হয়, তবে যেমন অতীতে সামন্তবাদ পেরিয়ে ইসলাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গোড়াপত্তন করেছিল; তেমনি ধনবাদ ও সমাজবাদ অতিক্রম করে ইসলাম সার্বজনীন মানবতাবাদ বাস্তবে রূপায়িত করবার ভরসা পাবে। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের মধ্যে সে সম্ভাবনা নিহিত আছে।

মুঘল সাম্রাজ্য ও গোটা উপমহাদেশীয় মুসলিম সাম্রাজ্য-সংস্থাকে অনেকে ইসলামের সাথে একত্রিত করে থাকেন। কিন্তু এ পদ্ধতি ভ্রান্ত। কারণ, এসব সাম্রাজ্য 'মুসলিম' নামধারী হলেও, এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থাও মানবতাবাদ সম্যক রূপায়িত করার কোন পরিকল্পনাও এসব সাম্রাজ্য-সংস্থার মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

www.pathagar.com

তাই তখনকার দিনে ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে কোন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।

ধর্ম ও জাতীয়তা সম্পর্কে হামেশা এ কথা বলা হয় যে, ধর্মের পরিচয়ে জাতি গঠিত হতে পারে না। জাতীয় চরিত্র গঠনেও নাকি ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। আরও বলা হয়, ধর্মের সামাজিক ভূমিকা যেখানে শেষ, জাতীয়তার সেখানে শুরু। কথাগুলো শুনতে খুব সহজ ও সাদামাটা লাগে—কিন্তু আসলে অত সরল নয়। এসব মন্তব্য জনপ্রিয় ভুল ধারণার নির্ভেজাল পুনরাবৃত্তি বই আর কিছু নয়।

অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের পরিমাপে জাতি হয় না— যেমন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ। কারণ ধর্ম বলতে সেখানে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও যাজকতন্ত্র বলেই মনে করা হয়েছে। আবার কখনও বা ধর্মের ভিত্তিতেই জাতি গঠিত হয়, যেমন পাকিস্তান ও ইসরাইল। ধর্ম ও যাজকতন্ত্রকে সমতুল্য মনে করলে ধর্মীয় নীতির উপর ভিত্তি করে জাতি সংগঠিত হয় না। ধর্মকে মোল্লাতন্ত্র হিসেবে না ধরে জীবনদর্শন হিসেবে মনে করলে, (মোল্লা ও রাষ্ট্রের সম্মেলন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি নয়। নীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী মিলনই ইসলামী রাষ্ট্রের মাপকাঠি।) চরিত্র গঠনেও সমাজ সংগঠনে ধর্মের ভূমিকা সাধারণ শিক্ষার চাইতে অনেক বেশি। ধর্মকে অবশ্য যাজকতন্ত্র মনে করলে বা সমাজে যাজকতন্ত্রের কায়েমী আসন পাতা থাকলে, ধর্মের সামাজিক ভূমিকা খতম করে তবেই জাতীয়তার উন্মেষ হয়। তবে প্রাচ্যে একথা সব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা চলে না—কারণ এশিয়ার মানব-সমাজ অনেক স্থলেই সামাজিক বন্ধন ও মানবিক সুবিচারকের বাহন হিসেবে কাজ করে এসেছে। তাই জাতীয় সংগঠনের সাথে সাথে ধর্মের সত্যিকার মানবিক ভূমিকা আরম্ভ হয় মাত্র—শেষ হয়ে যায় না। আধুনিক যুগে ধর্ম সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হয়, তা ধর্মের সামাজিক বিকৃতি লক্ষ্য করেই। মনে রাখা উচিত যে, ধর্ম মানব-মনের দিক থেকে কোন বাইরের জিনিস নয় বা কৃত্রিম ব্যাপার নয়। তাই এ সমালোচনাকে ধর্মের নিয়ামক মনে করা মানব-মনে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা-উদ্ভূত। মানব-মনের আবেদন ও সহানুভূতি-অনুগ মানবিক মূল্যবোধ রূপায়িত করা ধর্মের সত্যিকার অন্তর্নিহিত চেহারা। ধর্মকে যাজকতন্ত্রের শামিল করে ফেলার দরুন, ধর্মের সামাজিক ও মানবিক দিকটা বাস্তবে রূপান্তিরিত হতে পারে নি।

'By the separation of clergy from the laity the democratic and communistic element in Christianity

www.pathagar.com

ceased to have a universal application. The ideal life was no longer for all men but for the few.'৬

কিন্তু সত্যিকার ধর্মীয় জীবনদর্শনে ধর্মের সর্বাঙ্গীন মানবিক ভূমিকা অপরিহার্য।

বিজ্ঞানের বদৌলতে আধুনিক মানুষ সবকিছুই জয় করতে চায়, কিন্তু মনোজগত সম্পর্কে দুঃখবাদ ও হতাশবাদ এখনও তার ঘোচে নি। মনোজগতকে আয়ত্তের মধ্যে আনা সে অসম্ভব মনে করেছে। আধ্যাত্মিক উন্মেষের পথও অসম্ভব ভেবে সে নির্বাক হয়ে রয়েছে। কিন্তু সভ্য মানুষের প্রধান ভূমিকা হলো সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন স্ফূরণ ও মূল্যবোধের সৃষ্টিশীল রূপায়ণ।

সাধারণ ক্ষেত্রে লোকায়তবাদকে (Secularism) ইসলাম-বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করা হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, এদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক বিরোধও রয়েছে। কিন্তু লোকায়তবাদের সাথে কয়েকটি বিষয়ে ইসলামের যে সাদৃশ্য রয়েছে— এ কথাটি মোটেই স্মরণ রাখা যায় না। মানবিক সাম্য, সমাজকল্যাণ ও মানবতার দিক থেকে ইসলাম ও লোকায়তবাদের সাথে অনেক মিল রয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের মানবতা তওহীদভিত্তিক আর লোকায়তবাদ ঔদাসীন্যবাদে দ্বিধান্বিত; ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুষ্ঠ সমঝোতাও সেখানে নেই।[৭] লোকায়তবাদের বহুঘোষিত সাম্যবাদ ও মানবতা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে আজও ফলপ্রসূ হয় নি, হয়েছে বাংলাদেশে। কারণ বাংলাদেশী মুসলিমের মনে সাম্যের ধারণা এসেছে মূলতঃ তার নিজের ধর্ম থেকেই— মানবতার নীতি পালন করলে আল্লাহ্ খুশী হবেন ও তাঁর নিজস্ব আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব হবে, একথা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সাধারণ বাংলাদেশীদের মনে চিরজাগ্রত রয়েছে। কিন্তু ভারতের সাধারণ ভারতবাসীর মনের অবস্থা ভিন্নরকম। একদল উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী বা দার্শনিক ভিন্ন অধিকাংশই ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতা অর্থেই দেখে থাকেন। সাম্যবাদ এখানে মানবিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় নি— ইউরোপ থেকে ধার করা প্রত্যয় হতে তা পাওয়া। তাই ভারতীয় সমাজ-জীবনে মানববাদের শিকড় পাকাপোক্ত হয় নি।

ভাষা, গোষ্ঠী, বর্ণ ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে ইসলাম মানব-সমাজের ঐক্য ও সাম্যের যে বাণী পেশ করেছে তা শুধু অনুশাসনের নিগড়েই আবদ্ধ নয়। মসজিদে, ঈদের ময়দানে, হজ্জের জামাতে এ কথাই বার বার প্রতিধ্বনিত হয়। আজকের দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ সাম্য সুদূরপরাহত। সাদা-কালোর সংগ্রাম এ সভ্যতার

www.pathagar.com

এক বীভৎস সংকট। তাই মানবিক মর্যাদায় উন্নীত হবার মানসে প্রতি বছর আফ্রিকার কালো মানুষ হাজারে হাজারে ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন।

একথা যতই প্রশংসারই হোক না কেন, ইসলামী সাম্যের বাস্তব রূপায়ণে এটাই শেষ কথা নয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা বাদ দিলেও, এ উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা-রূপ যে আভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে, তাকে ঢেকে রাখলে কোন ফায়দা হবে না। এ প্রশ্নের আশু মীমাংসা প্রয়োজন। নানা কারণে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাদ উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে অনেকটা স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতবর্ষে মুসলিমদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে আলীগড় আন্দোলনের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামের উদারপন্থী ব্যাখ্যাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ আন্দোলন গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা ও প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে রেহাই পায়নি। তার মধ্যে এক উদ্ভট উন্নাসিক বনেদীপনার লালন হয়েছে— যা অনেকাংশে ইসলামী মানবতা থেকে অনেক দূরে। বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি শুধু 'বাঙালী' বলেই প্রচ্ছন্ন গোষ্ঠীগত উন্নাসিকতা উগ্র হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল : বাংলা ভাষা ইসলামবিরোধী।

১৯৪৫ সালে নভেম্বর মাসে আমি বাংলা ভাষার শিক্ষাগত ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য লেখনী ধারণ করি।[৮] তখনকার দিনে বাংলা ভাষার জন্য এতটা কেউ বড় একটা বলেন নি। তবে হিন্দীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উর্দূকে যেমন দাঁড় করানো হয়, তেমনি বাংলাদেশে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে (পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, কলকাতা ১৯৪৪– ৪৭) বাঙালি মুসলিম-ঐতিহ্যে কথা তুলে ধরা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে মুসলিম সংস্কৃতিকে বাঁচানোই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ঢাকায় বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠার্থে প্রথম আহ্বায়ক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে আমি যে সভা আহ্বান করি (২০-মে, ১৯৬০), সেখানেও এসব বিষয় আলোচিত হয়।

বাংলা ভাষাকে সাহিত্য পদবাচ্য করে গড়ে তোলেন গৌড়ের মুসলমান বাদশাহগণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মনস্তত্ত্বে, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তুলনায় বাংলা ভাষাকে যে নীচু স্থান দেওয়া হত, তা নতুন বুনিয়াদী মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যেকার ব্যবধান পাকাপাকি করে ফেলল।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একথা ধরা পড়ে যে, উপমহাদেশের সব অঞ্চলের মুসলমানেরাই ধর্মান্তরিত মুসলমান, উঁচু-নীচু সব শ্রেণীর মুসলমানের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য। আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমান থেকে শুরু করে আজ অবধি দুনিয়ার সব মুসলমান অন্যান্য ধর্ম থেকেই দীক্ষিত হয়েছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয়, অ-বাঙালি মহলে—এমনকি অনেক বিদেশীদের মধ্যে এ সংস্কার বদ্ধমূল রয়ে গেছে যে, বাঙালি মুসলমান সবাই নীচু শ্রেণী থেকে এসেছেন। মন্তব্যটা শুধু অভদ্র নয়, নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ বহু বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশে আসেন ভাগ্যান্বেষণে।[৯] এ ছাড়া আশ্রয়ের খোঁজে ও শান্তির তাগিদেও অনেক মুসলিম পরিবার দিল্লীর হট্টগোল থেকে রেহাই পেয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ও রাজক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় সহায়-বৃত্ত সম্পদ হারিয়ে এরা দরিদ্র হয়ে পড়েন ও গ্রামের মানুষের সাথে বেমালুম মিশে গিয়েছিলেন।[১০] ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বহু মুসলমান পরিবার বাণিজ্য উপলক্ষে ও ইসলাম প্রচার মানসে বাংলাদেশে আসেন।

অবহেলিত শ্রেণী থেকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি কেবলমাত্র বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, তথা গোটা উপমহাদেশেই নিপীড়িত মানবতা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল, যেমন যুক্ত প্রদেশের কৃষক ও তন্তুবায় শ্রেণী এবং পাঞ্জাবের কৃষক সমাজ। আর হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায় তা থেকে এ-কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১৮৭০ সালের পরে ধর্মান্তরিত মুসলমান খুব বড় একটা হয় নি; কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১৮৭৩ সালের পরেই খুব বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৮৭৩ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মুসলমান ছিলেন শতকরা মাত্র ৪৩ জন। অর্থাৎ মুসলমানেরা তখন ছিলেন সংখ্যালঘু। ক্রমে ক্রমে এসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে ও ১৯৪১ সালে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫৬ জন, কাজেই বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা এককভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন, হিন্দুধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে নয়।

www.pathagar.com

অবশ্য বাঙালি মুসলমানকে অবজ্ঞা করার কয়েকটি কারণ আছে— তারা অনেকে চেহারায় কাল, আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বভাবে ভাবপ্রবণ। গত কয়েক শতাব্দীতে, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমলে এদেরকে সামরিক কার্যকলাপ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে দূরে রাখা হয়েছে। উপমহাদেশে যথাযথ শিল্পায়ন যেমন এ যুগে হয়নি, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম সমাজ কলকাতা ও বোম্বাই-এর শিল্পকারখানার রসদ যুগিয়েছে মাত্র, তার সুফলের শরীক হতে পারে নি একেবারেই। উড়িষ্যা বা বিহারের হিন্দু নিম্নশ্রেণীর চাইতে অর্থনৈতিক অবস্থায় অনেকটা ভাল হলেও নিজের দেশের সম্পদের সাথে তুলনায় তারা নিতান্ত গরীব। তারপর সাধারণভাবে অ-বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতিতে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে এক কৌণিক অবজ্ঞার অস্তিত্বের ফলে এমন মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বা বাংলা সাহিত্যের চর্চা করলেই তা ইসলামবিরোধী বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম থেকে যারা ইসলাম ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের লক্ষ্য করে বাংলাদেশের সব মুসলমানকেই তালগোল পাকিয়ে 'নেড়ে' মুসলমান ও কখনও কখনও যবন অর্থাৎ বিদেশী বা বিধর্মী এভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে)। ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণ বিচারের মানসিকতা অ-বাঙালি মুসলিমের উগ্র রাজসিকতার সাথে মিলে গিয়ে মুসলিম সংস্কৃতিতে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ইসলামী মানবতাবাদ, মানসিক সাম্য তথা ইসলামের গোটা আদর্শ সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ ও বানচাল হয়ে গেছে।

ইসলামী আদর্শের আলোকে তাই এ প্রশ্নটির যাচাই হওয়া উচিত। ইসলামে ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে কিছুই নেই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে ব্যক্তির অন্য সব পরিচয়ের সমাপ্তি ঘটে। তার জাতি, বর্ণ, ভাষা দেশ—এসব বিষয়ের গুরুত্ব মৌলিক দিক থেকে আর স্বীকৃত হয় না। ইসলামী আদর্শের সত্যিকার রূপায়ণের মাধ্যমে সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে তিনি অনুপম মর্যাদা লাভ করেন। কাজেই ধর্মান্তরিত মুসলমান কথাটি ইসলাম বিগর্হিত গোষ্ঠীবাদ (Racialism) ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সাক্ষর বহন করে। হিন্দুদের পাশাপাশি অনেকদিন বসবাসের ফলে হিন্দু সমাজের প্রভাব মুসলিম সমাজেও এসে পড়েছে, কিন্তু মুসলিম সমাজের মানববাদ ও সংস্কৃতির মূল সুরটি (অর্থনৈতিক কাঠামো এক হলেও) পৃথক ও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন মুসলিমের মধ্যে হয়তো বা ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি রয়েছে কিন্তু তা হিন্দু জাতিভেদ প্রথা থেকে পৃথক ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান।[১১]

কারণ ইসলাম মানুষের নীতিগত, আইনগত ও সামাজিক ব্যবধান দূর করে সাম্যের বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছে। আহার, বিহার, বিবাহ (সুখী জীবনের খাতিরে

www.pathagar.com

বিবাহের ব্যাপারে সামাজিক সমতা বা 'কফু' সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে নীতিগত ও আইনগত ব্যবধান নেই।[১২] শুধুমাত্র চরিত্রের উৎকর্ষই ইসলামে আভিজাত্যের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র্যের ফলে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার পসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এ অবস্থা ক্রমে ক্রমে কেটে যাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির যে সমস্যা, তা কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যাটির অনুশীলনে গোষ্ঠী ও সংকীর্ণতা ও ভাষা সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ফারসী ভাষা যখন আরবির চাইতে নিকৃষ্টতর হিসেবে গণ্য হয় না, তখন বাংলাকে নিকৃষ্ট মনে করা হয় কেন? এর হয়ত একটি সহজ জবাব আছে। ফারসী আর আরবি লেখা হয় একই হরফে, কিন্তু বাংলার হরফ ভিন্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেবার নয়। আসল কথা হল আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানেরা খুব বেশি এগোতে পারেন নি, এ-যুগে তারা বাংলা ভাষা শিখতেও চান নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের যে সম্ভাবনা ছিল, তা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। ফলে বাঙালি মুসলমান হিসেবে যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির পথে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। এ স্বীকৃতি মেলা যেমন কঠিন হয়েছে বাঙালি হিন্দুদের কাছ থেকে, তেমনি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল অ-বাঙালি মুসলমানদের তরফ থেকেও। ব্রিটিশ যুগে তাই বাঙালি বলতে বুঝাত হিন্দুকে ও মুসলমান বলতে অ-বাঙালিকে। এক্ষেত্রে উর্দূ সংরক্ষণের জন্য সমিতি গঠিত হয়েছে, কিন্তু বাঙালি মুসলিম কর্তৃক কথিত ও লিখিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপটিকে রক্ষা করার কোন সক্রিয় প্রচেষ্টা বড় একটা দেখা দেয় নি। কিন্তু তারও যে প্রয়োজন ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তা সপ্রমাণ করেছে। (১৯৪৯ সালের ৪ নভেম্বর একটি প্রবন্ধে আমরা এ কথা বলেছিলাম যে, বাংলা ভাষায় মুসলিম সংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হবে ও বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। শহীদ দিবসের বাৎসরিক আলোচনা সভায় ও বিশেষ করে ১৯৬০ সালের ২০ মে তারিখে প্রস্তাবিত বাংলা কলেজের প্রথম আহ্বায়ক হিসেবে বাংলা একাডেমীতে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতেও আমরা বাঙালি মুসলিমের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিকাশের কথা তুলে ধরেছিলাম।) আদর্শ হিসেবে ইসলাম যেমন আমাদের মনে প্রাণে গাঁথা তেমনি ভাষা, সাহিত্য ও পরিবেশের বিশিষ্ট প্রভাবে ও মার্জনে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির মূল সুর সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইতিহাস এ কথা সাক্ষ্য দেয়

www.pathagar.com

যে, কোটি কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলার মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশের স্বকীয়তা নানারূপে রসে রূপায়িত, তেমনি তা তওহীদ সঞ্জাত বৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল।

একাধারে আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে ও অন্যদিকে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে আমি ইসলামী রেনেসাঁয় বিশ্বাসী। আল্লাহর একত্ব, বিশ্বজনীন মানব ভ্রাতৃনা এবং ইনসাফের নীতি ও নৈতিক জীবন-বাণীকে অটুট রেখে চলাই আমার নিয়ম। আমার মতে, ইসলামের আসল উদ্দেশ্যও তা'ই। আমি বিশ্বাস করি, মানব-জীবনে মুক্তবুদ্ধির প্রয়োগ না হলে তা ষোল কলায় পরিপূর্ণ ও বিকশিত হতে পারে আর বিশ্বজনীন ভাবধারার উপর ঈমান না রাখলে, সে মুক্তবুদ্ধি কোনদিন মানব কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে না। তওহীদের মাধ্যমে ইসলাম বিশ্বজনীনতা ও রিসালাতের মধ্য দিয়ে (সব জাতির মধ্যেই নবী এসেছেন, যাঁদেরকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে ও হযরত মুহম্মদ (সা.) শ্রেষ্ঠ নবী) সমগ্র মানব-সংস্কৃতিতে যে কেবল সংযোগ ও সহযোগিতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে তা'ই নয়, সব জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, শুভ কামনা, পরমতসহিষ্ণুতার বাণীও রয়েছে এতে সদা জাগ্রত। জালিম বা অত্যাচারী ভিন্ন সব মানুষের প্রতি উদার ব্যবহারের বাণী ঘোষিত হয়েছে আল-কুরআনের ছত্রে ছত্রে। রিসালাত বা শেষ নবুয়তের নীতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব ও অনাগত ভবিষ্যতে মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্ভাবনার সুবিপুল আশ্বাস। সার্বজনীন নীতির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন মানবতার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন থাকবে না মানুষের সম্ভাবনার যাত্রা পথে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ বাণী মূলতঃ ইসলামী মানবতার।

বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ, এ কারণে তাকে উন্নাসিকতার চোখে দেখা সমীচীন হবে না। জোর করে সংস্কৃত, হিন্দী বা আরবি, ফারসী শব্দের প্রচলন যেমন বিপদসংকুল, তেমনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত শব্দের সুসংহত ব্যবহার হলেও তাতে নাক সিটকানো অন্যায়। মানান বা লাগসই হলে আরবি, ফারসী, ইংরেজি, সংস্কৃত— যে কোন ভাষা থেকে শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। সাহিত্য হিসেবে দুনিয়ার সব দেশের ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন করা শুধু যে যথোচিত তা নয়, জাতীয় সাহিত্য উন্মেষের পথে তা অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

বাঙালি মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টির অভাবে কোন কোন মহলে গোটা বাংলা ভাষাতেই হিন্দুত্ব আরোপ করা হয়। আবার কোন কোন সাহিত্যিকদের মধ্যে (যেহেতু আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে হিন্দু সাহিত্যিকদের অবদান সমধিক। অমুসলিম-প্রীতি ও পশ্চিমবঙ্গ-মুখিনতাকে লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে সাহিত্য ও সাহিত্য-চিন্তার মাপকাঠি হিসেবে মনে করার প্রবণতা

www.pathagar.com

রয়েছে। আবার কারো কারো মতে ইংরেজি সাহিত্য বা বিদেশী সাহিত্য থেকে হাবভাব ও মাল-মশলা গ্রহণ করলে তাতে নাকি সাহিত্যের জাত যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাহিত্য-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সমাজ চিন্তা ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে কেউ কেউ বিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে স্বল্প পরিসরে কিছু আলোচনা করতে চাই। বলা হয়েছে, আমি পাশ্চাত্য রেনেসাঁয় যথেষ্ট আস্থাশীল নই।

শুধু দার্শনিক দিক থেকে নয়, ইসলামের সর্বাঙ্গীন বাস্তবায়ন ও বিন্যাসে রেনেসাঁ বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, তা একান্তভাবে মানবতাবাদ ও রেনেসাঁর অনুকূল। ইতিহাসেও এর প্রমাণ মিলেছে। ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সংস্পর্শের ফলেই ইউরোপ রেনেসাঁর পথে এগিয়ে চলে। ইসলামের এ অবদান সার্থক হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁর মাধ্যমে। ইউরোপীয় রেনেসাঁয় ইসলামের সবচেয়ে বড় অবদান হল মুক্তবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, স্থাপত্য ও সংগীতের অবদান[১৩] ছাড়াও, বিশ্লেষণ-পদ্ধতিই ইসলামী সভ্যতার সবচাইতে বড় দান। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে সিসিলি ও স্পেনে ইসলামী সভ্যতার সাথে ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে রেনেসাঁ ও ধর্মীয় সংস্কারের গোড়াপত্তন হয়।

দ্বিতীয়ত, শিল্প বাণিজ্যের ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ও আইনগত সাম্য এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। মুসলিম সভ্যতার সংস্পর্শে বিশেষ করে ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলে উন্নত কৃষিকার্য, বস্ত্র-বয়ন পদ্ধতি, কার্পেট বুনোন ও কাগজ তৈরির কলাকৌশল প্রবর্তিত হয়।[১৪]

এসব চিন্তাধারা এবং নতুন শিল্প ও উৎপাদনের পদ্ধতি থেকেই যাজক-তন্ত্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা হয়। আর এ সংগ্রাম রেনেসাঁ আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। প্রাথমিক যুগে মুসলিম সভ্যতার নানা উপকরণ সব দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকেই আহরণ করা হয়। কারণ সে-যুগে মুসলমানের কোন কুসংস্কার ছিল না; এবং এর মূল প্রেরণা ও উদ্দীপনা এসেছিল ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার সার্বজনীন মানবতাবোধ থেকে। তবে ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে মৌলিকভাবে ইসলামের রেনেসাঁ পদ্ধতির পার্থক্য এই যে, ইসলাম মুক্তবুদ্ধির জয় ঘোষণা করেছে, কিন্তু বুদ্ধির মুক্তির অজুহাতে নৈতিক নৈরাশ্য মেনে নিতে চায় না। নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা ও বাস্তব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা করতে বাধা তো নেই, বরং বার বার এ পথেই প্রেরণা এসেছে, আল-

www.pathagar.com

কুরআন থেকে। জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তি যেমন শাশ্বত বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি আবার নতুন পরিবেশ ও চাহিদা অনুযায়ী মানব-কল্যাণ ও ইনসাফের তাগিদে এগুলো রূপায়ণের উপর জোর দেয়া হয়েছে। কাজেই সমাজ-জীবনে ও বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে ইনসাফ কায়েম না হলে ইসলামী আদর্শ এবং সার্বজনীন মানবতাবাদ কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তারপর পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে আসা যাক। আমি কোনদিন পুনরুজ্জীবনকে আমার দার্শনিক চিন্তার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করি নি। ইসলামের সার্বজনীন মানবতার উপর ভিত্তি করে, দেশ-কাল-পাত্র ও পরিবেশানুগ রূপায়ণ ও এ ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠনই হচ্ছে আমার সমাজ-চিন্তার মূল নিরিখ। তাই আমি সমানে উগ্র রক্ষণশীলতা ও চরমপন্থী তথা কিছুসংখ্যক প্রগতিবাদীদের উদাসীন মনোভাবের বিরোধিতা করে এসেছি। আমরা যখন খুলাফায়ে রাশেদীনের কথা স্মরণ করি, তার অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে সে-যুগে ফিরে যেতে হবে বা সে যুগের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা ও সত্যিকার ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত না হলে বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কখনই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একদিকে স্বার্থের মোহ এবং অন্যদিকে এক-কৌলিক চিন্তাধারার ফলে এসব বিষয়ের বাস্তব বিশ্লেষণ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। আসলে যে পথে আমাদের পদচারণা, তা রক্ষণশীল তথাকথিত (ধর্মীয়) সমাজ ও বলগাহীন মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের মাঝামাঝি পথ। আমরা বুদ্ধির মুক্তিতে বিশ্বাসী। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। সাহিত্য যেখানে ধর্মের বা ঐতিহ্যের ব্যবহারিক দোষগুলো বাতলে দিয়েই খালাস হয়ে যায়, সেখানে আমি সুষম সামাজিক প্রগতির তাগিদে ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত ইশারা ও প্রয়োগবিধির সমালোচনার মধ্যে সমঝোতা খুঁজে পেতে প্রয়াস পাই; এবং তা ইসলামের মৌলিক বিশ্বজনীন মানবতাবাদ ও ইনসাফের উপর সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাই দার্শনিক-কবি ইকবালকে স্বীকৃতিদানের অর্থ এটা নয় যে, সব বিষয়ে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে হবে। যে-সব বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন নি অথবা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা তুলে ধরা আমাদের সামাজিক কর্তব্য।

আমার দার্শনিক চিন্তার motto হিসেবে গত বিশ বছর যাবত ডাইরিতে লেখা রয়েছে—

জ্ঞান লাভ সব অনুষ্ঠান কর
হৃদয় প্রসারিত কর
যেখানে যা ভাল পাও গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান আবার প্রচলিত করতে হবে। প্রাথমিক খলীফাদের শাসন-পদ্ধতি থেকে আমরা অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করি। কারণ সমগ্র মানুষের ইতিহাসে এরাই সুখী-সুন্দর সমাজ গঠনে একক সার্থকতা লাভ করেছিলেন। যে সুবিপুল আত্মপ্রত্যয়, সুগভীর অনুদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ কর্ম-প্রেরণা নিয়ে তাঁরা মনুষ্য সমাজ সুগঠিত করার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তা আমাদের চলার পথের আলোর দিশারী ও দিকদর্শন হিসেবে কাজ করে এসেছে। তবু এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী আদর্শের রূপায়ণের ক্ষেত্রে মানব সভ্যতার বিকাশ শেষ কথা নয়। নতুন সমাজ সংগঠনই হবে আমাদের লক্ষ্য, sentimental revivalism নয়। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়, এ ধারণা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না। নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা থেকে দূরে থাকলে সাংস্কৃতিক চিন্তার উন্মেষ কোন দিনই হতে পারে না।

আমি যা দেখেছি, বিশ্বাস করেছি, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঠিক বলে মেনেছি; তাই বলেছি, লিখেছি ও প্রকাশ করেছি। ফলে জীবনাদর্শের বাহ্যিক সামাজিক আবেদনের দিক থেকে এক মহা গোলকধাঁধার মাঝে আবিষ্ট হচ্ছি। ধর্ম বলতে আমি চিনেছি ধর্মের সার্বজনীন মৌলিক নীতি।

অন্ধ নেশা ও বেস্যাপতিপনার পথ— তা ধর্মের নামেই হোক বা প্রগতির নামেই হোক, আমাদের আজ পরিত্যাগ করতে হবে ও সত্যিকার মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সুন্দর ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে হবে। আসলে ধর্মের উদ্দেশ্যও তাই। কী সমাজ-জীবনে, কী সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মননশীলতা সহনশীলতার মাধ্যমে নবরূপ লাভ করবে এবং বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক স্বীকৃতিতে ঐক্যের পথ সুগম হবে। পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে প্রকাশ ও বিকাশের পথ হবে উন্মুক্ত—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পথে নয়, অন্বেষণের পথে, বিদগ্ধ আলোচনার পথে। সত্যিকার ইসলাম মানুষের দুঃখবাদ ও বিতৃষ্ণা ঘুচিয়ে সুস্থ সমাজবোধ জাগ্রত করে ও এনে দেয় সৃষ্টিময় জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা। একত্ববাদ যে নৈতিক জীবন ইনসাফ ও মানব ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে তা ধর্মের জিগির, সাম্প্রদায়িকতা বা ফতোয়া জাহির করার কারসাজি থেকে অনেক দূরেই অবস্থান করে। নিজস্ব মহিমায় তা এত দীপ্তিমান যে, সত্যিকার মুসলমানের পক্ষে তা বুঝে নেওয়া মোটেই কঠিন হয় না।

এমন মন্তব্য হামেশা শুনতে পাওয়া যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মবিরোধী নয়। হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্যবাদী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই; আর ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তি কামনা করে কার্যতঃ ধর্মের সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের বিচ্যুতি ঘটায়। মানব-

www.pathagar.com

মনে মূল্যবোধ, জীবনদৃষ্টি থাকবেই। আর তাই হলো মানুষের প্রকৃত ধর্ম। একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মূল্যবোধ যে সর্বদা উদার হবে এ কথা বলা যায় না। সত্যিকার সার্বজনীন ধর্মের উদ্দেশ্য সূক্ষ্ম অনুশাসনের জগদ্দল চাপানো নয়, মানব-মনে সার্বজনীন মূল্যবোধের উদ্বোধন। সব রকম গোঁড়ামী অজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে সার্বজনীন মূল্যমানের পথে মানুষকে বিকাশ, বিবর্তন ও অনন্ত সম্ভাবনার আদর্শের মনজিলে পৌঁছে দেয়াই সার্বজনীন ধর্মের মূল নিরিখ।

অবশ্য সংকীর্ণ অর্থে (অর্থাৎ ধর্মকে নিছক অনুশাসন-সমষ্টি মনে করলে) ধর্ম সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু ধর্মের বিস্তৃততর সংজ্ঞায় এরূপ একেবারে বদলে যাবে। কারণ ধর্মের মধ্যে জীবনধারা, চিন্তা-পদ্ধতি ও জীবনদৃষ্টি রয়েছে। এক্ষেত্রে জীবনদৃষ্টি (ধর্ম) গোটা সংস্কৃতিকে কেবল প্রভাবিত করে তাই নয়, সংস্কৃতির কর্মধারা ও মূল্যায়নেও এর তাৎপর্য সমধিক। জীবন সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপায়ণেই (বাস্তব ও আধ্যাত্মিকের সমন্বয়) পূর্ণতর মানুষের বিকাশ সম্ভব হয়।

অতীতের প্রতি অধিক আকর্ষণ ও বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার অভাবের ফলে আমাদের সমাজব্যবস্থা ও জীবনদৃষ্টি ঘোর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে এ সমস্যা আরও জটিল ও ঘোরালো হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থাকে দর্শনের সাহায্যে কল্পায়িত রূপ দেওয়ার ফলে (Condition idealised), সার্বজনীনতার মাপকাঠিতে মানবিক-মূল্যবোধ ব্যাহত হয়েছে। কারণ, সে অবস্থাকে অনেকখানি আদর্শস্থানীয় মনে করা হয়। সুদূরপ্রসারী সমাজসংস্কার এ অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ তা মূলতঃ সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত। (তবে সামাজিক রূপায়ণের পদ্ধতি হিসেবে এর বিশেষ মূল্য আছে।) অন্যদিকে প্রাচ্য দেশে বিশেষ কোনও একটি ধারণা বা প্রত্যয়কে কল্পায়িত করা হয় (Conception idealised); কিন্তু পরিবর্তনশীল চাহিদা ও সামাজিক বিবর্তনের ও তার বাস্তব রূপায়ণের পন্থা সম্পর্কে অনুশীলন স্বল্পই পরিলক্ষিত হয়। কার্যক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ মেনে নিতে পারে নি। আর প্রাচ্য-সভ্যতায় সামাজিক গতিশীলতা অস্বীকৃতই রয়ে গেছে। প্রাচ্য দেশগুলোকে সার্বজনীন মূল্যবোধ চলিষ্ণু সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়ণ করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। আর বাস্তবায়নের পদ্ধতি (Rechnique of inplementation) পাশ্চাত্য দেশ থেকেই আয়ত্ত করতে হবে। তবে তাকেই নকল না করে অবস্থাভেদে পরিবেশের উপর দৃষ্টি রেখে পন্থা উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও রূপায়ণে হাত দিতে হবে।

www.pathagar.com

সত্যিকার ধর্ম কেবল মার্জিত রুচি-জ্ঞানহীন লোকের জন্যেই নয়। ধর্ম কেবল বাহ্যিক বিধি-নিষেধের সমষ্টি নয় বা শাস্তি পুরস্কারের খসড়াও নয়। কালচারের বড় অংশ জীবনের অনুভূতি। ধর্মের সুষ্ঠু সংজ্ঞায় অমার্জিত লোকের জন্যেই ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। সূক্ষ্ম চেতনার উপলব্ধিতেই জীবনের দশদিক ফুটিয়ে তোলা ধর্ম বা জীবনদর্শনের সত্যিকার ভূমিকা। আর তা বুদ্ধি ও অনুভূতির মাধ্যমে রূপায়িত হলে সব মানুষের জন্যেই সত্য—তবে তা কোন ছককাটা পদ্ধতিতে নয়। ধর্মের বিকৃতিকে তাই ধর্ম নামে অভিহিত করা সঠিক নয়। সত্যিকার ধর্মানুভূতি মানুষের শুধু নেতিবাচক দিকে আলোকপাত করে না, বরং সমগ্র জীবনকে বিকশিত করে। আর এ বিকাশে পতন থেকে রক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় তা থেকেও অধিক প্রয়োজনীয় জীবনের সুষ্ঠু পরিণতি ও বিকাশ। পরিচালনার দিকে তাকে দৃষ্টি দিতেই হবে। মুখে মুখে সীমাবদ্ধ থেকে গেলে ধর্মরক্ষা হয় না, মানবতা বাঁচে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ জিইয়ে রাখলে ধর্মের অপমানই হয়, সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। সত্যিকার কালচার ধর্মীয় মানবতাবাদ ও বিশ্বজনীনতা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সব ধরনের কালচার ধর্মের মূল্যবোধের অল্প মূল্য দেয়। তথাকথিত বাহ্যিক ধার্মিক লোক দেখানো 'কালচার্ড' স্নব (Snob)-এর দলে। তাই বলে বাহ্যিক ধার্মিককে প্রকৃত ধার্মিক ও স্নবকে সত্যিকার কালচার্ড মানুষ বলা যায় না। ধর্মকে কেবল কেতাবী মতে অটুট রাখা প্রকৃত ধার্মিকের উদ্দেশ্য নয়—জীবনকে সার্থক, সুষ্ঠু ও মহীয়ান করাই এর অন্তর্নিহিত ইশারা। এখন যেমন ধর্মের সৃজনশীল ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তেমনি কেবল বিশেষ জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি জোর না দিয়ে এর মানবিক দিকটাই ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। সৌন্দর্য ও অনুভূতি না থাকলে জীবন বিকশিত হতে পারে না, জীবনের বিচিত্র বন্ধন শাখায়িত হতে পারে না। আর জীবনবোধের মধ্যে, জীবনদর্শনের (বা ধর্মের) মাধ্যমে এ সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতি নিবিড় একাত্মবোধের জারকরসে সিঞ্চিত না হলে সৌন্দর্যবোধ নিছক সুবিধাবাদী বাস্তববাদে পর্যবসিত হয়। সৌন্দর্য ও অনুভূতির মাধ্যমে জীবনদর্শনের বিচিত্র বিকাশই হবে মানব জীবনের লক্ষ্য। একত্ববাদ, মানবতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সুষ্ঠু সমাজ গঠন আজকের দিনের আসল ও মহান কর্তব্য। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সুপ্ত সামগ্রিক ও সর্বপ্রসারী মানবতাবোধ আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।

—হাসান জামান

www.pathagar.com

১.
ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন সম্পর্কে আলোচনা করত গেলে 'তমদ্দুন' কাকে বলে জানা দরকার হয়ে পড়ে। তমদ্দুন কথাটি আরবি 'মাদানুন' থেকে এসেছে, 'মাদানুন' মানে শহর। বাংলা ভাষায় 'তমদ্দুন' কথাটি মুসলিম সমাজে গত কয়েক বছর হল চালু হয়ে গেছে। শহরের বুকেই গড়ে উঠেছিল প্রথম সভ্যতা, গোড়াপত্তন হয়েছিল সংস্কৃতির। এর ভেতরই হয়ত পাওয়া যাবে তমদ্দুন কথাটির সার্থকতা। বাংলা ভাষায় সাধারণত তমদ্দুন বলতে সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা হয়— 'তমদ্দুন' বা 'সংস্কৃতি' দিকনির্দেশ করে এক মার্জিত উন্নত রুচির ভাবের দিকে। ইংরেজিতে একেই বলা হয় 'কালচার'। কালচার শব্দটি এসেছে জার্মান 'Cultura" থেকে। 'Cultura'-র অর্থ কর্ষণ (Cultivation)। 'কালচার' কথাটির প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন বেকন্—Culture হল মানুষের নিবিড় সত্তার সারভাগ—'An attribute of the spirit of man'। গ্রামীণ বা নাগরিক সব সভ্যতাই তমদ্দুন বা সংস্কৃতি পর্যায়ে আসবে।

সমাজবিজ্ঞানে কিন্তু আমরা মার্জিত রুচি আর মার্জিত রুচিহীনতার সঙ্গে পরস্পর পার্থক্য দেখিয়ে তমদ্দুনের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করি না। কালচার্ড আর আনকালচার্ডের পার্থক্যই আমাদের সংজ্ঞার মাপকাঠি হয় না। ব্যাপক অর্থেই আমরা ব্যবহার করি 'তমদ্দুন' কথাটা। 'ম্যাথু আরনল্ড' তমদ্দুন বলতে বুঝেছেন প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের সারাংশ। আর টি. এস. ইলিয়ট কালচারকে দেখেছেন জীবনপদ্ধতি (Way of life)-রূপে। [Notes Towards the Definition of Culture]

তবে সবচাইতে বোয়া (Boas) ও টেইলর (Tylor)-এর সংজ্ঞাই ব্যাপক ও সুষ্ঠু। বোয়া তাঁর "জেনারেল অ্যানথ্রোপলজী" (General Anthropology-P.P. 4—5)-তে কালচার বা তমদ্দুনের সংজ্ঞার ভেতরে উল্লেখ করেছেন—(১) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ। (২) অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক

www.pathagar.com

সম্পর্ক ও বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক। (৩) মানসিক হাবভাব-ধর্ম, নীতি, সৌন্দর্য-জ্ঞান। 'তমদ্দুন' বলতে আমরা বুঝি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যন্ত্রাদি, প্রত্যয় (Ideas), ধর্ম (পাশ্চাত্য অর্থে), নীতি, আইন, আচার ব্যবহার—এ সবেরই সমষ্টি। টেইলর তাঁর "প্রিমিটিভ কালচারে" তমদ্দুনের এই ধরনেরই সংজ্ঞা দিয়েছেন :

Culture is that complex whole which includes knowledge, Belief, Art, Moral, Law, Custom and other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

সভ্যতা ও তমদ্দুন

এখানে মনে রাখা দরকার যে, তমদ্দুন ও সভ্যতা বলতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বুঝায়। সভ্যতা বলতে বুঝায় মানুষের কার্যধারার বিভিন্ন দিকগুলো, সামাজিক সংগঠন, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। বাইরের খোলস আর বাইরের কাজ এই যেন সভ্যতা। ম্যাকিভার (Maciver) বলেন : "Our culture is what we are, our civilization is what we use."

আমরা কি বা কি হতে পেরেছি এ'ই হল 'তমদ্দুন'। আর আমরা কি ব্যবহার করি এ'ই হল 'সভ্যতা'। স্পংলারের মতে মানুষের সভ্যতার ব্যবহারিক দিকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তমদ্দুনের অবলুপ্তির হয় শুরু। ম্যাসিগননের মতে : "Culture is a certain involution within... civilization, of characteristic educational tradition" (—Massignon : Reflections on Our Age, 1948, P. 134)। আর কান্ট বলেন, তমদ্দুনের সাথে নৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার অনাবিল সুখভোগ হল ম্যাথু আরনল্ডের তমদ্দুনের সংজ্ঞার নিরিখ—"The study of perfection, the disinterested search for sweetness and light."

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তমদ্দুনের ব্যাপক সংজ্ঞাটাকেই আমাদের নিতে হবে। ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণ সংজ্ঞা দেয়নি। 'দ্বীন' বলতে বোঝায় জীবন-দর্শন বা জীবনের একটি সুষ্ঠু আদর্শ। কাজেই ইসলামী তমদ্দুন যেমন একদিকে ব্যাপক হবে, তেমনি অন্যদিকে এই তমদ্দুন ইসলামের আদর্শভিত্তিক হওয়া চাই। ইসলামী তমদ্দুন বলতে মোটামুটি আমরা যা বুঝি তার

www.pathagar.com

মধ্যে প্রথম হল তওহীদবাদ, মানব-জীবনে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা—মানুষের সামাজিক জীবনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন নীতির প্রবর্তন। সার্বজনীন বিচার প্রতিষ্ঠা তওহীদবাদের লক্ষ্য। এ-ছাড়া আছে প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন কানুন, ইমান, নীতি, আচার, ব্যবহার যা ইসলাম পজিটিভরূপে বা অস্তিত্ববাচক হিসেবে নিজেই গড়ে তোলে।

প্রত্যয় বা চিন্তাধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নীতি. আচার-ব্যবহার যেগুলো তওহীদবাদ ও সার্বজনীন নীতির বিরোধী নয়, তাকে ইসলামী তমদ্দুন বলা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণভাবে সবই ইসলামী শিক্ষা, যদি তার আরম্ভ, উদ্দেশ্য ও সামাজিক ফল ভাল হয়। হযরতের সময়ে শিক্ষার এই সংজ্ঞাই দেয়া হত। [কুরআন ১৬ ঃ ১২; ৩ ঃ ১৯০–৯১; ৪৫ ঃ ১৩; ৩১ ঃ ২০; ১০ ঃ ১০২; ২ ঃ ১৬৪; ১৩ ঃ ২; ৩১ ঃ ২৯; ১৩০ ঃ ৫৪ ।] বলাবাহুল্য কালেমা' আমাদের শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া সব প্রভুত্ব নাশ করে জ্ঞানের মারফত মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন (Ideological culture) আর আদর্শ-নিরপেক্ষ তমদ্দুন (Chance culture)। এই প্রকারভেদ চরম পার্থক্য নির্দেশ নয়। আপেক্ষিক পার্থক্য নির্দেশ করা হল কেবলমাত্র বুঝবার সুবিধার জন্যে। কারণ আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন হলেই যে সেটি ভাল হবে তার মানে নেই। আদর্শটা কেমন তার উপরেই এটা নির্ভর করবে। যত নিকৃষ্টই হোক, হেঁয়ালিবাদ বা ঔদাসীন্যবাদও এক ধরনের আদর্শ। আদর্শভিত্তিক তমদ্দুনের ভেতরে—ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজম ও ইসলাম আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন।

জাতিবিদ্বেষ, শ্রেণীবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের উপর সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে না। হিটলারের আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব, হেগেলের সার্বজনীন প্রজ্ঞা (Universal spirit), স্পেংলারের বিশ্বসংজ্ঞা (World Plan—The powers of blood and race are more important than blood and money) কমিউনিজমের শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ আদর্শভিত্তিক হলেও সুষ্ঠু সামাজিক কল্যাণ আনতে পারে না। আদর্শ-নিরাপেক্ষ তমদ্দুনের ঐ একই দশা। আদর্শ নিরপেক্ষ তমদ্দুন হেঁয়ালিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তিগত স্বৈরাচার জাতিগত ও আঞ্চলিক নীতিবোধের ওপর গড়ে ওঠে। সেই আদর্শই মানুষের গ্রহণীয় হওয়া উচিত, যার—

* মৌলিক ভাব ও নীতিবোধ আনন্দ পাওয়া যেতে পারে ও যেটা সুকুমার;

* সামাজিক ফল মঙ্গলজনক; এবং

* যা থেকে অনাবিল মানবিক ও সার্বজনীন ও মানসিক প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী তমদ্দুন ও মুসলিম তমদ্দুন

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 'মুসলিম' তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনে আসমান জমিন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন নাও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানাকারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা যায় না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে—একজন অত্যাচারী শাসক 'খলীফা' বা নামে 'আমীরুল মুমিনীন' হলেই যথেষ্ট, তা তিনি ইসলামের সামাজিক বিধান প্রয়োগ করুন আর না করুন। সামাজিক ঐক্য বা সংহতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন আর এটা ইসলামের বিধান। কিন্তু জালিমী শাসনকেও 'আল্লাহর ছায়া' বলে—শাহানশাহ্ বা বাদশাহ বলে মেনে নেওয়া কিছুতেই ইসলামের নীতি-অনুগ হতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবে না। কেবলমাত্র 'ধর্মীয়' নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামের নীতির সঙ্গেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই। এই হিসেবেই (তথাকথিত ধর্মীয় নেতার অস্তিত্বের জন্যেই শুধু নয়) ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্মীয় বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামী তমদ্দুনের একটা বড় কথা।

যা হোক মোগল, তুর্কী ও ইরানী তমদ্দুনের প্রভাবের ফলে মুসলিম তমদ্দুনে জাতিগত বিদ্বেষ ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা ঢুকে পড়েছে ও ইসলামের সার্বজনীন দিকগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে। বাইরের পোশাকের দিকে দেওয়া হয়েছে বেশি নজর। ফলে মুসলমানদের তমদ্দুনে এমন একটা ভাব ঢুকে পড়েছে যে, যা ইরানী বা তুর্কী তাই ইসলামী আর যা ভারতীয়, ইন্দোনেশীয় বা ইউরোপীয় তাই ইসলাম বিরোধী। কিন্তু বিচার করে দেখা হয় না যে, এগুলো ইসলামী তমদ্দুনের মৌলিক দিকগুলোর বিরোধী কিনা।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও সাফ হয়ে যাবে। বাংলা ভাষায় লেখা হলেই যেমন কোন সাহিত্য ইসলামী হয় না বা ইসলামবিরোধী হয় না, তেমনি প্রত্যেক ভাষা সম্বন্ধেই সে কথা খাটে। আরবি, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা সম্বন্ধে ঐ একই কথা। একই ভাষাতে ইসলাম সঙ্গত ও ইসলামবিরোধী ভাবধারা প্রচার করা যায়। ভাষা সৃষ্টির ব্যাপারে বিশ্বনিয়ন্তার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'লাই কুরআনে বলেছেন, 'বিভিন্ন ভাষা ও রঙ সৃষ্টির ভেতরে মানুষের জন্যে রয়েছে অজস্র চিন্তার খোরাক' (সূরা রুম ৩০ ঃ ২২)। সব ভাষার সৃষ্টি ও বিভিন্ন রঙের মানুষের সৃষ্টি তাই তাঁর অভিপ্রেত। সাদা কালোর বিরোধ, জাতিগত বিদ্বেষ বা ভাষাগত বিদ্বেষ তাই আল্লাহর সৃষ্টি উদ্দেশ্যের ঘোর বিরোধী। কুরআন শরীফ প্রথমতঃ ছিল আরববাসীর জন্যেই। (অবশ্য এর গুঢ় উদ্দেশ্য ও সম্বোধন রয়েছে তামাম জাহানের মানব জাতির জন্যেই।) সেজন্যে কুরআন বলেছে : 'আরবি ভাষায় কুরআন রয়েছে, যাতে তোমাদের বোধগম্য হয়' (সূরা ফুসিলাত ৪১ ঃ ৪৪)। এত দ্বারা কুরআন এই নীতিরই প্রতিষ্ঠা করছে যে, শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে মাতৃভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বা মাধ্যম। জাতিগত বিদ্বেষ ধূলিসাৎ করে হযরত বলেছেন, অনারবদের উপর আরবদের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সবাই আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।

কাজেই এ-কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ভাষাগত পার্থক্য, জীবিকার পার্থক্য, পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু এগুলো কখনই আদর্শিক পার্থক্য নির্দেশ করে না। কারণ ইসলামী আদর্শ ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক নয়।

ইসলামিক জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরেই নির্ভর করে ইসলামী তমদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি।

ধরা যাক, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোন একজন লোক জিহাদের জিগির তুলল আর ঘোষণা করল—'আমি জিহাদ করছি।' কিন্তু এটা কি সত্যি জিহাদ হবে? কখনই না। আবার ধরুন, আর একটি লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি ভাল কাজে এগিয়ে এল, কিন্তু সে আরবি জানে না আর জিহাদ কথাটিও কোনও দিন শোনে নি। সে হয়ত ঘোষণা করল— 'আমি সত্যের জন্যে সংগ্রাম করছি।' আল্লাহর চোখে, মানবতার চোখে, সত্য ও ন্যায়বিচারের চোখে এ সংগ্রামই প্রকৃত 'জিহাদ' পদবাচ্য হবে। হাদীস বলেছে : 'উদ্দেশ্য দেখেই কাজের বিচার হবে'।

ভাষাগত আধিপত্য বা অন্য যে কোন রকমের সংকীর্ণতা ইসলামের প্রকৃত অগ্রগতির পক্ষে দারুণভাবে ক্ষতিকর। পোমাক্স (Pomaks) বা বুলগেরীয় মুসলিমদের ওপর জোর করে তুর্কীভাষা চাপিয়ে দেওয়া যে উসমানী (Ottoman) সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, তাও প্রায় সব ইতিহাস পাঠকেরই জানা আছে। ইতিহাসের শিক্ষা যেন আমরা গ্রহণ করি, নতুন সমাজ গঠনের ভাবপ্রবণতায় যেন আমরা নতুন করে ভুল না করে বসি।

www.pathagar.com

বাঙালি সংস্কৃতি এবং ইসলামী তমদ্দুন ও সাহিত্য

বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল পাল ও সেন বংশের আমলে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৈষ্ণববাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বৈরাগ্যবাদ, মায়াবাদ ও নির্বাণবাদের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। পালি ও প্রাকৃত ভাষার মারফত এই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।... তারপর এল তুর্কী বিজয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব যুগের অভ্যুদয় হল। বিজয়ী মুসলমানদের দরবারে বিজিতের এ বাংলা ভাষা সগৌরবে স্থান পেল। দুর্বোধ্য সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা ভাষা বিকাশের নতুন পথ বেছে নিল। এর ফলে যে বিরাট লোক সাহিত্য ও পুঁথি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে না পারলেও ইসলামী ভাবধারার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে তখন থেকেই পড়তে শুরু করে। বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতার চাইতেও মুসলমান ফকীর দরবেশদের প্রভাব এই ব্যাপারে কোন অংশে কম নয়। তারপর বৌদ্ধ সংস্কৃতির উদারনৈতিক ভাবধারাও এদেশে ইসলামের সার্বজনীন ভাবধারার প্রসারে কম সাহায্য করে নি। ওহাবী আন্দোলনের ভারতীয় ধারা পরবর্তীকালে এদেশীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে ইসলামবিরোধী ভাবধারা দূর করবার চেষ্টা করে।

কোন বিশেষ দেশের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামমুখী বা ইসলাম বিরোধী হবে তা বলা যায় না। বাংলাদেশ সম্পর্কেও এ কথা খাটে। প্রয়াসসাধ্য হলেও দুনিয়ার যে কোন ভাষার ভেতর দিয়ে ইসলামী সাহিত্য গড়ে তোলা যায়। (কুরান নাজিল হবার আগে আরবী ভাষা কাফিরদের ভাষা ছিল।) আরবি, ফারসী, উর্দু বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মারফত ইসলামী সাহিত্যের বিকাশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরবীতে কথা বললেই যে ইসলামী সমাজ থাকতে পারে না, বর্তমান আরবীয় কথা বললেই যে ইসলামী সাহিত্যের বিকাশেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আরবিতে সমাজই তার নজির। কাজেই বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতি বা ইসলামী তমদ্দুন ইসলামী থেকেও বাংলাদেশী হতে পারে, আবার বাংলাদেশী থেকেও ইসলামী হতে পারে। তবে তার ভেতরে ইসলামী ভাবধারার প্রভাব থাকা চাই এবং ইসলামী তমদ্দুনের যে-সব মাপকাঠির কথা আগে বলা হয়েছে (তওহীদ সার্বজনীন নীতি, ইসলামী চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সুষ্ঠু ইসলামী সমাজের সংগঠন, পরিশেষে আল্লাহর সৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও অনাবিল সুখ ভোগ) সেগুলোর উপরেই বাংলাদেশের ইসলামী তমদ্দুন বিকাশ লাভ করবে। এক সময় আরবিতে ইসলামের নামগন্ধ ছিল না, কিন্তু পরে আরবি ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গড়ে তুলতে কোন বাধা হয়নি। কাজেই মুসলমানের লেখা হলেই তমদ্দুনের দিক থেকে তা ইসলামী সাহিত্য নাও

www.pathagar.com

হতে পারে। ভাবধারার উপরেই এটা নির্ভর করবে। উর্দুতে লেখা হলেই মার্কসীয় সাহিত্য বা সিনেমা সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য পদবাচ্য হতে হবে তার কোন মানে নেই। তবে, সব সাহিত্য তওহীদের বিরোধী নয় ও মানব মনের সার্বজনীন দিকগুলো তুলে ধরে, সেগুলো ইসলামী সমাজে সাদরে গৃহীত হতে পারে। বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্যে তাই বর্তমানের মুসলিম সমাজের প্রতিফলন পাওয়া যাবে, এমন সাহিত্য-কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প ইত্যাদি বাঞ্ছনীয়। অন্য সমাজের চিত্র এতে থাকতে পারে, তবে সেটা মুখ্য উদ্দেশ্য হবে না। সার্বজনীন সাহিত্যের সামাজিক ফল তওহীদ বা মনের বিরোধী না হলে ইসলামী সমাজে গৃহীত হতে পারে এবং ইসলামী তমদ্দুন অনুযায়ী লেখকগণও তওহীদী তমদ্দুনের বিরোধিতা না করেও এগুলো লিখতে পারেন।

ইসলামী তমদ্দুনের সুষ্ঠু প্রচার ও ধর্মীয় সাহিত্য

বাংলাদেশের সাহিত্যে মুসলিম কৃষ্টি জীবন-আলেখ্যই বেশি স্থান পাবে; কেননা এখানে লোকসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগই হলো তারা। কিন্তু ইসলামী তমদ্দুনের প্রধান স্বরূপগুলোই তার হাবভাব নিয়ন্ত্রিত করবে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এটা আরও সহজ হয়ে উঠবে।

মোগল সংস্কৃতি ও বাংলাদেশের ইসলামী তমদ্দুন

বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ইসলামী তমদ্দুনের নাড়ির যোগ রয়েছে। অন্যান্য জায়গায় ভাবধারার চাইতে বাহ্যিক পোশাকের চটক ও জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতাই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এর পেছনে ঐতিহাসিক ও তামুদ্দুনিক কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলজীর আসার অনেক আগেই চট্টগ্রামে ও দক্ষিণ ভারতে আরব ব্যবসায়গণ আগমন করেন। এদের সঙ্গে অনেক ফকীর দরবেশ ও মুসলিম প্রচারকও আসেন। মালাবার উপকূলে মোপলা মুসলমানদের মধ্যে ও বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বজনীন ও প্রকৃত প্রগতিশীল ও মানবিক ভাবধারার হদিস মেলে। এ সব জায়গা ছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে ইসলামের তওহীদী ভাবধারার চাইতে পারসিক তুর্কী ও মোগল সভ্যতার জাঁকজমক, বাদশাহী হাবভাব ও জাতিগত সঙ্কীর্ণতা বেশি পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণে আলীগড় আন্দোলনের বিরাট দান অনস্বীকার্য। তবুও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভাবধারায় সঙ্কীর্ণতা স্থান পেয়েছে। মুসলিম রাজা বাদশাহরা এদেশ শাসন না করলে ও ইসলামের সার্বজনীন ভাবধারায় পুষ্ট

www.pathagar.com

চিন্তাবিদদের হাতে রাজনৈতিক ও তামুদ্দুনিক আন্দোলনের ভার থাকলে, এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ যে অনেক গৌরবজনক হত ও ইসলামী জীবনবোধের রূপায়ণ অনেকখানি সহজ হয়ে যেত তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ও কবিতা, চারুকলা ও সঙ্গীত

তারপর আসে চারুকলা ও সাহিত্যের সাধারণ প্রশ্ন। সাধারণ সাহিত্য ও চারুকলা কি আদতেই ইসলামবিরোধী? চারুকলা ও সাহিত্যের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে মানুষের বিচার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ভেতরে। আর এগুলোকে কুরআন হাদীসে আল্লাহর নিয়ামতরূপে বা মহাদানরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কলা ও সাহিত্যের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে সুন্দরতর করা আর এ ধরনের পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করা, যাতে করে মানুষ সার্বজনীন ও অনাবিল সুখের অধিকারী হতে পারে। মূর্তি থাকলেই যে তা ইসলাম বা তওহীদ বিরোধ নয়, কুরআন থেকেই আমরা এর প্রমাণ পাই। হযরত সুলায়মান ইসলামেরও নবী। তাঁর জন্যে জ্বিনেরা বড় দালান, (বাড়ি সাজানোর) মূর্তি, থালা, ঘটি-বাটি তৈরি করেছিল। (সূরা শেবা ৩৪ ঃ ১৩)

কলা ও সাহিত্য ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী নয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তার সামাজিক ফল ইসলামের তওহীদবাদ ও নীতিবোধের বিরোধী কি না। প্রত্যেক জিনিসেরই অপব্যহার আছে, কিন্তু এ অপব্যবহারের ভয়ে মধ্যযুগীয় 'আলিমগণ' চারুকলা ও সাধারণ সাহিত্য বিকাশের যে বিরোধিতা করেছেন, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ মাপকাঠিতে তা ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী। হযরত বলেছেন : "দুটি পয়সা পেলে এক পয়সার খাবার কিন, আর এক পয়সার কিন ফুল।" বিশ্বস্রষ্টা তাঁর কুরআনে প্রকৃতির দিকে চেয়ে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। হযরতও বলেছেন : "আল্লাহ চিরসুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন।"আল্লাহর প্রত্যেক নবী ফুলের খুশবু, আতর ও গন্ধদ্রব্য পছন্দ করতেন। হযরত আরও বলেছেন, 'দুনিয়াকে আমি ভালবাসি, কারণ এখানে আছে খুশবু জিনিস ও নারী। তাই সৌন্দর্যবোধ ও চারুকলা ইসলামবিরোধী হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক জিনিসের অপব্যবহারের মত চারুকলা, সংগীত ও কবিতা যখন মানুষকে অমানবিক, অসামাজিক ও নীতিহীন কাজের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর তওহীদবাদ বা আল্লাহর একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত করে তখনই এগুলো ইসলামী তমদ্দুনের ঘোর বিরোধী হয়ে পড়ে। তওহীদের বিরোধিতা করবে বা অতিরিক্ত বিলাসিতার দিকে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে কোন প্রাণীর ছবি আঁকতে এবং কবরের উপর সৌধ গড়তে হযরত নিষেধ করেছিলেন। ইসলাম চায় সার্বজনীন আনন্দ। ইসলাম চায় না শিল্প গুটিকতক ধনী বা শাসকের বিলাস-সামগ্রী হোক এবং এদের

www.pathagar.com

খেয়ালিপনা চরিতার্থ করার জন্যে জনসাধারণ শোষিত হোক কিংবা তাদের দ্বারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হোক। শিল্পকে ইসলাম অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেয়, কিন্তু শিল্পকে বিলাসিতায় পর্যবসিত করে ধনিক বা শাসকগোষ্ঠি মশগুল থাকলে তারা রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন না। ইসলাম এ ধরনের শিল্পকেই বাধা দেয়।

সৌন্দর্যবোধ ও তার মারফত সৌন্দর্য সৃষ্টি কখনই আল্লাহর অনভিপ্রেত হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্যই বিশ্ব রহস্যের অন্তর্নিহিত সুর। সংগীত ও কবিতা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। মাদকদ্রব্য ও নারী জাতির ইজ্জতহানি করে যে সংগীত পরিবেশন করা হয় তা নিশ্চয়ই ইসলাম-বিরোধী। কিন্তু সংগীত ইসলাম-বিরোধী হতে পারে না। সংগীতজ্ঞরা ও ক্বারী হাফেজেরা এ-কথা ভালভাবেই জানেন যে, কুরআন তিলাওয়াত, মীলাদ শরীফ পাঠ ও আযানের ভেতরেও বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনবোধে বা কোন অনুষ্ঠানের সময় হযরত গান-বাজনার ভেতর দিয়ে আমোদ-আহলাদ করতে বাধা দেননি বরং উৎসাহই দিয়েছেন। এখানে হযরত আবুবকরের বাড়িতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে কুমারীদের সংগীত শোনার কথা উল্লেখ করা যায়। লড়াইয়ের মাঠেও কুরআন শরীফের আয়াত সুর করে গাওয়া হত— (Ameer Ali-History of the Saracens ; Macmilan and Co., 1251, P. 65)

খন্দকের যুদ্ধে সাহাবীদের সঙ্গে পরিখা খননের সময়ে হযরত নিজে কাজ করেছিলেন আর সুরের সাথে গেয়েছিলেন—

"লা-খাইরা ইল্লা—খাইরাল আখিরা;
আল্লাহুম্মা আরহামাল আনসারা
ওয়াল মুহাজিরা।"

: আখেরাতের শুভ ছাড়া, শুভ নেই কো আর,
আনসার ও মুহাজিরে রহম কর, পরওয়ারদিগার।

সৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা চিত্তবিনোদনের জন্যে যে কবিতা ও গান লেখা হয় তা ইসলামবিরোধী হতে পারে না। কাফিরেরা খণ্ড কবিতা লিখে হযরতকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সেজন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে, "কবিরা মিথ্যাবাদী"। আবার অনেক কবি ইসলামকে সমর্থন করে কবিতা লিখেছিলেন। হাসান-বিন সাবিতের নাম এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কুরআন শরীফই তো একটা উঁচুদরের কাব্য, যাকে হযরত "আমার একমাত্র অলৌকিকতা" বলে দাবী করতেন।

www.pathagar.com

শিল্পকলা ও সাহিত্যের উৎস কি শ্রেণী সংগ্রাম?

মার্কসবাদের সাহিত্যরূপ ব্যাখ্যাকারী লেনিনের মতে প্রগতিশীল তমদ্দুন ও সাহিত্য সব সময়ই শ্রেণীভিত্তিক ও সংগ্রামমুখী হবে। আমাদের মতে কথাটা আংশিক সত্য। সমাজের এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় বা সমাজের এমন অবস্থা প্রকৃতই থাকতে পারে, যখন জনগণের রুটির লড়াই, ভুখা-মিছিলের ছবি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবে; কেননা সাহিত্য হচ্ছে সমাজেরই ছবি, "জীবনের সমালোচনা"। কিন্তু কলা ও সাহিত্যের ভিত্তি শ্রেণী সংগ্রাম নয়, মানবমনের কৌতূহল ও সৌন্দর্যপ্রীতিই এর পেছনে কাজ করছে। চলে যাই আমরা সেই আদিম সমাজে, যখন মানুষ খাদ্যের খোঁজে পাহাড়ে জঙ্গলে সংগ্রাম করে চলেছে। অস্ত্রশস্ত্রের ছবি হয়ত সে আগে আঁকতেও পারে, কিন্তু এ আঁকার পেছনে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির চাইতে কৌতূহল ও সৌন্দর্যবোধই বেশি কাজ করেছিল। হয়ত সে গুহার দেয়ালে দিল এক আচড়। বেশ লাগল তার কাছে এ আচড়টা; আরও কয়েকটি আচড় হয়ত গড়ে তুলল সুন্দর ছবি—প্রথম মানবশিল্পীর এক সার্থক সৃষ্টি। লেনিন যদিও স্বীকার করেছেন যে, বুর্জোয়া-সাহিত্যকে অবলম্বন করেই শ্রমিক সাহিত্য গড়ে উঠবে, তবু তিনি সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের কথাই বেশি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কলা ও সাহিত্যের মূল উৎসটুকু দেখান নি।

সাহিত্যের মার্কসবাদী ধারণার পাল্টা জবাব দিয়েছেন টি. এস. ইলিয়ট। তিনি বলেন যে, শ্রেণী ব্যবধানই তমদ্দুনের অগ্রগতি ও বিকাশের বড় কারণ। শ্রেণীবিভাগ না থাকলে তমদ্দুনের জন্মও হয় না, উন্নতিও হয় না।

শ্রেণীবিভাগ বলতে তিনি যদি প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ বোঝেন তবে এ কথা মানব প্রগতিবিরোধী নয়। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ বলতে শ্রেণী আধিপত্য বোঝালে এ মতবাদ ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল।

মানব সংস্কৃতিতে সুষ্ঠু জীবনবোধের আবশ্যকতা

প্রাচীন গ্রীক দর্শন থেকে আজ অবধি দর্শনের পেছনে মানুষ ছুটেছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতি এসব দর্শন দিতে পারেনি। কোন দর্শন হয়ত সমাজকে দেখতে গিয়ে মানুষের মনকে অবহেলা করেছে, আবার কোনটা বা মনের উপর জোর দিতে গিয়ে সামাজিক সংগঠনের দিকে নজরই দেয়নি। এজন্যেই মানুষের তমদ্দুন ও কলা সাহিত্যে সুষ্ঠু জীবনবোধ ও জীবনাদর্শের আবশ্যকতা রয়েছে। সে জীবন-দর্শন একদিকে যেমন সমগ্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো মেটাবে, তেমনি মানবিক গুণের ও সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ সাধন করে অনাবিল সুখ ভোগের দুয়ার খুলে

www.pathagar.com

দেবে। "Arts for Arts sake"—"শিল্পের জন্যেই শিল্প"—সত্যি সত্যিই শেষের কথা। কিন্তু সুষ্ঠু জীবন দর্শনের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে শিল্পভোগ ও আনন্দবোধ তো দূরের কথা মাঝপথেই মানুষের হয় পতন। সামাজিক বিচার ও খাদ্যভোগ করাই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ইসলাম মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের এক সুষ্ঠু জীবনধারা দিতে পেরেছে। সামাজিক ফল খারাপ না হলে ও তওহীদবাদের বিরোধী না হলে শিল্প সাহিত্যের বিকাশ ও অগ্রগতি কোন ক্ষেত্রেই ইসলামী তমদ্দুনের বিরোধী নয়। মানব সমাজের সুষ্ঠু সংগঠনের জন্যে আল্লাহ্ ইসলাম নাজিল করেছেন, যার সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির ও সৌন্দর্যের কোন বিরোধিতা নেই, বরং একটি অপরটিরই পরিপূরক। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ইসলামের মৌলিক ভাবধারাকে দুর্বল করা তো দূরের কথা তাকে সবল করেছে, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও নতুন সমাজ

পরিশেষে ইসলামী তমদ্দুনকে কিভাবে আবার সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত পেশ করে আমার আলোচনা শেষ করবো। ইসলামী তমদ্দুনের মৌলিক ও সার্বজনীন নীতিগুলোর বিশ্লেষণ ও প্রচার এবং শিক্ষা।

তথাকথিত মুসলিম তমদ্দুন থেকে সঙ্কীর্ণতা, ভাষাগত ও জাতিগত গোঁড়ামি এবং তওহীদ ও মানবতা বিরোধী হাবভাব দূর করা। আল্লামা ইকবাল এগুলোকে "আরবীয় সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন' (The stamp of Arabian imperialism) বলেছিলেন।

ইসলামী সমাজ কায়েম করা—ইসলামের নীতির মারফত সামাজিক সমস্যার সমাধান—ইসলামী সমাজ নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণ—ইসলামের মূলনীতি থেকে সরে না গিয়ে জ্ঞানলাভ ও মঙ্গলজনক সব কিছুই গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের ভেতর থাকা চাই। "বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা কর—আল্লাহ্ কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেননি।"—(আল-কুরআন)

www.pathagar.com

২.

জীবন-দর্শনে ধর্মের ভূমিকা

মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। কী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কী শিল্পকলায়, কী সমাজ উন্নয়নে, সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতি ও আন্তরিকতা আবহামান কাল থেকে সমাজ-জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। মানব-মনের যে মরমী অন্তঃপ্রবাহ থেকে ধর্ম উৎস খুঁজে পেল, তা এশিয়ার মাটিতেই ষোলকলায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

আধুনিক যুগের মানুষ ধর্মকে নেহাৎ বুদ্ধিগত কার্যক্রম বা জ্ঞানের সসীমতার প্রকাশ মনে করে; কিন্তু নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় ধর্মের গোটা রূপ ধরা পড়ে না। আর দ্বিতীয় সংজ্ঞায়—অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের অভাব ধর্মের পতন করেছে এ ধারণার মধ্যে ইমান, ইবাদাত সবই বাদ পড়ে যায়। এ থেকে আরো একটি ধারণার উদ্ভব হয়েছে। সেটা হল দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্র্যের ফলেই মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু এ-সব কথা ধর্মের আসল রূপটি তুলে ধরতে পারে না। সুস্থ, সবল সাধারণ মানুষেরও যে ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মীয় প্রয়োজন রয়েছে এ কথাটি একেবারে বাদ পড়ে যায়, বিশ্বের আদিসত্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন, সম্পর্কের যোজন, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সামাজিক-গোষ্ঠিগত, পারিবারিক ও জাতিগত ভিত্তিতে ধীরে ধীরে ধর্ম বিকাশ লাভ করে। মানব সমাজের এ বিবর্তন থেকে আলাদা করে নতুন ধর্ম গড়ে তোলা অসম্ভব ব্যাপার—আর সে চেষ্টা করলে তা নতুন দর্শনে রূপান্তরিত হবে। নতুন ধর্মে রূপ পরিগ্রহ করবে না।

আদর্শ হিসেবে ধর্ম তাই মানব জীবনে অপরিহার্য, যুগে যুগে ধর্ম যে কেবল মানুষের দুঃখের দিনে আশার বাতি জ্বেলেছে তা'ই নয়—মানুষের নবজন্মের দিশারীরূপে কাজ করে এসেছে। ধর্ম যখন জীবন বাণী হিসেবে মানুষের সমগ্র সত্তা ও গোটা জীবনকে আন্দোলিত করে, তখনই ধর্মের এ ভূমিকা সার্থক হতে পারে—সমাজ বিবর্তনের বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও জীবনবোধ অটুট থাকে।

www.pathagar.com

বিচিত্র পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্মের বাহ্যিক রূপ পাল্টেছে কিন্তু তার মৌলিক সুরের ঐকতান আজও ধ্বনিত হচ্ছে। নানা কারণে হিন্দুধর্ম বলতে ঠিক কি বুঝায় জানবার উপায় নেই। তবু প্রাথমিকভাবে বৈদিক ধর্ম ও মোটামুটি গীতার ধর্মকেই হিন্দুধর্ম বলা যেতে পারে। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সাধারণ হিন্দুর জীবনে ধর্মের অপরিসীম প্রভাব অস্বীকার করার পন্থা পরিবর্তিত করার উপায় নেই। মানুষের জীবনে নানা পরিবর্তন বিবর্তনের মাঝে নিয়ন্ত্রণের পন্থা পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ধর্ম বলতে মানুষের সমগ্র জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি বুঝায়। গীতায় এ জীবন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা ধর্মের লক্ষ্য হয় নি—বিশ্বনিয়ন্তার শক্তির আলোকে মানব-জীবনকে বিকশিত করাই হয়েছে ধর্মের উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধধর্মে সুষ্ঠু জীবনের আটটি পথ দেখান হয়েছে। এ অষ্টমার্গে পৌঁছানোর চাবিকাঠি হল মধ্যপন্থা ও মিতাচার। হত্যা, মিথ্যা, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার নিন্দিত ও ঘৃণিত। সমগ্র জীবনের যে নিয়ম তাকে লঙ্ঘন না করে প্রতিপালন করবার জন্যে রয়েছে আহ্বান। জীবে দয়া ও অহিংসা এর মূলমন্ত্র। ধর্ম কোন গোষ্ঠি বা জাতিবিশেষের জন্যে নয়। ধর্মের মূল সুর সার্বজনীন হতে বাধ্য। চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ। ইরানের জরথুস্ত্রবাদে বলা হয়েছে—মানবজীবন সংগ্রামের জীবন—মানুষ যা ভোগ করবে তা নিজের হাতে, মেহনত দিয়ে অর্জন করে নেবে। বিশ্বনিয়ন্তাকে ভালবাসলে মানুষকেও ভালবাসা যায়। ধর্মের সারবস্তু হলো সত্য। আর আইনের মৌলিকতা পুণ্য। মানুষ তার কাজের জন্যে দায়িত্বশীল। বিশ্বস্ততা "আহুরা মায্‌দা" বা বিশ্বপ্রদীপের সাথে—"আহরিমানের" (আকোমানি) সংগ্রাম চলছে অনুক্ষণ। আহরিমান অন্ধতা ও কালিমার প্রতীক। "আহুরা মায্‌দা"র সাহায্য নিয়েই মানুষ পাপ কালিমা দুঃখ দুর্দশা পার হয়ে যেতে পারে।

পারসীদের দৈনন্দিন জীবনে এ মতবাদের প্রভাব অপরিসীম। সত্য, সৎচিন্তা, দয়া ও কর্মময় জীবন এ ধর্মের মূলকথা। ধর্ম সার্বজনীন ও এ জীবনে এর প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। চীনের কনফ্যুসীয়বাদ মধ্যপন্থাকেই ধর্মের সারবস্তু করেছে। 'মঙ্গলকে মঙ্গলের মাধ্যমে মন্দকে ন্যায় নীতির দ্বারা জয় কর।' উদারতা, সাধুতা উপযোগিতা, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা কনফ্যুসীয়বাদের মূলমন্ত্র; তার বক্তব্য হল জীবনকে গ্রহণ করতে হবে ও সমাজের সাথে সুষ্ঠু সম্পর্ক ও সমঝোতা স্থাপন করতে হবে। এমনি করেই শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। এর নামই হল "লী"

www.pathagar.com

(Harmony)। মাতা-পিতা স্বামী স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন চীনের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। লাওৎসে "টাও" বা জীবন পথের কথা বলেছেন—এ পথ বিশ্বস্ততা, দয়া, ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পথ—অমঙ্গলকে মঙ্গলের মাধ্যমে জয় করার পথ। কনফ্যুসীয়াস ও লাওৎসের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, লাওৎসে সামাজিক জীবন থেকে কিছুটা দূরে সরে থাকবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ দিক দিয়ে লাওৎসের মতবাদ বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের স্বভাবধারাজাত।

সন্ন্যাসবাদ ইহুদী ধর্মের লক্ষ্য নয়। এ জীবনকে আল্লাহ্‌র নীতির আলোকে সুখী সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। পরিপূর্ণতা লাভ করতে হলে মানুষকে কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হবে। হযরত মুসা (আ.) বলেন : আল্লাহ্‌র শক্তি অপরিসীম, চিরন্তন ও সর্বব্যাপী। তাঁর থেকেই মানুষের জীবনে আদর্শের রূপ প্রতিফলিত হয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা-বাস্তব ও আধাত্মিক বিকাশের মধ্যেই সাধনার পথে তার ঊর্ধ্বগতি। দশটি উপদেশের মধ্যে রয়েছে : একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করা, মূর্তি পূজা না করা, মাতাপিতাকে ভক্তি করা, অযথা নরহত্যা না করা ও প্রতিবেশীর ধন সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না রাখা।

শোষিত নিপীড়িত রোমক সাম্রাজ্যে শান্তির বাণী নিয়ে এলেন হযরত ঈসা (আ.)। নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে শোনালেন আশ্বাস বাণী, দেখালেন আশার আলো; বললেন : আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শুধু বেহেশ্‌তে নয়, দুনিয়াতেও রূপায়িত হবে। মানুষ যখন সমাজে জন্ম নেয় তখন তার ঋণের শেষ নেই—এ ঋণ তাকে পরিশোধ করতেই হবে। সমগ্র মানুষের জন্যে প্রেম, দানশীলতা সাম্যের বাণীও প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবনের হাসি আনন্দ হযরত ঈসাকে সমানভাবে আন্দোলিত করেছে। এ সব তিনি কখনই বাদ দিতে চান নি। ভাল মন্দ সব মানুষই আল্লাহ্‌র সন্তানের মত। পরবর্তী কালে—"আল্লাহ্‌র পাওনা আল্লাহ্‌কে ও সীজারের পাওনা সীজারকে মিটিয়ে দাও—হযরত ঈসার এ বাণীর এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণরূপে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মৌলিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি মানুষের জীবনে দ্বৈত নীতির দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করার কথা কল্পনা করতেও পারেন নি। আর তা করলে খ্রিস্টান ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

ধর্মের ইতিহাসে সর্বশেষ বিবর্তিত ধর্ম ইসলাম। এর প্রাণনির্যাস হল তওহীদে আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন এ কথা প্রচার করে ইসলাম। সে সৃষ্টি করছে আল্লাহ্ পাক ও মানুষ এবং মানুষের সাথে মানুষের বিরাট ঐক্যবন্ধনী। এ থেকে যে কেবল জীবন

www.pathagar.com

সম্পর্কে একক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়েছে তাই নয়, তওহীদ নিয়মের রাজত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিজ্ঞানেরও প্রেরণা দিয়েছে। এতে করে নীতিবোধ, আইন ও ন্যায়পরায়ণতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মানবমঙ্গল তওহীদের শেষ পরিণতি। তওহীদ তাই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী নয়, সামাজিক ও মানসিক প্রত্যয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব জাতির মধ্যেই আল্লাহর নবীরা এসেছেন ও তাঁরা তওহীদ, নৈতিকতা ও সুবিচারের অমিয় বাণী প্রচার করে গেছেন। এসব নবীতে ঈমান রাখা ধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবেও সাব্যস্ত হয়েছে। আর রসূলে আকরাম (সা.) সেই ধর্মকেই পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। একেই বলা হয় রিসালতের নীতি। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব, মানুষের অধিকার ও "খিলাফত নীতি" কেবল ইসলামেই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন : সব মানুষকে যে ভালবাসে আল্লাহ্‌কে সে ভালবাসে।

ইসলাম বাস্তব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয় সাধন করেছে। পার্থিব জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, জীবনের বিকাশ ও বাস্তব ভিত্তি ও আধ্যাত্মিক পার্থিব জীবনের নৈতিক গাঁথুনি। বাস্তব জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। তবু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সব জ্ঞানের শেষ নয়। লতিফা বা কালবের বিকাশের মাধ্যমে যে জ্ঞানের নতুন দরজা খুলে যায়, এ পথে সাধনা করতে হলে আত্মশুদ্ধি, প্রেম অর্জনে সম্যক জ্ঞান চৈতন্য চাই। তবেই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয়। আদর্শের ধারণার ধর্মীয় আদর্শের সর্বোত্তম বিবর্তন তওহীদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। জাগতিক ঐক্য, মানবিক ঐক্য, সাম্য স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল। ইসলাম-এর ওপর জোর দিয়ে যে বিপ্লবের গোড়াপত্তন করেছে, নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীতে সুপবিস্ফুট ও সদাজাগ্রত।

কিন্তু ধর্মীয় আদর্শের শেষ কথা তার প্রত্যয়ের মাঝেই কেবল নয়— রূপায়ণেই তার আসল পরিচয়। পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী রূপায়ণের মাধ্যমেই কেবল তওহীদের সর্বপ্রসারী বাণী আমাদের বাস্তব জীবনে সুফল ফলাতে পারে।

ধর্মের বিকৃতি ও ধর্মকে একই পর্যায়ে ফেললে এ কাজে হাত দেয়াই যাবে না। মোল্লা পুরোহিতের অহেতুক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের চাপে অনেক সময় মানুষের সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতির অপমৃত্যু ঘটে। আবার জীবন দর্শনকে সমাজ

www.pathagar.com

অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ মনে করলে ধর্মকে সত্যিকারভাবে জীবনে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। কারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে পরিপূর্ণতা লাভ ধর্মের মৌলিক বস্তু। ধর্ম সার্বজনীন। যেহেতু ধর্মকে সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করতে হয়, তাই ধর্ম সমাজগোষ্ঠির মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। সত্য এক হলেও তার অনুশীলন হয় ভিন্ন। একে সঙ্কীর্ণতা বলা ভুল। সমগ্র জীবনের অনভূতিকে দোলা দেয় বলেই দর্শনের মধ্যে নয়—ধর্মের মধ্যেই সমাজ জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার রয়েছে। ঐক্য, প্রেম ও আত্মোৎসর্গের মধ্যেই এ পরিবর্তনের ইশারা। ধর্মীয় অর্থের সেরা জাতি বা মধ্যম জাতির তাৎপর্য গোষ্ঠিগত নয়—আদর্শের উন্মোচনে ও রূপায়ণেই তার আসল পরিচয়। এ পরিচয় তাই চিরচিহ্নিত নয়—যাদের মধ্যে সত্যিকার ধর্মীয় সাধনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভূমিকা নেই তারা তাই ধর্মের দিক থেকে পরিচয়হীন। পরিশেষে এ কথা সেরে রাখা ভাল যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Socio-cultural determinism) ধর্মের একটি দিক দেখাতে পারে মাত্র। তা হল ধর্মীয় পরিবেশ ও বিবর্তনের কথা, তার বেশি নয়। ইবাদাতের সময়, বিবেকের দংশনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কিংবা জীবনের আদি পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তায় কিংবা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সম্পর্ক স্থাপনে ধর্মের কাছে মানুষকে আসতেই হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এ ধারণা মূলতঃ বাড়বে বৈ কমবে না, ধর্ম যেমন বিজ্ঞানকে সাথে নিয়ে চলবে, তেমনি বিজ্ঞানও ধর্মের নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠু ও পরিণত হতে পারবে। কারণ, ব্যাস, কনফ্যুসিয়াস, বুদ্ধ, হযরত মুসা, ঈসা (আ.) ও মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভূত না হলে পৃথিবী যে অনেকখানি পিছিয়ে থাকত, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩.
প্রগতি কোন্ পথে

যাঁরা বলেন যে, মানুষ কেবল ভাল বুঝে কাজ করুক—ধর্ম কথা একটা লোক-ঠকানো বিষয় মাত্র, তাঁদের কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি। কেন পারি নি, তাই বলছি। কারণ "ভাল বুঝে" কথাটির ভেতরে অনেক বোঝার গোলমাল ও কাজের গলদ রয়েছে। অনেক সময়েই মানুষের চিন্তাধারা বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অসরল পথের অনুকূল। মানুষ (ব্যক্তি, জাতি বা গোষ্ঠি) যা নিজের জন্য ভাল মনে হয় তা করবার পরেও এবং পরিবেশের উপর প্রভূত্ব পেয়েও বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক গোলামির শৃঙ্খলকে বেঁধে চলেছে নিজের পায়ে, জোরে—আরও জোরে। যতই সময় এগিয়ে চলেছে, ততই। কথা হচ্ছে, ইচ্ছা করলেই যা সবার জন্যে ভাল শুধু তা-ই কেন, কখন কখন বা শুধু নিজের জন্যে যা ভাল তাও কার্যে ফলানো যায় না। বর্তমান দুনিয়ার শক্তি সংঘর্ষ ও যুদ্ধই এর প্রধান নজির। এর জন্যে যেমন সুসঙ্গত পরিবেশ দরকার, সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দের একটি নৈতিক মানদণ্ডও দরকার তেমনি। নতুবা মানুষের পদে পদে হয় অধঃপতন—এগিয়ে গিয়ে সে পিছু হাঁটে। সাময়িকভাবে সময়ের প্রয়োজনবোধে একটু-আধটু নৈতিক মানদণ্ড দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম দিয়ে গেছে। নৈতিক মানদণ্ডের পরিপূর্ণতা ও তার পরিপোষক পরিবেশ সৃষ্টির শিক্ষার বিকাশ হয়েছে ইসলামের ভেতর দিয়ে। ইসলাম দিয়েছে মানুষের জীবনের মানদণ্ড—মানুষের বিবেক প্রচেষ্টা ও মনীষা তাকে কাজে লাগাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করতে হবে সমবিচার ও মৌলিক ভাবের উপর লক্ষ্য রেখে। মনে রাখতে হবে যে এই মানদণ্ডই যথাসর্বস্ব নয়। তাই যদি হত তবে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে এনে কাজে লাগাবার কথা ইসলামের কুরআনে থাকত না, অতীতের মুসলমানেরা সভ্যতায় তাদের চিহ্ন রেখে যেতেও পারতেন না—হাদীসেও থাকত না শিক্ষার জন্য চীন দেশে যাবার কথা। এই কথাটুকু মনে রাখলেই পাওয়া যাবে প্রগতির পথে ইসলামের মহা-অবদান।

www.pathagar.com

প্রগতির পথ তবে কোন্ পথ? প্রগতির পথ হচ্ছে সেই পথ যে পথে অনুসন্ধানী মানুষ বাস্তব ও হৃদ্য মানবতা নিয়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামগ্রিকভাবে মানবিক উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে ও ইসলামের নৈতিক মানদণ্ডের মৌলিক ভাবের নেতৃত্বে এগিয়ে চলে—সমাজে বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদে। ইসলাম এই কঠোর পরিশ্রম করবার জন্যেও অবিরাম পরিবর্তনশীল পরিবেশের সামনে জীবনকে তুলে ধরবার জন্যে উদ্দীপনা ও নৈতিক মানদণ্ড উভয়ই দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে চেয়ে দেখি—মানুষ যখনই এর একটিকে ভুলেছে তখনই সে পিছিয়ে পড়েছে।

মুসলমানেরা যখন কেবলমাত্র নৈতিক অনুশাসনকেই যথাসর্বস্ব মনে করল—তার মৌলিক ভাবকে ভুলে গেল—পরিশ্রম করা ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরতে ভুলে গেল, জীবনের সঙ্গে নীতির যখন কোন বাস্তব ও সক্রিয় যোগাযোগ রইল না—তখনই হিমানী সম্পাতের মতো তার পতন ঘনিয়ে এল। নৈতিক মানদণ্ডের দিকটাতে তারা মোটামুটিভাবে অনভ্যস্ত হয়ে রইল। অথচ তাদের নাম থেকে গেল ঐ এক মুসলিমই। এদিকে অন্যান্য জাতিরা ইসলামের ইজতিহাদী সাধনাকে নিয়ে তাকে নানাভাবে পুষ্ট ও প্রসারিত করে তুলল। তার নীতির মানগুলোই ঘাত-প্রতিঘাত ও পরীক্ষা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কিছু কিছু গ্রহণ করল। অথচ মুসলিমেরা এদেরকে বিধর্মী বলেই আখ্যাত করে এসেছে, তাদের মূল্য স্বীকার করে নি আর নিজেও অনেককাল ইজতিহাদী পথ ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। জ্ঞানবিজ্ঞান ও বাস্তব সভ্যতা থেকে সে তাই পড়েছে অনেক পিছিয়ে। ইজতিহাদী ও বাস্তব সামাজিক দিকটাও যে ইসলাম, এ কথা তারা ভুলে গেছে। আমাদের অধিকাংশ মোল্লা উলামারা এই পর্যায়ের। ইজতিহাদী সাধকেরা অনেক দিক দিয়ে নীতিহীন হলেও বাস্তব সভ্যতায় তাদের দানকে খাটো করে কোন ফায়দা নেই। আর এই দিকে অনুসন্ধানে অনুপ্রেরণা তো ইসলামই জুগিয়েছে। তাই মুসলমানের পতন হয়েছে—ইসলামের সামাজিক কার্যধারা, ইজতিহাদ ও নীতির বাস্তব রূপায়ণের অভাবের ফলে, ইসলামকে অনুসরণ করার ফলে নয়। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে পুরোপুরিভাবে জীবনে গ্রহণ না করার ফলেই। সমাজ বিজ্ঞানীকে এ-কথাটা কখনই ভুলে গেলে চলবে না।

প্রগতির জন্যে মানুষের আমিত্ব ও নীতি উভয়ই চাই। একটিকে ছাড়লেই শান্তির পথে ব্যাঘাত হয়। কারণ প্রগতির পথ যেমন অবিরাম কর্মচঞ্চলতার পথ

www.pathagar.com

তেমনি সবিরাম শান্তি উপভোগেরা পথও বটে। বর্তমান ইউরোপের নীতিজ্ঞানহীন বস্তুতান্ত্রিক সাধকেরা বাস্তব বিষয়ে ইজতিহাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু এটা ইসলামের ইজতিহাদ নয়। কারণ, তারা নৈতিক পরীক্ষায় শূন্য পেয়ে বসে আছে। আমিত্ব ও বস্তুতন্ত্রকে তারা সংযত গণ্ডির বাইরে ছেড়ে দিয়েছে। ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কারকে তারা ধর্মের সঙ্গে এক গোষ্ঠিতে স্থান দিয়েছে ও ধর্মীয় মূলনীতির কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, নৈতিক মানদণ্ডের মূল্য সঠিক নিরুপণ করতে তারা অপারগ হয়ে পড়েছে। আমাদের অধিকাংশ উলামারা যেমন কাজ ছেড়ে শুকনো নীতির নীল চশমার ভেতর দিয়েই পৃথিবীর মূল্য নির্ধারণে ব্যস্ত হয়েছেন, তেমনি আমিত্ব ও বাস্তব প্রয়োজনের হলদে চশমার ভেতর দিয়ে এঁরা জিনিসের বিচার করেন। নিজের ঠুসির রঙেই তারা পৃথিবীকে দেখেন, আর এর রূপ বিচার করেন। ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ শিক্ষাভিমানীরা এই দলভুক্ত। নীতি ছেড়ে শুষ্ক বস্তুবাদ গ্রহণের ফলে পৃথবীতে অহিংসা ও হানাহানি চলেছে, মানুষের নৃশংসতায় নিরীহ মানুষ ব্যথিত মথিত হয়েছে বারে বারে। মুসলিম সমাজে নীতিকে বাস্তবতা থেকে সরিয়ে নিয়ে কিতাবগত করে রাখার ফলে জীবনের সঙ্গে ইসলামের সংযোগ সাধিত হচ্ছে না।

ইসলামের পথে, অর্থাৎ ইজতিহাদ ও নীতির মিলন পথেই রয়েছে তাই প্রকৃত প্রগতি। নীতির স্রষ্টা আল্লাহ্; কাজ করবার ভার মানুষের কাছে। তার কাজের ব্যারোমিটার হচ্ছে এই নীতি। ইসলাম এই নীতিবোধকে শক্তিশালী করেছে দায়িত্ববোধের ভেতর দিয়ে। ইসলামের এই ইজতিহাদ, নীতিবাদ ও দায়িত্ববোধ মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও সর্বকালীন শান্তির জন্যেই গড়া হয়েছে—মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে নয়। কারণ যা ইচ্ছা তা করতে পারাটা স্বাধীনতার অপনাম—উচ্ছৃঙ্খলতা।

ইসলামী নীতির মৌলিক ভাবের কথা চিন্তা করলেই এর শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যাবে। এক একটা 'ইজম' বা 'সিস্‌টেম' এক-এক যুগের জন্যে—খুব শীগগিরই এর ভুল ইতিহাসের চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু ইসলামের নীতি সব সময়ে, সব সমাজেই প্রযোজ্য হবে। এর মোটামুটি চারটি কারণ আছে—

১। ইসলাম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মানসিকতার পরিবর্তন করে,

২। অযথা নীতির পরিবর্তন করে ইসলাম প্রগতিশীলতার বাহবা নেয় না,

৩। পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করে ও এভাবে ইসলাম সুবিধাবাদ ও রক্ষণশীলতার মধ্যে একটা মধ্যমপন্থা বেছে নেয়, কিন্তু এর প্রয়োগে কোন শৈথিল্য থাকে না,

www.pathagar.com

৪। দুনিয়ার 'ইজম'গুলোর মত ইসলাম সাময়িক ব্যক্তিকেন্দ্রিক তো নয়ই, এমন কি জাতি ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিকও নয়। ফলে প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে এমন একটি সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদে স্বার্থের বিরুদ্ধে রায় দিতেও পিছ পা হয় না। কাজেই যে সব নৈতিক নৈরাষ্ট্রবাদীরা প্রগতির নামে ফ্যাসাদ করে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের হাত থেকে প্রত্যেক মুসলিম মুজাহিদকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

ইসলামের ইজতিহাদ, নীতিবাদ ও দায়িত্ববোধ মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা ও জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সমাধানের জন্যেই। বর্তমান ইউরোপের মত শুধুমাত্র ইজতিহাদে যেমন আসবে না এই সমস্যার সমাধান, তেমনি মীমাংসা আসবে না তথাকথিত অধিকাংশ উলামাদের নীতির পেছনে পেছনে চলে, নীতি ইজতিহাদকে অনুসরণ করে না।

ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত লোভনীয়, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ব্যক্তির জন্যেই সমাজ এ কথা যেমন সত্যি, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ভেতর দিয়েই ব্যক্তির কল্যাণ— এ কথাও তেমনি সত্যি। ইসলামের আদর্শাশ্রয় ইজতিহাদ, নীতিবাদ ও দায়িত্ববোধ জাগাবার জন্যেই। সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে বিশ্বশান্তির ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রশস্ত পথ। তাই ইসলামের সুষ্ঠুতা ও কার্যকারিতা সংস্কারমুক্ত চিত্তে ও নির্ভীকভাবে যুক্তির সাহায্যে সমাজের সামনে তুলে ধরাই হচ্ছে মানব-প্রগতিপন্থীদের কর্তব্য। সমাজেও এর বাস্তব রূপায়ণ চাই—সমস্যা সমাধানে এর কার্যকারিতার প্রমাণ চাই—এখানেই আসে ইসলামী সমাজ গঠনের প্রয়োজন। ইসলামের আবেদন শুধু হৃদয়ে হবে না, হবে বাস্তবেও; নীতিবাদ ও ইজতিহাদের মারফত হৃদয়ে বাস্তবে সম আবেদন জানিয়ে ইসলামের অগ্রগতি; কিন্ত দুটোকেই চলা চাই সমানভাবে—একটিকেও ছাড়লে চলবে না!

www.pathagar.com

৪.
অদৃষ্টবাদ ও ইসলাম

প্রগতির চলতি পথে 'ধর্মের' দিন ফুরিয়ে এসেছে এই মতবাদ আধুনিক সমাজ-চিন্তার একটা বড় কথা। ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হলে মানুষ বর্তমান অবস্থাকে আল্লাহ্‌র দান বলে গ্রহণ করে, উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে না; নিজের অদৃষ্টকে, ভাগ্যকে সে বিধিলিপি বলে অকাতরে গ্রহণ করে নেয়; হতাশা, অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদ তাকে জর্জরিত করে ফেলে। তথাকথিত ধর্মীয় মানুষের পক্ষে কর্মহীন জীবনযাপন করাই নাকি যুক্তিযুক্ত, কারণ নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা নাকি খোদার উপর খোদকারি করা!

এই সমাজ চিন্তা ইসলামের সমাজদর্শন সম্পর্কে এক মারাত্মক ভুল ধারণারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ধর্মীয় নীতির বাস্তব রূপায়ণের অভাব এবং অশিক্ষার ফলেই এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলাম মানুষের জীবন পথের বাস্তব দিশারী। এর মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধন ও সামাজিক উন্নয়ন পরিবর্তন। ইসলামী সমাজ যুগে যুগে সংগঠিত হয় ইসলামী সমাজনীতিকে অবস্থা ও প্রয়োজন-অনুগ রূপায়ণের মাধ্যমেই। ইসলামী আইন বিজ্ঞানে একেই বলা হয় ইজতিহাদ। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, তমদ্দুন শিক্ষা—সব বিষয়েই যুগ যুগ ধরে রয়েছে এর ব্যাপক, সর্বাঙ্গীন ও চিরসুন্দর ভূমিকা। স্বৈরতন্ত্রের স্থানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে সার্বজনীন খিলাফত, অসাম্যের মাঝে সাম্য, মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার, তওহীদভিত্তিক এক মানবিক সংস্কৃতি বা তমদ্দুন, অশিক্ষার স্থানে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

ব্যক্তিসত্তা সমাজকল্যাণ উভয়েই ইসলামে পেয়েছে তার নিজ নিজ স্থান। মানুষকে ধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করাবার ব্যাপারে ইসলাম যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে. গ্রহণ করার সময় যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে বলেছে। কারণ সে বুদ্ধিজীবী। রসূল বলেছেন : ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর না—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন কর। আবার সমাজের কাছে

www.pathagar.com

তাঁর নির্দেশ—শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই তার মজুরি পরিশোধ কর। সুষ্ঠু সমাজ গঠন তাই হয়ে উঠেছে সব সময়েই ইসলামের বিশেষ লক্ষ্য।

সাধনার পথে এগিয়ে যাবার জন্যে কুরআন ঘোষণা করল : মানুষ ধাপে ধাপে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের উন্নত করে। মানুষ প্রত্যেকেই নিজ কর্মের জন্যে নিজেই দায়ী থাকবে। শেষ নবী বললেন : মেষ পালকের মত প্রতিটি মানুষকে তার মেষের অর্থাৎ কাজের হিসেব দিতে হবে।

জিহাদ বা সত্যের জন্যে সংগ্রাম ইসলামের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক। প্রবৃত্তি দমনের পর সবচাইতে বড় জিহাদ হল সমাজকল্যাণের জিহাদ। কুরআন বলেছে : মানবসমাজ হীন ও মৃত হয়ে পড়ার ফলেই পরিপূর্ণ ইসলামের আলেখ্য নিয়ে কুরআনের আগমন হয়েছিল। মানবসমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্যেই ছিল রসূলুল্লাহ্‌র দৃঢ় পদক্ষেপ। সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন এমন কি নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। হযরত বলেছেন : জালিম শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই সবচাইতে বড় জিহাদ। জীবনভর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কর্মশীলতা যে ইসলামের মূল কথা, তার মধ্যে অদৃষ্টবাদের স্থান যে কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। তাই ইসলাম কত্‌দীর অর্থে কি বুঝাতে চায় তাও জেনে রাখা দরকার।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত। তিনি মানুষের অদৃষ্টের খোঁজ রাখেন। প্রতিটি মানুষের আদি, অন্ত ও পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। মানুষের অদৃষ্টবাদ তাই আল্লাহর দিক থেকে সত্য। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে যা সত্য তাঁর সৃষ্ট, ক্ষুদ্র ও তাঁর সঙ্গে তুলনায় তুচ্ছ মানুষের পক্ষে তা তো সত্য হতে পারে না। আল্লাহ্ মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ করবার ক্ষমতা দিয়েছেন; কাজেই এগুলোর প্রয়োগ না করা তাঁর সৃষ্টিকে অবহেলা করা আর তাঁর বিশ্ববিধানকে অবমাননা করার শামিল।

মধ্যযুগে মুসলিম চিন্তাধারায় সুফিবাদের অসংগতিপূর্ণ প্রভাবের ফলে অদৃষ্টবাদ তথাকথিত ধর্মীয় পোশাক পরে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ইসলাম সব সময়ই এক সাধনা-সাপেক্ষ ও প্রচেষ্টাভিত্তিক জীবনপথের সন্ধান দেয়। ইসলাম বলে : লায়সা লিল্ ইনসানা ইল্লা মা সা'আ—যে যতটুকু শ্রম সাধনা করে সে ততটুকুরই ফল পাবে (কুরআন)। তাই ক্লীবতা, জড়তা ও অদৃষ্টবাদের কোনও স্থান ইসলামে নেই।

www.pathagar.com

৫.
আগামী দিনে ধর্মের ভূমিকা

আগামী দুনিয়ায় ধর্মের ভূমিকা কিরূপ পরিগ্রহ করবে—এ এক বিরাট প্রশ্ন। এখানে স্বল্পপরিসরে ধর্মীয় বিবর্তনের সাধারণ গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

পুরোহিততন্ত্রের অবিসংবাদিত প্রভাব ও প্রগতিশীল ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মকে নিতান্ত ব্যক্তিগত নেতিবাচক ও সংকীর্ণ পন্থারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। প্রাচ্যের চাইতে প্রতীচ্যের ব্যাপারেই এ কথা বেশি সত্য। যেভাবে ইউরোপীয় চার্চ ও রোমের পোপ মানুষের বিবেক ক্রয় করে নিয়েছিলেন, তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। ফলে ধর্ম সম্পর্কেও অনেক ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল।

ধর্মের নাম করে চার্চীর ধর্মের প্রবল প্রতিপত্তির ফলে ইউরোপে ধর্ম সম্বন্ধে বিরাট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ কথা মনে রেখেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা চার্চ ও রাষ্ট্রের অর্থাৎ তাঁদের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের দাবী তোলেন। এর ফলে একদিকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, স্বাধিকার ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে নতুন পথ উন্মোচিত হয়। আবার অন্যদিকে চার্চ ও ধর্মকে একই জিনিস বলে মনে করার ফলে ধর্মীয় আদর্শ, মানবতা ও সার্বজনীনতা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে বিলুপ্ত হয়। সেস্থানে রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ ও বাস্তববাদের নামে অরাজকতা বেড়ে চলতে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ও 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুসৃত হতে থাকে।

অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও জীবনমানের দিক থেকে উন্নত দেশগুলোতেই এ বিবর্তন অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ বহুবিধ। শিল্পোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ধর্মবিরোধী বা ধর্ম উদাসীন হবার ফলে জীবনমানের উন্নতির সাথে সাথে ধর্মের প্রভাব স্বল্পায়িত হয়ে আসে। কাজেই শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থার অনগ্রসরতাই ধর্মীয় প্রভাবের প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

অর্থাৎ যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ার দরুনই ধর্মের প্রভাব এখনও টিকে আছে। এ রকম ধারণা সাধারণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। ধর্মের প্রভাব

www.pathagar.com

বলে নিছক পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব মনে করলে এ কথাই সত্য। কিন্তু সার্বজনীন ধর্মীয় নীতির আবেদন ও নিয়ন্ত্রণের কথা বিচার করে দেখলে আমরা একেবারে ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। কারণ ধর্মীয় প্রভাব নিছক নেতিবাচক অনুন্নত অবস্থার ওপর নির্ভর করে না। সত্যিকার ধর্মীয় মূল্যবোধের ভূমিকা গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার জীবনভিত্তিক সর্বাঙ্গীন রূপায়ণের উপর নির্ভর করে। এ ঐতিহ্য যেখানে প্রবল ও সৃষ্টিময় সেখানে মানববাদী ধর্মীয় সমাজ সংগঠিত হয়। নতুন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এ ঐতিহ্য যেখানে দুর্বল, সেখানে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে জীবনকে খণ্ডিত করে ভিন্ন ভিন্ন সংকীর্ণ পথে পরিচালনা করা হয়। নতুবা ধর্মের নাম করে পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় অবস্থাই ধর্মীয় বিকৃতির প্রতিফলন মাত্র—মূল প্রকৃতি বা আসল পরিচয় নয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলেই জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে—জ্ঞানের ক্ষেত্রেও মানুষের দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি যন্ত্র বা প্রক্রিয়া মাত্র যার মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করে মানুষের কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনে বিশিষ্ট রূপ থাকবেই, এ কথা বলা চলে না।

এজন্যেই মানুষকে দর্শনের শরণাপন্ন হতে হয়। দর্শন মানুষের চিন্তাধারাকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করে পরিচ্ছন্নতা দান করে। কিন্তু দর্শনের ভূমিকা নিছক চিন্তার পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। দর্শন মানুষকে সুষ্ঠু জীবনদর্শন দান করতে পারে না। চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু দর্শন নৈতিক মূল্যমানের কোনও সুষ্ঠু মাপকাঠি দিতে পারে না। আর মানুষের সমগ্র সত্তা আন্দোলিত করতেও দর্শন ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে তাই মানুষকে ধর্মের কাছেই আসতে হয়। মানব প্রকৃতি এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, ভালমন্দের ধারণা ও জীবনসত্তা সম্পর্কে বোধশক্তি মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। এটা তার প্রকৃতিগত। কাজেই যেখানে মানুষ আছে সেখানে তার ধর্ম আছে—যা তার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবিত করে, এবং নিয়ন্ত্রিত করে জীবনকে রূপান্তরিত করে। এমন কি যার ধর্ম বলে কিছু নেই, যার ধর্মে কোন ঈমান নেই, তার পক্ষে তো এ-কথা কমবেশি সত্য।

তাই মানবসমাজের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব থাকবেই। আর এশিয়া মহাদেশে তো বটেই। তার কারণ এশিয়ার গোটা সংস্কৃতি ধর্মীয় ঐতিহ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। মানব-সভ্যতা ও মানবকল্যাণের আলোকে সত্যিকার সামাজিক বিপ্লব সাধনের জন্যে সর্বপ্রথম মানুষের জীবনবোধ পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠুরূপে সংগঠিত করতে

www.pathagar.com

হবে। কারণ যুক্তির সময় কেউ হয়ত ঐ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ জীবনক্ষেত্রে তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতেই হবে।

অতঃপর এই জীবনবোধের রূপায়ণের জন্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও পরিবেশ সুসংগঠিত করে আনতে হবে। প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে রাখলে জীবনসত্তার প্রশ্ন একেবারে বাদ পড়ে যাবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নে হাত না দিলে জীবনদর্শনের রূপায়ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এশিয়ায় ধর্মের প্রভাব নানাকারণে কিছুটা কমে গেলেও প্রভাব বিনষ্ট হয় না। সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যদি সত্যিকার ধর্মীয় আদর্শ প্রচার ও প্রতিপালিত হয়, তবে ধর্মীয় জীবন-ব্যবস্থা রূপায়ণের কোন কথা থাকবে না। এজন্যে এশিয়ার দেশগুলোকে দুনিয়ার সব দেশ থেকে মাল মসলা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু স্বাতন্ত্র বর্জন করলে চলবে না। মধ্য প্রাচ্য-সহ মুসলিম বিশ্বে ইসলাম, ভারতে হিন্দুধর্ম ও দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ায় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। শিল্পায়নের সাথে সাথে বাংলাদেশে ধর্মের প্রভাব বেড়েছে, সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনায় এ কথা ধরা পড়ে।

কেবল মাত্র দুঃখ-দুর্দশার জন্যেই ধর্মের প্রয়োজন, এ কথা ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মহীন নৈতিকতা শেষটায় নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। যদি আল্লাহ্ না থাকেন, তবে শালীনতা আর শালীন থাকবে না; জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশ্বাস না থাকলে যেমন মানুষের শক্তির অপচয় ঘটে, তেমনি সার্বজনীন ধর্মে ঈমান না রাখলে আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয়। বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, যিনি 'আমার কোন ধর্মীয় অনুভূতি নেই'—এ কথা প্রচার করেছিলেন তিনিও পরিশেষে প্রেম ও ভালবাসার ওপর জোর দিয়েছেন আর বলেছেন—মানুষের মধ্যে যা সত্যিকার মহান, তাকে জাগ্রত করতে হবে। মূল্যবোধের এ মৌলবস্তুর অনেকখানি সার্বজনীন ধর্মীয় আদর্শের মধ্যেই সম্পৃক্ত।

তাই ধর্ম থেকে জীবন ধর্ম থেকে সমাজ যাতে করে পৃথক না হয়ে পড়ে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সত্যিকার সংস্কৃতি জোরদার করে তুলতে হবে, পুরোহিততন্ত্রের ধর্মবিরোধী প্রভাব দূর করতে হবে। এবং সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় শিক্ষা দান করতে হবে—যাতে করে শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। ধর্মভিত্তিক ঔদার্যের আবহাওয়া আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। অপরের আদর্শ ভাল না লাগলেও তাকে পীড়া না দিয়ে নিজের আদর্শকে জীবনের পরতে পরতে রূপায়িত করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন মানুষের জীবনের কোন আদর্শের জন্ম হতে পারে না, এ আদর্শের সামগ্রিক রূপায়ণ নৈতিক দায়িত্ববোধ ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

৬.

ইসলামের জীবনদর্শন

জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনবোধ মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা। এর ওপর ভিত্তি করেই মানুষের ধর্ম বা জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। একটা জীবনদর্শনের সাধারণতঃ দুটো দিক থাকে, একদিক হলো বাস্তব ও ব্যবহারিক। আবার অন্য দিকটা হলো চিন্তানুগ ও দার্শনিক। যে জীবনদর্শনের মধ্যে বাস্তব ও দার্শনিকের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটে ও এ দুটো দিক যত বেশি একেবারে পিঠ-পিঠ ও লাগো-লাগো দাঁড়াতে পারে, সে দার্শনিককেই ততখানি জীবন্ত ও সার্থক বলা যেতে পারে। কারণ তার মধ্যেই জীবনের বিচিত্র গতি ও অনুভূতি ষোলকলায় পূর্ণ হবার ভরসা রাখে। দার্শনিক দিকটা যখন বেশি প্রভাব বিস্তার করে, তখন জীবনদর্শন তার সুষম আবহ হারিয়ে ফেলে। শুষ্ক মরমীবাদে পর্যবসিত হয়। দর্শনের নীরব নির্ভত কোঠায় চলে তার আনাগোনা। কিন্তু সংগ্রামী ও প্রতিশ্রুতিশীল মানুষের জীবনে তা আর কোন প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যবাদের দশা শেষটায় এ পর্যায়ে এসেই পৌঁছেছে। আবার ব্যবহারিক দিকটা যখন নিয়মকানুন ও অনুষ্ঠানের অহেতুক চাপে জর্জরিত হয়, তখন তা কুসংস্কার ও প্রাণহীন আচার-ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। খোলসটুকুই তার শুধু অবশিষ্ট থাকে। ইহুদি ও খ্রীস্টান ধর্মের যা অবস্থা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, সব ধর্মের মধ্যে ইসলামই সবচাইতে জীবন্ত বলে দাবী করতে পারে। বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়ে জীবনের অনুপম দীপ্তি ইসলামে প্রতিভাত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদের (সা.) জীবনে চোখে পড়ে এ জীবনবোধেরই এক পরিপূর্ণ আলেখ্য। ড. পারসিভ্যাল স্পিয়ার তাঁর 'ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এ্যান্ড দি ওয়েস্ট' শীর্ষক বইতে ইসলামকে তাই সবচাইতে বাস্তব জীবনদর্শন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম এমন একটি জীবনদর্শন যাতে উদারতার স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোন বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় নেই। রসূলে আকরাম (সা.) তাঁর শেষ হজ্ব বাণীতে বলে গেছেন : ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা বাড়াবাড়ি

www.pathagar.com

করো না। অতীতে ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। পূর্বে পশ্চিমে মুখ ফেরালেই পুণ্য অর্জন করা যায় না। আসল জিনিসটা ধরতে পারা চাই।

হযরতের জীবনের যে জিনিসটি সব সময়ই দেখতে পাই, তা হল তাঁর জীবনের সামঞ্জস্য ও সর্বাঙ্গীণ ঐক্য। রাখাল ও এতিম হিসেবে, সওদাগর হিসেবে, হিরা পর্বতে সাধক হিসেবে, সংস্কারক হিসেবে, মদীনার মুহাজির হিসেবে, সব কিছুর মধ্যেই যেন এক ঐক্যবন্ধনীর পরিচয়। ইসলামী রাষ্ট্রের শক্তিমান নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হয়েও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনই পরিবর্তন আসে নি, জীবনের সারবস্তুটুকু উন্নত শীর্ষ পর্বতের মত অটল ও অটুট রয়ে গেছে। খাওয়া পরা, চালচলন, নম্রতা-শালীনতায় কোন পরিবর্তন নেই। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন : দুনিয়ায় ভাল-মন্দ বলে আলাদা কিছু নেই। সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ই জমিনে আসমানে সব কিছু পরিচালনা করেন—ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য এরই মাঝে আবর্তিত হচ্ছে। তওহীদের মাধ্যমেই রসূলের (সা.) জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম, ইহুদী-ধর্ম কনফ্যুসীয়বাদ—এ সব জীবনদর্শনে দুটো দিকই আছে। কিন্তু রসূলে আকরামের মত নিজের জীবনের রূপায়িত করে তাকে সুষম সামঞ্জস্যে পরিণত করতে আর কেউ পারেনি। নিজের জাতির মধ্যেই তিনি আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন : অজানিতের সব জ্ঞান আমার নেই। তা যদি জানতাম, তবে দুঃখ আমাকে স্পর্শ করতেই পারত না। আমি তোমাদের মতই মানুষ। তোমাদের সাবধান করে দেয়া ও বিশ্বাসীদের সুখবর দেয়াই আমরা কাজ।

ইসলামী জীবনদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এর ঐতিহাসিকতা হযরতের (সা.) জীবনের ছোট বড় সব ঘটনার পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। আল্লাহ্র অধিকার বা হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল-ইবাদ বা মানুষের অধিকার এ দুটো জিনিস আমরা তাঁর জীবনী ও বাণীতে দেখতে পাই। মানুষের অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ্র অধিকারের ওপরে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। নামাযে যেমন ব্যক্তিগত দিক আছে, তেমনি জামাতের নামাযে মানবিক ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সংহতির কি সুন্দর ছবি! নামাযে অসুস্থ লোক ও কাজের লোক থাকে। তাই নামায ঝটপট পড়ে নাও। রোযার মধ্যে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়ের সংযম, অন্যদিকে অসহায় গরীব লোকদের জীবনের বেদনা সম্পর্কে এক বাস্তব আস্বাদন। হজ্জে একদিকে যেমন আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া, তেমনি দুনিয়ার

www.pathagar.com

কালো সাদা, হলদে-তামাটে মানুষের মিলনে বিশ্বঐক্য সাধনের বাস্তব পরিকল্পনা। যাকাতে যেমন অন্য মানুষের প্রতি ভালবাসায় আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধ, তেমনি ইসলামী সমাজের প্রতিটি নাগরিকের জন্যে অবশ্য পালনীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে কাজ করে যাওয়া। নিজের মনে শান্তি পাওয়া, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামই তো 'সালামা' আত্মসমর্পণ শান্তি : ইসলাম।

মানুষের ও মানব সমাজের বিবর্তন তো শেষ হয়ে যায় নি। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, শেষ পয়গম্বর বলে কিছু নেই। বিষয়টা একটু গভীর দৃষ্টিতে দেখা যাক। হযরতকে শেষ নবী বলা হয়। তাঁর পরে সংস্কারক মুজাদ্দিদ আসবেন। কিন্তু নবী আর কেউ আসবেন না। কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুক্তি, বিজ্ঞান, রিসালাত ও জিহাদের নীতির স্বীকৃতির মাধ্যমে সেই শেষ নবুয়তের সত্যটি রূপায়িত হয়েছে। যুক্তিকে বলা হয়েছে বিশ্বাসের মূল—যুক্তির সাহায্যেই জীবনদর্শন বুঝে নিতে হবে। যে নিজেকে জানে, আল্লাহ্‌কেও চেনে। সাধারণ বুদ্ধিমত্তাকে তাই খুব উঁচু স্থান দেয়া হয়েছে। আইনে যখন কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাওয়া যায় না, তখন নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে আইনের মূল নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়। এরই নাম 'ইজতিহাদ'। বিজ্ঞানকে. হযরত (সা.) বলতেন, তাঁর অস্ত্র। আল্ কুরআন ও হাদীস বার বার মানুষকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়েছেন। পৃথিবী ও আকাশ, মন, প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে বারে বারে। বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়েও হযরত (সা.) মুজেযা বা অলৌকিকতার প্রশ্রয় দিয়ে অহেতুক সুযোগ সন্ধান করেন নি। সূর্যগ্রহণকে তাঁর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যুর ফল বলে জাহির করার সুযোগ পেয়েও তিনি তা করেন নি। সাফল্য ও প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে তিনি সব কিছুকেই জয় করে নিতেন। রিসালাতের মাধ্যমে সব নবীকেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। কেউ যদি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে চায়, তবে সব নবীর ওপর ঈমান না আনলে চলবে না। এ বিশ্বাস মুসলমানের ঈমানেরই অঙ্গ। অন্য কোন নবী দুনিয়ার সব নবীতে বিশ্বাসের নীতি ঘোষণা করেন নি। কিন্তু রসূলে আকরাম তা সমস্বরে ঘোষণা করেছেন। এভাবেই তিনি শেষ নবুয়তের দাবী করতে পেরেছেন—কারণ তিনি পরিশেষে সব নবীদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনীর প্রতিষ্ঠা করেছেন : সব নবুয়তের মিলনের মাধ্যমে তাঁর নবুয়তের মধ্যে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। মানুষ এতদিন শুধু অনুসরণ করে এসেছে নবীদের—এখন তারা যুক্তি দিয়ে সব কিছু বুঝে নেবে। অবশ্য ধর্মের মূলনীতিকে অস্বীকার করে নয়। তাই ই. ভি, আরনল্ড

www.pathagar.com

বলেছেন : হযরত (সা.) একটা নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেন—কিন্তু জীবনদর্শন হিসেবে এর মধ্যে নতুন কিছুই ছিল না। মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ভেতর-বাহির সবই আল্লাহতায়ালা জানেন। মানুষের সামনে রয়েছে বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা। সাধনার ভেতর দিয়েই এ সম্ভাবনার বিচিত্র রূপায়ণ সম্ভব। নিজের বৃত্তিগুলোকে সুপথে চালিত করবার মধ্য দিয়েই এ সম্ভাবনা গতিপথ খুঁজে পায়। আল্লাহ্‌র রহমত এ সব মানুষের উপর সমানভাবেই রয়েছে, কিন্তু সাধনার মধ্য দিয়েই রহমতের দরজা খুলে যায়। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, কিন্তু উটটা বেঁধে রাখ। জিহাদ এ সাধনারই একদিক। সত্যের জন্যে জিহাদ, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ, সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ, ধর্ম প্রচারের জন্যে জিহাদ আর দেশ রক্ষার জন্যে জিহাদ। রসূল (সা.) বলেছেন— উৎসাহ আমার ঘোড়া আর সংগ্রাম আমার স্বভাব। আল্লাহ্ আমাকে আলস্য ও অক্ষমতা থেকে রক্ষা কর। তিনি তাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বসে থাকেন নি। কুরআনের সেই বাণী 'সাধনা ছাড়া জাতির উন্নতি হয় না, হযরত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। যারা চিন্তা করে কেবল তাঁদের জন্যে তো আল্লাহ্‌র চিহ্নগুলো সুপরিস্ফুট। ইসলামে তাই কাজ করবার পর আসে আত্মার্পণ, সাধনা করবার পর আত্মসমর্পণ। বার্ট্রান্ড রাসেলের কন কোয়েস্ট অব হ্যাপিনেসে' এই একই কথা। আল্লাহ্‌র ওপর আত্মসমর্পণ করেও যে সংগ্রামী জীবনে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়, হযরতের (সা.) জীবনই তার জ্বলন্ত সাক্ষর। ফকির সেজে বনে যাওয়া যেমন তাঁর শিক্ষার বাইরে, আবার একেবারে দুনিয়াকে তিনি সবার ওপরেও স্থান দেন নি। দুনিয়া খেলার মাঠের মত। আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ ও ভাল কাজ সবচাইতে বড় জিনিস। ফকিরের দিল নিয়ে কাজে লেগে যাও। দুনিয়াতে তোমার যে কাজ আছে তাকে অবহেলা করো না। আল্লাহ্‌র স্মরণ ছিল রসূলের বন্ধুর শামিল আর ইবাদাত বন্দেগী ছিল তাঁর আনন্দ। দুষ্টকে তিনি যেমন ঘৃণা করতেন না, তেমনি আবার বাদশার মত কাউকে বেশি সম্মানও করতেন না। কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য তাঁর কাছে কদাচারী রাজপুত্রের চাইতেও বেশি সম্মানিত ছিল। রসূলের আদর্শের শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ নিছক সুবিধাবাদ ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের বিরুদ্ধে এক সুনির্দিষ্ট হাতিয়ার।

মাতাপিতাকে ভক্তি করা, তাঁদের কাজে সাহায্য করা, তাঁদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা ইসলামের নীতি। ছেলেবেলায় তাঁরাই তো আমাদের লালন-পালন করেছেন। তাই আব্বার আনন্দে আল্লাহ্‌র আনন্দ আর আব্বার অসন্তোষে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ। আবার শিশুদের প্রতি বিশেষ করে এতিমদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিবাহ যেমন ফরজ, তেমনি পুত্রকন্যার

www.pathagar.com

লালন পালনও কর্তব্য। বিশেষ কারণ থাকলে, বহু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত। কিন্তু ভাল ব্যবহারের দিকে ও অধিক বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ না করার দিকে অধিক দৃষ্টি থাকতে হবে। অন্যায়ের জন্যে ঠিক অন্যায়ের অনুরূপ শাস্তি বিধান করতে হবে; যদিও ক্ষমা করে দেয়া ভাল। ইসলামে আছে দাসপ্রথা তুলে দেবার জন্যে উদাত্ত আহ্বান বা যাকাতের টাকা অংশতঃ দাসমুক্তিতে খরচ করার বিধান। নির্দেশ আছে দাসের চরিত্রে শালীনতাবোধ অক্ষুণ্ন রক্ষার সাধনার। রোযা রাখ; কিন্তু বছরের প্রতিটি দিন নয়। না খেয়ে শুকিয়ে মরো না। দুঃখ পেলে চোখে পানি আসুক। কারণ তুমি তো আর পাথর নও; কিন্তু চুল ছেড়া বা বুক চাপড়ানো ঠিক নয়। সব জাতিকে স্বীকার করে নাও; কিন্তু তওহীদ ও সার্বজনীন মানবতা যে সংকীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে তা যেন মনে থাকে। শিক্ষা নারী ও পুরুষের জন্যে ফরয। কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছাড়া বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা রূপায়িত করাও মুশকিল। নৈতিক দিকে রক্তের সম্পর্ক মানবতার চাইতে নিকৃষ্টতর জিনিস। তবু আত্মীয়-স্বজনের সাধারণ দাবী দাওয়া অবহেলা করলে চলবে না। তোমাকে আক্রমণ করলে তুমিও আক্রমণ কর; কিন্তু যারা তোমাকে আক্রমণ করে নি, তাদের কষ্ট দিও না। যুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও ফসলের ক্ষতি কর না। বিজয়ের দিনে তোমার দুশমনকে ক্ষমা কর। রসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের পর যেভাবে তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করলেন, এমনটি দুনিয়ার ইতিহাসে আর মিলবে না। মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুকালে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে তার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন। তায়েফে লোকদের পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও তিনি তাদের অভিশাপ দেন নি। ইসলামের সার্বজনীন মূলনীতি ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি; কিন্তু অমুসলিমদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তিনি হাত দেন নি। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের দেয়া সনদে তিনি এ কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। নারীর নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন—নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার তেমনি পুরুষের ওপরও নারীর অধিকার। আত্মার উন্নতির জন্যে দান কর। যার মন বড় সেই প্রকৃত ধনী। টাকা-পয়সা বেশি মজুদ করে রেখ না। আবার কৃপণের মত হাত গুটিয়ে বসে থেক না। যে লোক বেশি বাজে খরচ করে সে শয়তানের ভাই।

আমার প্রার্থনা, আত্মোৎসর্গ, জীবন ও মরণ আল্লাহ্‌র সন্তোষের জন্যেই নিয়োজিত। যা সত্য তার জন্যে আত্মবিসর্জন, বিবেকের শান্তির জন্যে সাধনা ইসলামের লক্ষ্য; দুনিয়াটা পথের পাশের গাছতলার মত। খুশবু জিনিস ও নারী রসূলের (সা.) কম প্রিয় ছিল না, কিন্তু তার চাইতে প্রিয়া ছিল নামায।

www.pathagar.com

নৈতিক আবেদন ইসলামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কিন্তু নীতিবোধ কার্যকরী না হলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। নামাযের সঙ্গে সঙ্গে তাই যাকাত বা অবশ্য পালনীয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কীর্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্মানের খাতিরে আর ছেলেপিলের জন্যে মানুষ বেশি টাকা-পয়সা চায়। ইসলামী সমাজে সততা ও কার্যদক্ষতা যদি সম্মানের ভিত্তি করা যায় ও যাকাত নীতি কার্যকরী করা হয়, তবে অসদুপায়ে টাকা রোজগারের ইচ্ছা কমে আসতে বাধ্য হবে। রসূল (সা.) ছিলেন সুন্দর স্বভাবের প্রতীক; নৈতিকতার সুউচ্চ মার্গে (ইন্নাকা লা-আলা খুল্‌কিন্ 'আযীম)। লেনপুলের ভাষায়— 'নরম-কঠিন মিলে এমন এক স্বভাব যা সহজেই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে।' There is something so tender and womanly, and with also heroic about the man that one is in peril of finding the judgment unconsciously blinded by the feeling of reverence and well might love that such a nature inspires, তাইতো তিনি সব নবীদের চাইতে বেশি সফলকাম হয়েছিলেন। বস্তু ও আত্মার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দু'টি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।

যা আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি, তা ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে রূপায়িত করাই রসূলের আদর্শ। বিচিত্র পরিবেশে ও বিভিন্ন প্রয়োজনে এ আদর্শের নব নব রূপায়ণ হবে আমাদের জীবন-পথের দিশারী।

www.pathagar.com

৭.

বিশ্বদৃষ্টি : মার্কসবাদ ও ইসলাম

মূল্যবিচারের কথা বাদ দিলেও, কোন একটা দর্শন হেঁয়ালী না হয়ে যদি জীবনদর্শনের পর্যায়ে উঠতে চায়, তবে তার একটি নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তা শেষটার মূল্যবিচারের তাগিদেই। কতগুলো বিষয়ে আসমান জমিন ফারাক থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও মার্কসবাদ উভয়ই মানুষের জীবনদর্শন বলে দাবী করে। এই দুটি আদর্শের বিশ্বদৃষ্টির এবার খতেয়ান নেয়া যাক।

মার্কসবাদ দাবী করে যে, ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে মার্কসবাদ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করেছে। সেই জন্যে ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসবাদের নিজস্ব গতিবিজ্ঞান রয়েছে ও এই গতিবিজ্ঞানের ওপর ভর করে এই ইতিহাস দর্শন (Philosophy of history) গড়ে উঠেছে। আমাদের মতে ইতিহাস বলতে কেবল কোন জাতির নিছক ইতিহাস বোঝায় না। দেশটা কেবল একটা ছক মাত্র, সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, তমদ্দুন সবই এক সঙ্গে কাজ করে চলে। অন্য কথায়, মানুষের তামুদ্দুনিক বিকাশের ও বিবর্তনের বিষয় যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তারই নাম ইতিহাস বিজ্ঞান। কিভাবে বর্তমান সমাজের জন্ম হল তাই শুধু নয়, পুরোনো সমাজের সঙ্গে বর্তমান সমাজের তুলনামূলক আলোচানা করতেও সাহায্য করে এই ইতিহাস বিজ্ঞান।

জড়পদার্থের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করে মার্কস মানুষের সামাজিক ইতিহাসের হদিস নেবার চেষ্টা করলেন। এই বিশ্বদৃষ্টি গ্রীস দেশের ডিমোক্রিটাসের ও ভারতের চার্বাকের লেখাতেও পাওয়া যায়। সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন ইবনে খালদুন। পরবর্তী যুগে গিয়ামব্যাটিটা ডিক্কো ('Scienza Nuoya' 1752), মনতেস্ক্যু (L. Esprit des Leis), বাক্‌লে (History of Civilization in England) যথাক্রমে সামাজিক পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন ও জ্ঞানলাভের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসের

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তারপর ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা মার্কস পেশ করলেন তা মূলতঃ হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও হেগেলের ভাববাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার অনেক বিষয়েই কোন মিল নেই।

মার্কস তাঁর ইতিহাস বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান রচনা করার জন্যে বিভিন্ন দার্শনিকের কাছ থেকে এক একটা সূত্র গ্রহণ করলেন। সেন্ট সাইমনের কাছ থেকে বিবর্তন ও উৎপাদন শক্তির সামাজিক প্রভাব, আওয়েন (Owen)-এর কাছ থেকে শ্রমশক্তি (Labour power), শ্রম সময় (Labour time) ও বাবুফ (Distatorship of the proletariat) এই সব দার্শনিক সূত্র মার্কসবাদের গতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর ফরাসী দার্শনিক প্রুভধোর (Provdhor) নিহিলীয় বা নৈরাজ্যবাদী হাবভাবেও তাঁর দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনায় কম প্রভাব বিস্তার করে নি। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনে যে দুজন দার্শনিক সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন তাঁরা হচ্ছেন—হেগেল ও রিকার্ডো (Hegel and Ricardo)। এরা তদানীন্তন যুগের দর্শন ও অর্থনীতির শেষ কথাটুকু বলে দিয়েছিলেন। মার্কস হেগেল থেকে তাঁর দ্বন্দ্ববাদ ধার করে তাকে বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিক জড়বাদে রূপান্তরিত করলেন সেন্ট সাইমনের 'বিবর্তন' ও 'উৎপাদন শক্তির সামাজিক প্রচারের' মারফত। রিকার্ডোর 'Labour Theory of Value' তাঁকে প্রেরণা দিল। রিকার্ডোর সমালোচকদের লেখনীর ভেতর দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠল কিভাবে পুঁজিপতিরা মানুষের ওপর অর্থনৈতিক জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। তারপর ফয়ার বাকের (Fauer Back) চিন্তাধারা সম্বন্ধে মার্কস এঙ্গেলস সমালোচনা করলেও তাঁরা মূলত, ফয়ার বাকের বস্তুবাদী (Materialist) চিন্তাধারাই সম্প্রসারণ করলেন। কারণ ফয়ার বাক নিজেই হেগেলের ভাববাদের নির্মম সমালোচক ছিলেন।

হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ ও দ্বান্দ্বিক জড়বাদ

মার্কস হেগেলের কাছ থেকে দ্বন্দ্ববাদের সূত্রটা গ্রহণ করলেন; কারণ তাঁর পড়াশুনা এই হেগেলীয় মতবাদের ওপরই গড়ে উঠেছিল। মার্কস জার্মানীতে জন্মাবার ফলেই তাঁর ইতিহাস-বিজ্ঞানে এই দ্বন্দ্ববাদ স্থায়ী আসন পেয়েছে। এই দ্বন্দ্বপদ্ধতি (Dialectics) বলতে বুঝায় :

(ক) থিসিস (Thesis, action) অবস্থান বা ক্রিয়া (The law of change of quality into quantity and vice-versa)।

(খ) এ্যান্টিথিসিস (Antithesis, reaction)-বিপর্যয় বা প্রতিক্রিয়া (The law of negation of relation)।

www.pathagar.com

(গ) সিন্‌থিসিস্ (Synthesis, reconciliation or another position and action) [The law of interpentration or the unity of the opposites.]

হেগেল বলতেন—বিশ্বজনীন এক মহান প্রজ্ঞার (Universal Reason) বিকাশের ফলে বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মানবসমাজ গতিশীল হয় ও পরিণতি লাভ করে। অচৈতন্য আত্মা (Idea) সমাজের প্রগতির সাথে সাথে জাগ্রত হয় ও এক সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে আসে আর এক সমাজব্যবস্থা। নতুন সমাজব্যবস্থা আল্লাহ্‌র দান ও যুদ্ধ মানুষের চলার পথের চালক হিসেবে প্রগতির পথের দিশারী। বিভিন্ন আইডিয়া বা প্রত্যয়ের অবস্থান, বিপর্যয় ও সমন্বয়ে ইতিহাস এগিয়ে চলে।

মার্কস হেগেলীয় দর্শনে দেখলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের অভাব, প্রুশীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রই হেগেলের কাছে মানুষের সমাজ সত্তার চরমতম প্রকাশ। মার্কস হেগেল আল্লাহ্‌কে মানতেন না—তবু তিনি দ্বন্দ্বপদ্ধতি গ্রহণ করলেন আর বললেন যে, বিশ্ব প্রকৃতির সব প্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মারফত খতিয়ে দেখতে হবে। মানব সমাজে তিনি দেখলেন এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ উপ্ত থাকে। শ্রেণী-সংঘর্ষই এই ধ্বংসের কারণ। বৈপ্লবিক শ্রেণীর স্বার্থ শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীত। 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ফ্রান্সে বংশগত রাজতন্ত্র অভিজাত শ্রেণীর সাহায্যে রাজত্ব করছিল (অবস্থান)। আর সেই রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণী এক উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীকে দমন করে রেখেছিল (বিপর্যয়)। এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বে বিপ্লবের সৃষ্টি হল। ফলে সামন্ততন্ত্রের পর পাওয়া গেল বুর্জোয়াতন্ত্র (সমন্বয়)। তখন এই নয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই থিসিসে পরিণত হল আর এ্যান্টিথিসিস হল শ্রমিক শ্রেণী। মার্কস বললেন : এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্বপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মফিস্টগণও এই চিন্তাপদ্ধতি ব্যবহার করত। তারপর প্লেটো ও এ্যারিস্টটল এই পদ্ধতিকে পরিপূর্ণ রূপ দান করেন। দ্বন্দ্বপদ্ধতিতে দুই রকমের গঠনশীল ও ধ্বংসাত্মক শ্রেণীশূন্য সমাজ কায়েম হবে।'

কাজেই মার্কস হেগেলের আইডিয়ার দ্বন্দ্বের জায়গায় মানুষে মানুষে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, মার্কস বলেন নি যে শ্রমিকের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কি রূপ হবে। তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজের পর কি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি লোপ পাবে? সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধে আবার কোন শ্রেণী দাঁড়াবে না? মানব-সভ্যতার বিবর্তনের কি ইতি হবে? এ-কথা কিন্তু কল্পনা করা যায় না। মানুষের হলে সেটা বিবর্তনশীল সমাজ হতে বাধ্য ; তা সে বিবর্তন দ্বান্দ্বিক হোক আর না হোক।

www.pathagar.com

মার্কসবাদের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা :

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের ইতিহাস-বিজ্ঞান রচনা করার সময়ে কতগুলো ধারণা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন :

১। বস্তুই সব জিনিসের আদি।

২। মানবসমাজে অর্থনৈতিক শক্তি সর্বকালে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৩। উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য। 'প্রগতি' তাই কেবলমাত্র উৎপাদন-শক্তি-বিকাশ নির্ভর। কিন্তু সব সময়েই কী তাই?

(ক) ধর্ম মানেই চার্চ, ধর্মের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আজন্ম বিরোধ। ধর্ম, সমাজ বা সমাজকল্যাণ নিরপেক্ষ।

(খ) ধর্ম মানেই ভাববাদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে কাজ করা কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব নয়। ধর্ম মানেই আফিম ও গাঁজাখুরী ব্যাপার।

(গ) সব ধর্ম, মানুষের সৃষ্টি।

চেতনা, পদার্থ নির্ভর না আইডিয়া নির্ভর

মার্কসবাদের মতে জীবনের বিকাশের মধ্য দিয়ে চিন্তা সচেতনভাবে কাজের ক্ষমতার উদ্ভব ঘটিয়েছে। অর্থাৎ মন বা বাস্তব সত্তার সচেতন অংশের জন্ম হয়েছে পরে; বস্তু বা বাস্তব সত্তার অচেতন অংশই আদি। এই সূত্র অনুযায়ী বস্তুমন নিরপেক্ষ অর্থাৎ তার অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভর করে না—('মার্কসবাদ'—এমিল বার্নস, অনুবাদক সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি লিমিটেড, কলকাত।, নভেম্বর ১৯৪৫, ১০৭ পৃষ্ঠা)। 'নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে।' (মার্কস)

কার্যতঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন শক্তিই মানুষের চেতনা, শাসনতন্ত্র, তমদ্দুন ও চিন্তাধারা গঠন করে। 'উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলে পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি অতিক্রান্ত হয়ে যায়—তাদের মধ্যে যে বিরোধ, সমাজে বিভিন্ন বিরোধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; শ্রেণীস্বার্থ তীক্ষ্ণতরভাবে দেখা দেয়, বিভিন্ন শ্রেণীর চিন্তা ও বিশ্বদৃষ্টির পার্থক্যও প্রবলতর হয়। শ্রেণীসচেতন বিপ্লবী শ্রেণী গড়ে ওঠে এবং যে শ্রেণী পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতির সমর্থক বলে রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী তার সংগে নতুন সংগ্রামশীল ও শ্রেণী-বিপ্লবীদের সংঘর্ষে পুরোনো রাষ্ট্রতন্ত্র ধ্বংস হয়ে ক্ষমতা বিপ্লবী শ্রেণীর হাতে সচেতন আসে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন পদ্ধতির

www.pathagar.com

রূপান্তর ঘটে, সেই রূপান্তরের ভিত্তিতে নতুন ধরনের রাষ্ট্রতন্ত্র ও চিন্তাধারা গড়ে ওঠে—এক কথায় বিপ্লবের মধ্যে পুরোনো সমাজের পরিসমাপ্তি ও নতুন সমাজের আবির্ভাব ঘটে।'

'The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society... the real foundation on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definit forms of social consciousness... this consciousness must be explained rather from the contradictions of material life.—(Marx)

'The mode of production of material life determines the social, political and interllectual life at large..... with a change in the economic basis the whole immense superstructure turns round slowly or quickly'..... Marx : preface to 'Critique of political Economy'— (1859)

'It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.'

The materialist view of history is 'a way of to explain man's consciousness by his actual existence instead and his existence by his consciousness. (Engels.... Development of socialism from a Utopia to a science' 1882)

ডারউইন ও বিবর্তনবাদ

এই মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনের বিবর্তনবাদ এসে ইন্ধন জোগাল। বস্তু আদিতে অচেতন হলেও সমাজে সচেতনভাবে কাজ করে। মার্কসবাদের মতে এই সামাজিক বিবর্তনবাদের মাধ্যমে সমাজ এগিয়ে চলে, কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে বিবর্তন পরিণত হয় বিপ্লবে।

ডারউইন বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করেছেন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে। তিনি দেখিয়েছেন যে, জীব অবিরামভাবে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, ও জীবন সংগ্রামে (Struggle for existence) যারা বলবান তারাই বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে Survival of the fittest)। প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধেই এ-কথা খাটে বলে বলা হয়েছে (The Origin of Species)। এর ফলে কোন জীব ধ্বংসও হয়ে

www.pathagar.com

যায়। প্রকৃতি তার খেয়াল খুশীতে বেঁচে থাকার অধিকার দান করে (Natural selection)। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও প্রাণীটি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য অগ্রিম না হওয়ায় নতুন নতুন জৈবিক পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ও এর থেকে নতুন প্রাণীটির জন্মগ্রহণ করারও সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বিবর্তনবাদ নিয়ে লুক্রেশাস, বিউফন ও লামার্ক আলোচনা করেছিলেন ও Natural selection সম্বন্ধে ওয়ালেস (A. R. Wallace) কম চর্চা করেন নি। সাধারণ লোকে এই বিবর্তনবাদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। কিন্তু বিপ্লব ও ব্যক্তিবাদের অপপ্রয়োগের ফলে জীবন সংগ্রামের প্রশ্ন সাধারণ মানুষের পক্ষে নিদারুণ আকার ধারণ করে। এই সময়েই বিবর্তনবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির ছবি যেন তার জীববিদ্যার বিবর্তনবাদে দেখতে পায়। Survival of the fittest-এর মারফত ফ্যাক্টরী সভ্যতা সমর্থন করা হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, জৈবিক সংঘর্ষ ও মানুষের সংঘর্ষের বিস্তর পার্থক্য আছে। মানুষের চেতনা আছে, যা ঠিক সেই পরিমাণে নিম্নস্তরের প্রাণী উদ্ভিদের নেই। মানুষ শুধু বাঁচতেই চায় না, সে চায় ভালভাবেই বাঁচতে; আবার প্রাণী জগতের মানুষটা জীবন-সংগ্রামে অপারগ হলে তাকে শেষ করে দেয়া হয় না, তাকে ভাল করে দেয়া হয়, তাকে সাহায্য করা হয়। তারপর যে নৈতিক দিক থেকে বাঁচবার অধিকারী হল, সে নৈতিক দিক থেকে হয়ত মোটেই বাঁচবার অধিকারী নয়।

The morally worse men may only be the more fit to survive—স্বার্থনির্ভর বা জীবনশক্তিনির্ভর মূল্যবোধের উপর মানবিক নীতির হদিস পাওয়া যাবেই—এ রায় দেয়া কঠিন। মানবসমাজে মানুষের চেতনা ও তামুদ্দুনিক প্রত্যয় দ্বারা জৈবিক ও নৈসর্গিক অবস্থাকে যত বেশি প্রভাবান্বিত করা যায় ততই প্রগতির পথ কাছে এগিয়ে আসে। কাজেই বিবর্তনবাদকে মানবসমাজে সাধারণভাবে খাটাতে হবে। হার্বার্ট স্পেনসারই আদতে আধুনিক বিবর্তনবাদের জন্ম দেন ও তিনি বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করতেন নিতান্ত সাধারণভাবেই। The conception of evolution had to be stripped of its specific biological meaning and generalized by wider use. (The Marxist. October 1926—Idealism and Evolutionary Realism by R. F. A. Hoernle, P. 562)

www.pathagar.com

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, মানব চেতনা কর্তৃক জড়পদার্থের নিয়ন্ত্রণ ও বিবর্তনবাদ—এই ভাবধারার মিলন সাধন করেই মার্কসবাদের গতিবিজ্ঞানের (Social dynamic) জন্ম হয়েছে। উৎপাদন-পদ্ধতি ও একটি শ্রেণীর সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে একচ্ছত্র মালিকানা—এর থেকেই আসে শ্রেণী সংঘর্ষ ও সমাজ বিপ্লব। জড়পদার্থ শ্রেণীর উৎপাদন-পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিবর্তন লাভ করে এবং সমাজও এভাবে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন-পদ্ধতির বিবর্তন এবং শ্রেণী-সংগ্রামের মারফত মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। শ্রেণী-সংগ্রামের থিয়োরী মার্কস প্রথমে পেশ করেন তাঁর 'German Ideology'-তে (১৮৪৫)।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে বলা হয়, দুনিয়ার গোটা ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।' উৎপাদন-শক্তির বিবর্তনের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দেয়। উৎপাদন-শক্তি বলতে বুঝায় মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুযায়ী প্রকৃতির ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে—সেই শক্তির মাত্রা। মার্কসের মতে দুনিয়ায় যে সব ছোট বড় রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তা মূলতঃ মানুষের খাদ্য ও উৎপাদন-পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব সমাজের ওপর কম নয়। কিন্তু কেবল তার ওপরই অন্য সব চিন্তাধারা গড়ে ওঠে—এ কথা সত্যি নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, চিন্তাধারা ও তার রূপায়ণের সীমা নির্ধারণ করে মাত্র—সেগুলো সৃষ্টি করে বা সম্পূর্ণরূপে গঠিত করে—এ কথা বলা যায় না। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা ও তমদ্দুনের প্রভাব বেড়ে যেতে থাকে। নিউটন বা আইনস্টাইনের আবিষ্কারের প্রয়োগ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর নয়। সমাজ-বিবর্তনে চিন্তাধারার মূল্য এঙ্গেলস স্বীকার করেছেন।

সমাজে শুধু শ্রেণী-সংঘর্ষ দেখা দেয় না—মানুষে মানুষে সংঘবদ্ধতার ভাবও সমাজে দেখা দেয়। তা ছাড়া মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিকল্পভাবে একটা ছেড়ে আর-একটা বেছে নিয়ে নিজের প্রতিভা অনুযায়ী মানব সভ্যতায় তার অবদান রেখে যায়।

মার্কসবাদে সামগ্রিক সত্তার (Collective ego) বা শ্রেণীর ওপর বেশি জোর দেবার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও ব্যক্তিসত্তা লোপ পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রভাবের ফলেই এই অবস্থা এসে পড়ে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকতার' মারফত শ্রমিকের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মানব-স্বাধীনতার অনিবার্য রূপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ এই স্বৈরতন্ত্র 'উবে' যাবার কোন

www.pathagar.com

চিহ্নই দেখা যায় না—যদিও থিয়োরীতে সে কথা প্রচার করা হয়েছিল। ইতিহাস গঠনে মনের প্রভাব কম নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষের স্বকীয়তা স্বীকার না করায়, তথাকথিত শ্রেণী-শাসনের মারফত মার্কসবাদ স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার বিলোপ সাধন করে। (The God that failded koestler, Andregide and others।) সোভিয়েত রাশিয়ার জাঁদরেল অর্থনীতিবিদ ইউজিন ভার্গা দেখিয়েছেন যে, আমেরিকার শ্রেণী-সংগ্রাম মার্কসীয় পন্থা ধরে অগ্রসর হয় নি। চীনদেশে গুরুর প্রভাব ও কনফ্যুসীয়বাদের তামুদ্দুনিক প্রচারও অর্থনৈতিক দিকটার সাথে সাথে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। (M. N. Roy—Revolution and Counter Revolution in China।) তারপর শ্রেণীসংগ্রাম জোরদার হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা কি হয়েছে? মূলতঃ মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাবিদেরাই শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। মার্কসের মতে শিল্পায়িত জার্মানীতে বিপ্লব হবার কথা। কিন্তু বিপ্লব সাধিত হল অনুন্নত রাশিয়ায়। রাশিয়া ও স্পেন ছাড়া অন্য কোন দেশেই শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারছে না।

মানব-ইতিহাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এবার বিচার করা যাক।

ইসলাম ও ইতিহাস

ইতিহাস ও প্রকৃতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে ইসলাম বার বার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। 'তারা কি দুনিয়াতে সফর করে দেখে না যে, তাদের অতীতের জাতিগুলোর কি দশা হয়েছে।'— (কুরআন : মু'মিন - ৮৯ ঃ ৬ - ১৩।) কুরআন ইতিহাসের পদ্ধতি (Historical method) অবলম্বন করেছে।

কুরআনে যে সব কিসসা বা গল্পের অবতারণা করা হয়েছে, সেগুলো শুধু গল্পই নয়, মানব ইতিহাসের উত্থান-পতন বোঝাবার জন্যেই আদস, মামুদ, মুসা, ইউসুফ, ফিরআউন—এঁদের কিস্‌সা বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরআউন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিল, ইনসাফী আইন-কানুন লঙ্ঘন করেছিল (কুরআন- ২০ ঃ ৪৩) ও এভাবে সে হয়ে উঠেছিল ঘোর জালিম।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

শুধু বিজ্ঞান নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও জন্ম দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে বার বার মানুষকে প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে বলা হয়েছে। যুক্তির ওপরও ইসলামে খুব জোর দেয়া হয়েছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করা ইবাদতের কার্য, সত্তর বছরের উপাসনার চাইতে আল্লহ্‌র দেয়া প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করা বেশি মূল্যবান।— (হাদীস)

'নিশ্চয়ই আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে ও দিবারাত্রির পরিবর্তনের চিন্তাশীলদের

www.pathagar.com

জন্যে অনেক কিছুই চিন্তা করার রয়েছে।' — (কুরআন)।

বস্তু যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এ কথা ইসলামই সর্বপ্রথম প্রচার করেছে। কুরআন প্রত্যেক বস্তুকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে বলেছে। কিন্তু বস্তুকেই বা বস্তুনির্ভর নীতি বা স্বার্থবোধকেই ইসলাম মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলে স্বীকার করে না। তওহীদ থেকে পাওয়া সার্বজনীন মানবতাবাদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধ ইসলামী নীতিবোধের মূল। কিন্তু যেহেতু ইসলাম নিছক ব্যক্তিগত ধর্ম নয় বরং মানুষের জীবনদর্শন, সেই কারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে তওহীদবাদের বাস্তব ও প্রয়োজন নির্ভর রূপায়ণ অপরিহার্য। এইভাবেই প্রকৃত ইসলাম সক্রিয় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ দেশে দেশে ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন হয়!

মার্কসবাদ বলতে যদি কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বোঝায়, তবে এর সঙ্গে ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পার্থক্য নেই। ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তওহীদ থেকে আসার ফলে বিজ্ঞানের ফল কিভাবে সমাজে রূপায়িত হবে তাও ইসলাম নির্দেশ করে। ইসলাম দুনিয়া তৈরির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র শক্তিকে স্বীকার করে, কিন্তু এই সৃষ্ট বস্তু যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় ও নিছক রহস্যবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় না— কুরআন এ কথা খুব জোরের সঙ্গেই পেশ করেছেন।

মার্কসবাদের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। ইউরোপের জাগৃতি আন্দোলন থেকেই মার্কসবাদের সৃষ্টি। কুরআনে বলা হয়েছে যে, বস্তু নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় (৩ ঃ ৮) ও ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ইউরোপে যুক্তিবাদ ও রেনেসাঁর প্রবর্তন করে ইসলাম। দু' একজন মুসলিম নামধারী বৈজ্ঞানিক আদর্শের দিক থেকে মুসলিম না হলেও প্রায় সব মুসলিম বৈজ্ঞানিক ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন। কুরআনই মুসলিম মানসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জন্ম দিয়েছিল। ইসলামের কাছ থেকে পাওয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমাজে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন ইবনে খালদুন। তিনি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিমের জ্ঞান বিজ্ঞান ও কুরআন আরবি থেকে ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় ও ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম দেয়। রোজার বেকন হিশাম ও ফারাবীর কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখেন, মার্কসবাদ সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই প্রয়োগ করে।

ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখিরাত

দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ইসলামের বিশ্বদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে (কুরআন ৩১ ঃ ২০, ৭ ঃ ৯৬)। উভয়ই মানব-জীবনের অপরিহার্য অংশ। দুনিয়া ও তার বস্তু-সামগ্রী অবহেলার বস্তু নয়। বাস্তব জীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্র হিসেবে মনে করায় ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিতে বাস্তব ও আধ্যাত্মিকবাদের সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। যারা মু'মিন তাদের জন্যে বাস্তব জগতে ও তাদের হৃদয়ে অনেক চিন্তার খোরাক (আয়াত বা চিহ্ন) রয়েছে' (কুরআন)। 'পাথিব

www.pathagar.com

জীবনের তুলনায় পরকাল অনেক বড়, কেননা সে জীবন অনন্ত জীবন। কেবলমাত্র ভাল কাজই জীবিত থাকবে' (কুরআন, বনি ইসরাইল ঃ ৪৪)। 'দুনিয়াকে অবহেলা কর না' (২৮ ঃ ৭৭)। যারা ভাল কাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার ও আখিরাতের নিয়ামত দেন' (আল-ইমরান ঃ ৭৭)। দুনিয়াকে হাদীসে বলা হয়েছে 'পরকালের শস্যক্ষেত্র'। আমি বিশ্বদৃষ্টি : 'মার্কসবাদ ও ইসলাম দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যেই এসেছি। আমার উম্মতেরা দুনিয়ার কাজ করবে আবার সালাতও কায়েম করবে।'

জড়বাদী মূল্যবোধ ও ইসলাম

প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে গ্রহণ করে ইসলাম কতগুলো সাধারণ নিয়ম-স্থাপন করেছে। নীতির রূপায়ণ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন হয়। কুরআন বলেছেন : মানবিক নীতিবোধ আসে মানুষের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা থেকে। মানুষের নীতিকে মূলতঃ তাই ইসলাম জৈবিক পদার্থ বলে মনে করে না। কুরআন বলেছেন : আল্লাহ্র নিয়মে তোমরা কোন পরিবর্তন পাবে না (৩৩ ঃ ৬২)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নীতির আপেক্ষিক দিকও স্বীকার করা হয়েছে হাদীসে ও কুরআনে। উদ্দেশ্য থেকেই কাজের বিচার করতে হবে। 'প্রত্যেক শিশু প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের দিকে প্রবণতা নিয়ে জন্মায়, তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি বা খ্রীস্টান করে তোলে।' 'পূর্বে বা পশ্চিমে মুখ ফেরালেই সালাত হয় না' (২ ঃ ১৭৭)। কোন একটি বিষয় বৈজ্ঞানিক হলেই সেভাবে সব সময়ে কাজ করতে হবে এ কথাও ঠিক নয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ইসলাম তাই তওহীদসঙ্গত মানবিকতার মিলন সাধন করতে প্রয়াস পায়। কিন্তু বস্তু বা সমাজ নিয়ে গবেষণা করা বা সমাজের সংস্কার করা ইসলাম বাদ দেয় নি—খুব জোরের সঙ্গেই মানুষকে কুরআন (৩০ ঃ ৪১; ২৬ ঃ ১৫১) ও হাদীস এই কাজে আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থকেই নীতির একমাত্র পরিচালক বলেও ইসলাম মনে করে না। যেটা ঠিক বা বেঠিক সেটা সবার জন্যেই ঠিক বা বেঠিক—অবশ্য, উদ্দেশ্য ও পরিবেশ বুঝে এর বিভিন্ন প্রয়োগ হতে পারে। এই জন্যে ইসলাম সালাতের (মনটাকে ঠিক করা) সঙ্গে সঙ্গে যাকাত (মানবিকতা) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দিয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ নিছক ভাববাদ নয়। কারণ তা সমাজের ভাল-মন্দের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো।

মার্কসবাদের কথা—মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে প্রভাবিত করে—চেতনা সামাজিক অস্তিত্বকে নয়; সুষ্ঠু মানব-সমাজ গঠন করার পক্ষে এ আংশিক সত্যটি বোঝা খুবই দরকার। সামাজিক কার্যধারায় কোন বিষয় পুরোপুরি সত্য হলেই যে তার নেতৃত্বে কাজ করা যাবে এমন নয়। শাসক ও রক্ষণশীলদের

www.pathagar.com

সামাজিক অবহেলার পর এই আংশিক সত্যটি বৈপ্লবিক রূপ লাভ করেছে। কেবল আইডিয়ার ওপর জোর দেবার যুগে পরিবেশের দিকে বেশি নজর দিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছিল মার্কসবাদ। এই idealist দর্শনের প্রতিক্রিয়াতে জন্ম হবে মার্কসীয় নিয়ন্ত্রণবাদ। কেবলমাত্র সামাজিক অস্তিত্বই চেতনাকে প্রভাবিত করে—এ কথাটি একটি প্রাগম্যাটিক সত্য, পরিপূর্ণ সত্য নয়। আসল কথা হল, সামাজিক অস্তিত্ব চেতনার ওপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে মূল্যবোধের রূপায়ণের পরিসীমা নির্দেশ করে দেয়; কিন্তু কেবলমাত্র সামাজিক অস্তিত্বই চেতনাকে প্রভাবিত করে ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে—এ কথা সত্য নয়। একই পরিবেশে বাস করেও বিভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। বস্তুকে কাজে লাগাতে সচেতন জীবন্ত মানুষ দরকার ও মানুষের এই চেতনা আদতে সামাজিক পরিবেশ নির্ভর নয়। মানুষের চেতনা মস্তিষ্ক ও প্রাণের উপর নির্ভরশীল। সব নীতিবোধই উলটে পালটে যাচ্ছে—এ কথাও সত্যি নয়। মানবিক নীতিবোধ ও আইডিয়া অনেক সময়ে সামাজিক পরিবেশের চাইতেও বেশি প্রভাব বিস্তার করে :

'Some events in historj seem quite rise inaplicable in purely economic terms... the rise of Mohammed and the founding of Islam... Engels, more moderate than Marx, conceded that sometimes ideas might react on economics instead of vice-versa, (Brown—Evolution of society; Role of ideas, Marx-Engels correspondence.)

প্রুঁধোর নিহিলিজমের প্রভাবের ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্ম, রাষ্ট্র, সম্পত্তি ও তার বংশানুক্রমিক অধিকার, পরিবার—সব বিলুপ্ত করে দিতে চাইলেন। কিন্তু কার্যত ঃ এ-মতবাদ টেকে নি।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, শ্রেণী সংগ্রাম ও ইসলাম

ইতিহাসের ব্যাখ্যা করবার পরই কেবল সমাজকল্যাণ সম্ভব—এ কথা ইসলাম মানে না। তওহীদ থেকে পাওয়া মানবিক নীতিই আদতে নীতির পথনির্দেশ করে, পরে ইতিহাসের শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ থেকে রূপায়ণের নিরিখ ইসলাম নির্ধারণ করে। সমাজে শ্রেণী সংগ্রাম থাকাটা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। মজলুম শ্রেণীকে জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এর ভিত্তি শ্রেণী-নীতি নয়, এর ভিত্তি তওহীদী মানবতা। আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষের দাবী ইসলাম স্বীকার করে। তারপর মানুষের মনে কুপ্রবৃত্তি ও সুপ্রবৃত্তির যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেখানে সুপ্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যেতেও ইসলাম সুষ্ঠু মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায় ও

www.pathagar.com

সেই মানসিকতার মারফত সুষ্ঠু বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের সব পয়গম্বর মজলুমের হয়ে জালিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কুরআন বলেছেন, এক-একটা জাতি জালিম হয়ে যাওয়ার দরুন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মার্কসবাদের ঘোষণা, ধর্ম শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না—এ কথা ইসলামের নবীরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

বিবেকের জন্যে, সম্পত্তি রক্ষার জন্যে, উপাসনাগারের হেফাজতের জন্যে, স্বাধীনতা রক্ষার্থে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার্থে ইসলাম-প্রচার ও কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠার জিহাদও ইসলামে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। 'জিহাদ' মানে আল্লাহ্‌র পথে ন্যায়বিচারের জন্যে, সত্যের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম :

'হে মুমিনেরা, ন্যায়বিচার কর, আর কোন একটা গোষ্ঠির প্রতি ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারের পথ থেকে সরিয়ে না ফেলে। ইনসাফ কায়েম কর। আর সেটাই আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের কর্তব্য। মনে রেখ, তোমরা যা করছ, আল্লাহ সবই জানেন।' (৫ ঃ ৮) 'মজলুমকে সাহায্য কর' —(হাদীস)।

'ইসলামে মোল্লাবাদ নেই' (১০ ঃ ৪,৩ ঃ ৮০, ৩১ ঃ ৩৪)। আবার 'ধর্মীয় সমাজ মানে মোল্লাতন্ত্র নয় বা 'ধর্মীয়' এই নামকরণ করলেই ধর্মীয় ইসলামী সমাজ হবে না; ইসলামী নীতিগুলোর সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তামুদ্দুনিক বিষয়গুলোর মিলন হওয়া চাই।

ইসলাম অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণের মানে তাঁর যে নিয়ম তা পালন করা।

সমাজ-চিন্তায় মার্কসবাদের মূল্য

সমাজ-চিন্তায় মার্কসবাদের মূল্যটুকু স্বীকার করতে হবে। মার্কস সমাজ-বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করছেন। মার্কস দেখিয়েছেন, ইতিহাস শুধু গল্প নয়, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। মানুষের ইতিহাসে তিনি সংগঠনকারী গতিবাদের নির্দেশ করলেন।

ইসলাম ও আধুনিক সমাজ

কিন্তু দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদে পাওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাত্মবাদকে মার্কস স্বীকার করেন নি। তারপর, নীতির দিক থেকেও এই দর্শন শ্রেণীগত নীতি প্রচার করেছে। মানুষে মানুষে

www.pathagar.com

ব্যবহার ও অকমিউনিস্টের প্রতি ব্যবহারে মার্কসবাদ কোন মানবিক নীতি প্রদর্শন করতে পারে নি। Wellhausen বলেছেন : Mohammed extended morality from the time to the whole of humanity; ইসলাম তওহীদবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তওহীদবাদ থেকে যে ইসলামী তমদ্দুনের জন্ম হয় তার মৌলিক দিকগুলো হল—আল্লাহ্‌র একত্ব, সার্বজনীন নীতি, আইন ও ভ্রাতৃত্ব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অবিরত প্রচেষ্টা, গবেষণা ও অনুসন্ধান—কোন একটি দর্শনকেই ইসলাম পরিচালক হিসেবে মনে করতে পারে না। তওহীদ থেকে পাওয়া কতগুলো সার্বজনীন মূল্যবোধ ইসলামে রয়েছে, যেগুলো পরিবেশ ও প্রয়োজন বুঝে কাজে লাগিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী সমাজ গঠন করতে হবে। ইসলামের অধ্যাত্মবাদ না জেনে তার সম্বন্ধে রায় দেয়া 'অবৈজ্ঞানিক'। সেখানেও কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। সে বিজ্ঞানও অভিজ্ঞতামূলক ও সার্বজনীন। তবে পরীক্ষা পদ্ধতির উনিশ বিশ হতে পারে। মনকে সেভাবে তৈরি করলে এদিকেও গবেষণা করা যেতে পারে, মুসলিম আউলিয়াদের ইতিহাস ও দর্শন থেকে এ-কথা সহজেই জানা যায়। কিন্তু বস্তুকেও ইসলাম অবহেলা করে নি—বস্তু নিয়ে গবেষণা করে তাকে তওহীদের পরিচালনায় মানব-কল্যাণে নিয়োগ করা আল্লাহ্‌র ইবাদতের শামিল। তারপর যেখানে যা কিছু সত্য আছে, সুন্দর আছে, ইসলাম তা মানুষকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছে। হযরত বলেছেন : 'যা ভাল গ্রহণ কর, যা মন্দ বর্জন কর'। চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান লাভ কর।

ইসলাম শুধু মানুষের অর্থনৈতিক দিকটাই দেখে নি, অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি, রাজনীতি, তমদ্দুন—সব দিকেই ইসলাম দিয়েছে এক সর্বাঙ্গসুন্দর বিধান। মানুষকে ইসলাম মানুষ হিসেবেই মনে করেছে। তওহীদবাদের ভিত্তিতে ইসলাম মানুষকে দায়িত্বশীল জীব হিসেবে দেখেছে ও তওহীদবাদের মারফত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মানুষের সমস্যাবলীর সমাধান দিয়েছে। মানুষ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে ঊর্ধ্বগামী। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ অনিবার্যভাবে ইসলামের সর্বাঙ্গীণ জীবন-দর্শনের উপরেই নির্ভর করবে। দুনিয়া সেই বিধানের দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। বাস্তব রূপায়ণের ভেতর দিয়ে, পরিবেশের ওপর নজর দিয়ে ইসলামী আদর্শের ওপর আধুনিক দুনিয়া নতুন সমাজ গঠন শুধু সম্ভব নয়—অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

৮.

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় আসে। তাই বাংলা সাহিত্যের সাধনা ও বিকাশ তাঁদের হাত থেকে দূরে সরে যায়। এ স্থান দখল করেন হিন্দুঘেঁষা খ্রিস্টান মিশনারী ও হিন্দু সাহিত্যিকগণ। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারী, কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ড খ্রিস্টধর্ম প্রচারের তাগিদে যে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করলেন তাতে হিন্দুত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের একচ্ছত্র হিন্দুযুগ শুরু হল। এল হেমেন্দ্র মধূসুদন, বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্র, নধীনচন্দ্র ও বঙ্গিমচন্দ্রের যুগ। হিন্দুত্ব ও বাঙালিত্ব এক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দু বাংলা সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের একক রূপ হিসেবে চালানো হল বহু দিন। ফলে আদি থেকে বাংলা সাহিত্যের যে একটা মুসলিম ধারা ছিল তা বিস্মৃতির তলে লুকিয়ে গেল। বাঙালির জীবন বলতে হিন্দু বাঙালির জীবনই বোঝানো হত। বাংলাদেশের মুসলমানও যে বাঙালি, এ কথা সবাই একরকম ভুলেই গেল। মুসলমান কথাটি বাঙালি হিন্দুর কাছে অবাঙালি বলে ঠেকত।

অবশ্য অনেক আগে থেকেই ইসলামী জীবনদর্শন মুগল সাম্রাজ্যের রাজসিকতার চাপে পর্যুদস্ত হয়। গোষ্ঠি, গোত্র ও ভাষার ভিত্তিতে ইসলামী নামকরণের মহড়া চলতে থাকে। ফলে পাকিস্তান অর্জনের পর বহুদিনের নিপীড়িত বাঙালি মুসলিম যখন তার নিজস্ব ভাষার সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি চাইল ও মুখের জবানকে শিক্ষার বাহন করতে চাইল, তখন সে প্রচেষ্টাকে 'ইসলাম-বিরোধী' বলে ফতোয়া দেওয়া হল। এ সম্বন্ধে ১৯৪৬ সালের ৫ নভেম্বর তারিখে কলকাতার বেকার হোস্টেলের এক ভোজসভায় 'আমরা কোন পথে' শীর্ষক প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, 'ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দুর প্রচলন হবে এক রক্তমুখী ড্রাগন।' অনেকে বলেন, ইসলামী শিক্ষার জন্যে উর্দু বিশেষ দরকার। আমরা বলব, প্রয়োজন হলে বাঙালি মুসলমান উর্দু শিখবে। কিন্তু

www.pathagar.com

তাই বলে শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করা যায় না। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলে সেটা দাস মনোবৃত্তির পরিচায়ক হবে ও বাঙালি মুসলিমের স্বাভাবিক বিকাশ পিছিয়ে যাবে অনেক বছরের জন্যে। শুধু উর্দু কেন, জাগতিক প্রয়োজনের জন্যে ইংরেজিও আমাদের জানতে হবে। কিন্তু শিক্ষার বাহন মাতৃভাষায় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্য যে কোন ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চাপানো, দিনে ডাকাতি ও স্পষ্ট আলোকে লোক খুন করার মত। ... মুক্ত উদার মন নিয়ে আমাদের এ-কাজে এগুতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিলিতি ইংরেজি পিঠে যখন আমাদের সহ্য হয়নি, তখন নাগরী, উর্দু পিঠেও সইবে না। তবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপই হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন।

আবার অন্যদিকে মুষ্টিমেয় একদল আছেন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে, যারা হয় মোল্লা অনুগত, নয় নিজস্ব জীবন-দর্শনের আসল রূপ ও শক্তি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নিছক রেস্তোঁরাকেন্দ্রিক। এরা মনে করেন যে, বাংলা ভাষার দাবীটা মূলতঃ ইসলামবিরোধী। গোত্রগত গোষ্ঠিবাদ ও গুটিকয়েক লোকের হরফ অভিযানকে এরা ইসলামের সঙ্গে এক করে দেখে এক ধরনের উগ্র বাঙালিত্বের ও গোষ্ঠিবাদের পত্তন করলেন। কিন্তু আল কুরআন তো সব ভাষাই স্বীকার করেছেন। আমাদের জীবনাদর্শ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ভাষা, এলাকা, স্থান ও কালের প্রভেদ স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এ-গুলোকে নৈতিক মূল্যমানের মাপকাঠি হিসেবে কখনই মনে করে নি। গোত্র ও মানবতার সংঘর্ষে তওহীদবাদ সগৌরবে মানবতার বিজয় ঘোষণা করে।

কাল রাত্রির ঘোর আজ কেটেছে, আমাদের ভুল ভেঙেছে। মাতৃভাষার সংগ্রামে যেমন আমরা জয়ী হয়েছি, বুলি কপচানো ও ভুল বোঝাবুঝিরও আজ অবসান হয়েছে। আমরা বুঝতে শিখেছি যে, মাতৃভাষার দাবী আমাদের জীবনদর্শনের ও সংস্কৃতিচেতনার বিরোধী নয়। আসলে যা আমাদের সংস্কৃতির বিরোধী তা হল—স্থানকেন্দ্রিক উগ্র গোষ্ঠিবাদ ও ভাষাভিত্তিক দলীয় অন্ধতা। আমাদের সংস্কৃতির সার্বজনীন ও মানবিক আদর্শ ও নীতিই সব মানুষকে এক করেছে ও এক সুষম সুবিচার সুলভ সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করতে আহ্বান জানিয়েছে। মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে ন্যায়নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, বাঙালিত্বের ভিত্তিতে নয়, আল্লাহ্‌র একত্বের ভিত্তিতেই ইসলাম হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, আমেরিকান, রাশিয়ান, ব্রিটিশ, জার্মান, এশীয় ও ইউরোপীয় সবাইকে স্বীকার করে নিতে ও ভালবাসতে শিখিয়েছে। ভূগোল ও দেশের রীতি অবশ্য স্বীকার্য জিনিস, কিন্তু এ-গুলো আমাদের সংস্কৃতির একচ্ছত্র মূল্যমান নয়। তওহীদের মূলনীতিই আবার

www.pathagar.com

দুনিয়ার যেখানে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় তাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। পৃথিবীর অন্য যে কোন সভ্যতার মূল্যমানের চাইতে তওহীদবাদ তাই অনেক অধিক প্রগতিশীল বলে দাবী করতে পারে। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবগুলো ক্ষেত্র আজ তওহীদবাদে ও ঐক্যে পৌঁছাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। আর যাদের সংস্কৃতিতে তওহীদবাদই সব চাইতে বড় কথা, তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে বিকাশের মহান সুযোগ; অবশ্য যদি তারা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে এই বিশ্ব-ঐক্যের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারেন। কারণ কোন সংস্কৃতির রূপ-গুণ বিচার করা যায় তার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও ইশারা থেকে। নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা আজ আমাদের পক্ষে তাই এক অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বে আমাদের অনেকের ধারণা ছিল যে, আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে, সাংস্কৃতিক সমস্যা নাকি (তদানীন্তন) পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না, সমস্যা নাকি সব পূর্ব পাকিস্তানের অর্থাৎ বাংলাদেশের। আসলে কিন্তু তা সত্য নয়। বাংলা সাহিত্যে পৌত্তলিকতা নৈরাজ্যবাদ ও সংশয়বাদের অনুপ্রবেশের ফলে যেমন সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে আদর্শিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পাকিস্তানী সাহিত্যে গোষ্ঠিগত অন্ধত্ব ও আরবি হরফ ও ইসলামকে এক করে দেখার দরুন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমস্যার অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে শুধু আরবি, ফারসী ও উর্দু কেন, দরকার হলে জার্মান, ফরাসী ও স্পেনীয় ভাষাও শিখতে পারি; কিন্ত কেবল আরবি ফারসীতেই ইসলামের চর্চা সম্ভব, এ কথা শুধু মিথ্যা নয়, ইসলামী আদর্শের দিক থেকেও তা এক ঘোর দুর্যোগ। কারণ আমাদের আদর্শ শুধু কবরস্থানের দাফন-কাফনে নয়, জীবনের পরতে পরতে রয়েছে তার সার্থক ভূমিকা। সব ঠিক আছে মনে করে বসে থাকলে, মুসলমান সমাজে মুসলমানী আদব-আচারতো আছেই, এ কথা মনে করলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতি সম্বন্ধে ভয়ানক ভুল ধারণা পোষণ করা হবে। সমাজের বিবর্তনে সংস্কৃতির সারবস্তুটুকু গণমানসে প্রবেশ করানো চাই। তাই নিছক পুনরুজ্জীবন বা Revivalism-এ কোন কাজ হবে না। সুবিপুল মননশীলতা, আগ্রহ ও সহানুভূতি নিয়ে, সংগঠনের দিকে, সাধনার পথে অগ্রসর হতে হবে। সাহিত্যের অগ্রগতি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করার আর কোন পথ নেই।

এবারে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তি কি ও সাহিত্য বিকাশের ভবিষ্যৎ ধারা কি হতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

আল-কুরআন এ কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেন : 'মহান আল্লাহ্ মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন' (আর-রাহমান ৫৫ ঃ ১-৪)। সে হিসেবে দুনিয়ায় সব ভাষাই ইসলামী ভাষা। কারণ প্রতিটি ভাষা আল্লাহ্র দেয়া শক্তি থেকে উদ্ভূত। আল্লহ্ বলেন : 'কুরআনকে আমরা তোমাদের নিজের ভাষায় সহজ করে তৈরি করেছি যাতে তোমরা সাবধানবাণী শুনতে পাও' (লুকমান ৪৪ ঃ ৫৮)। কিন্তু এ-ভাষাই তো কাফিরদের ভাষা ছিল। কুরআনের মতে মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বরেরা তাঁদের নিজ নিজ ভাষার ভেতর দিয়েই ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। 'আমরা একজন রসূলও পাঠাই নি, যিনি তাঁর গোষ্ঠির নিজের ভাষার মারফত প্রচার করেন নি, যাতে করে তারা আল্লাহ্র কালাম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।' [ইবরাহীম ১৪ ঃ ৪]

ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টির মহিমা ও বৈচিত্র্য ঘোষণা করে। তাঁর (আল্লাহ্র) নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে আসমান-জমিনের সৃষ্টি আর, বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্য। এর মধ্যে সব মানুষের জন্যে রয়েছে অগণিত নিদর্শন (আয্যুমার ৩০ ঃ ২৭-২৮)। দুনিয়ার সব ভাষাই ইসলামী ভাষা ও ইসলামী জীবনদর্শন প্রকাশের উপযোগী। বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় বিচিত্র সংস্কৃতির সমাহার মানবতার উদ্বোধন ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের পন্থাই হল ইসলামী সংস্কৃতি। পার্থক্য থাকলেও অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। তমদ্দুন বলতে শুধু শহরের সভ্যতাই বুঝায় না : শহর ও গ্রাম সব জায়গার সংস্কৃতিকেই বোঝায়। কুরআন বলেন : 'বিভিন্ন জাতিকে পারস্পরিক আদান-প্রদান, পরিচিতি ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্যেই পয়দা করা হয়েছে।' তবে কেবল সেই জাতি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে, যারা মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ উগ্র গোষ্ঠিবাদ ও জাতীয় অন্ধতার ফলে গোষ্ঠির (Recial) গোত্রবাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে ইসলামকে এক করে দেখা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই মানসিকতার সঙ্গে ইসলামের কোনও রফা হতে পারে না। কারণ ইসলামে কোনও একটি ভাষা মানুষের শ্রেষ্টত্বের মানদণ্ড নয়—নীতিজ্ঞান ও তার বাস্তব রূপায়ণই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র নিরিখ।

বিভাগোত্তরকালে আমরা যে নিজস্ব আবাসভূমি পেয়েছিলাম, তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে আমরা লাভ করি নি। মুক্ত আবহাওয়ায় মুসলিমের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ইসলামী জীবনদর্শনের সর্বাঙ্গীন রূপায়ণের জন্যেই আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম। পাকিস্তানের সুষ্ঠু সংগঠনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বিপন্নবাদের নামে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান না করা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি তথাকথিত, 'প্রগতির' নামে পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তিটাকে এড়িয়ে যাওয়াও একইভাবে বিভ্রান্ত ও আত্মঘাতী মনোবৃত্তির পরিচায়ক ছিল। কেবলমাত্র মুসলিমের জন্যে পাকিস্তানের জন্ম হয়নি, ইসলামী জীবনদর্শনের বাস্তব রূপায়ণের জন্যে, মানুষ ও মানবতার জন্যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ মুসলিমের এই সুষ্ঠু সমাজ গঠনের মিশনকে আরও বেশি জোরদার করেছিল। বিভাগপূর্বকালে তারা পাকিস্তান নামের ইসলামী রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, যাতে করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কোন মানুষকেই আর এহেন জুলুম সহ্য করতে না হয়। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে মুসলমানেরা সেই রাষ্ট্র বোঝেন, যেখানে মানবতা ও তার অনুসারী ইসলামের মূলনীতিগুলোই অপরিবর্তনীয়—কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নীতিগুলোর রূপায়ণে আসে আপেক্ষিকতা ও বিবর্তন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা হয় প্রগতির নামে, নয় রাজতন্ত্র ও ইসলাম ইসলাম ধুয়া তুলে ইসলামের প্রকৃত মানবিক নীতিগুলো ও তার অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। এ কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইসলামী সমাজ গঠন না করলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা কখনই সম্ভব হয় না। এ-সমাজ গঠনের ব্যাপারে সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। বিভাগপূর্ব ভারতে উপমহাদেশীয় মুসলিমদের স্বাধীনতার আন্দোলনের পেছনে যে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতি চেতনাবোধ সক্রিয় ছিল, সে সম্পর্কে দার্শনিক মহাকবি ইকবাল ১৯৩৭ সালের ২০ মার্চ তারিখে বলেন : ভারত ও ভারতের বাইরের দুনিয়াকে এ কথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলিম জনসাধারণের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক সমস্যা ভারতীয় মুসলিমের পক্ষে আরও বেশী গুরুত্ববহ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রাজনৈতিক কারণে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে। তবু মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে তার সাংস্কৃতিক রূপ ইসলামী সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠির যে সংস্কৃতি-চেতনা তাদের উদ্বোধিত করেছিল বাংলাদেশীরা তার উত্তরাধিকারী। তাদের উচিত হবে সাহিত্যের উন্নয়নে নিজস্ব সাহিত্যিক ভাষা গড়ে তোলা। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে মূলতঃ গ্রামীণ হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাষাগত ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে আবার অনেক তফাতও রয়েছে, তবে জোর করে কৃত্রিমভাবে কোনও ভাষা চাপানো চলবে না। জনগণের বোধগম্য ভাষাই হবে এই সাহিত্যের বাহন। তাদের জীবনের প্রত্যেক্ষ অনুভূতি, প্রতিচ্ছবি তাদের জবানীতে প্রকাশিত হওয়া চাই।

www.pathagar.com

গঙ্গাতীরের ভাষা চাপান যেমন মারত্মক হবে, তেমনি 'গঙ্গাতীর' ও 'পদ্মাতীর' নিয়ে বেশি মাতামাতি করাটাও আমাদের জীবনাদর্শের দিক থেকে অমূলক হবে। সাহিত্যে থাকবে আনন্দ, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার সবুজ সাক্ষর। জনগণের সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এক সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু মাথার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তওহীদবাদ। আমাদের সাহিত্যের যে ভাষা চলতি আছে তাকে যেমন বাদ দেয়া যায় না, তেমনি তার হুবহু অনুকরণও নিরাপদ নয়। আমাদের বাড়িতে, দহলিজে, কথাবার্তায় যে ভাষা সততই ফুটে ওঠে. সেই ভাষার সঙ্গে চালু সাহিত্যিক ভাষার সমন্বয়েই আমাদের নিজস্ব নতুন সাহিত্যিক ভাষার জন্ম হবে। এ জন্যে অবশ্য আমাদের ভাষাকে অযথা আরবি-ফারসী বা সংস্কৃত শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত করার দরকার নেই। সকলের বোধগম্য নয় এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রযোজ্য শব্দ দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টিই দেশোপযোগী হবে বলে মনে করি। এ-উদ্দেশ্যে এই নতুন সাহিত্যিক ভাষার পরিভাষা ও অভিধান প্রণয়ন অপরিহার্য। এখুনি এ-কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার। ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এ ভাষাকে চালু করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও যথাসম্ভব এ ভাষার প্রচলন করা প্রয়োজন। সিনেমা ও রেডিও মারফত এ ভাষাকে জনপ্রিয় করারও বিস্তর অবকাশ রয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায় সন্ধানী দৃষ্টি রাখলে এ কাজ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে আরবি-ফারসী-উর্দু সাহিত্যকে বাংলায় ও বাংলা সাহিত্যকে আরবি ফারসী ও উর্দুতে প্রচার করতে হবে। কেবলমাত্র কুরআন শরীফ পড়বার ব্যবস্থা করলেই চলবে না—গোড়া থেকে সম্ভবমত ও শ্রেণীমত বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার্থীর মনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান থাকলে জ্ঞানের সমগ্র শাখাই ইসলামী শিক্ষার আওতায় পড়বে। এ-জন্যে তথাকথিত 'ধর্মীয়' (মাদ্রাসা) শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবধান তুলে দিতে হবে।

জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে হলে, সিপাহী বিপ্লবপূর্ব যুগের উপমহা-দেশব্যাপী বিরাট মুজাহিদীন আন্দোলন ও বাংলায় মুহম্মদী ও ফারায়েযী আন্দোলন যে বিরাট ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে ইতিহাস বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। মুজাদ্দিদ-ই-আলফিসানী. সৈয়দ অহমদ বেরেলভী, আহমদ উল্লাহ শাহ, শাহ ইসমাঈল শহীদ, হাজী শরিয়ত উল্লাহ, দুদু মিয়া, নিসার আলী তিতুমীর, খলীফা আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, আবুযর গিফারী, খলীফা, উমর বিন আবদুল আজিজ, মাখদুম শেখ (পাণ্ডুয়া), মওলানা আতা শাহ, শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী, শাহ সুলতান, মাহিসাওয়ার আদম শহীদ, বায়েজীদ বোস্তামি শেখ বদর

www.pathagar.com

আলম, আঁখি সিরাজ উদ্দীন, আলাওয়াল হক, হযরত নুর কুতুবুল আলম, খানজাহান, খান গাজী, শাহ ইসলামী গাজী, হযরত মাসুদ, হযরত মোহায়মিন, হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হোসেন উদ্দীন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব—এসব বীর, মুজাহিদ, রাজনীতিজ্ঞ, সাধক ও ধর্ম প্রচারকদের ও অন্যান্য অসংখ্য সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও সড়কের নামকরণ করা জাতির চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য উদ্ধার করতে হবে ও সে সমস্ত সাহিত্যের প্রকাশের পথ সুগম করতে হবে। শাহ মুহম্মদ সগীর (চতুর্দশ শতাব্দী : ইউসুফ জোলেখা), শেখ ফয়জুল্লা (জয়নলের চৌতিশা), জয়নুদ্দিন (রসূল বিজয়), সৈয়দ সুলতান (পঞ্চম শতাব্দী— 'রসূল বিজয়', 'জ্ঞান প্রদীপ', 'নবী বংশ', 'শব এ-মেরাজ', 'ওফাত-এ-রসূল',) আফজাল আলী (নসিহত নামা), হাজী মুহম্মদ (নূরজামাল), মুহম্মদ খাঁ (হানিফার লড়াই), সৈয়দ হামজা (আমীর হামজা), নাসরুল্লা খাঁ (ষষ্ঠ শতাব্দী, শরিয়ত নামা), সাবিরিদ খাঁ (কায়রাপরী, রসূল বিজয়), মুহম্মদ কবীর (মধুমালতী), নওয়াজিশ খাঁ (গুলে বকাওলী), মুহম্মদ হোসেন (সপ্তদশ শতাব্দী), মকতুল হোসেন (কিয়ামত নামা,) আবদুল হাকিম (সপ্তদশ শতাব্দী—১৬২০–১৬৯০ শিহাবুদ্দিন নামা, কারবালা), ইয়াকুব (মুক্তল হোসেন) হায়াত মাহমুদ (মহর্‌রম পর্ব, আম্বিয়াবাণী : হিজজ্ঞান-বাণী), গরীবউল্লা, (মুক্তল হোসেন), রেজাউল্লা আমীর উদ্দীন ও আশরাফ উদ্দীন, (কাসাসুল-আম্বিয়া)

মুহম্মদ জান (নামায মাহাত্ম্য), কাজী বদিউদ্দীন (ছিফৎ-ই-ঈমান), মাল-ই-মুহম্মদ (আহকামুল জুমা), শাহ আকবর, শাহ গরীবউল্লা, নাসির মাহমুদ, সৈয়দ মুর্তাজা, আলাওল (দারাসিকান্দার নামা, পদ্মবতী), আকিল মুহম্মদ, (জঙ্গনামা ১৭৮২—১৭৮৯), মুতালিব (কিফায়াতুল মুসাল্লিন, ১৮৫১)—এদের লিখিত এই সব কিতাব প্রকাশ ও স্থানবিশেষে পুনর্মুদ্রণ অপরিহার্য। বৌদ্ধ দোঁহা ও বাংলা পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গবেষণার এক বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে যার মধ্যে আমাদের সংস্কৃতির অনেক মালমশলা পাওয়া যেতে পারে। খন্দকার শামসুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী (ভাবলাভ ১৮৪৯), মুনশী মেহেরুল্লাহ (বিধবাগঞ্জনা কাব্য ১৮৬৩—১৯০৯), মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯৩৩), মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩), শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ মেয়রাজ উদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন, শেখ ফজলুল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাঃ লুৎফর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, কবি গোলাম হোসেন, মুহম্মদ সিরাজউদ্দীন প্রমুখ

www.pathagar.com

সাহিত্যিকদের ও আধুনিক কালের কবি লেখকদের লিখিত গ্রন্থগুলো মুদ্রণ ও স্থানবিশেষে পুনর্মুদ্রণের বন্দোবস্ত করা উচিত। লালন ফকিরের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ, পাগলা কানাই এর ধুয়া ও জারীগান, বাউল; রশিদউদ্দীন, জালালুদ্দীন ও আব্বাসের বাউল গান, মীর মোশাররফ হোসেনের ইউসুফ-জোলেখা, মনসুর বয়াতীর গান, শেখ ফজলুল করিমের মাণিক জোড়, চাঁদবিবি, প্রতিশোধ, কান্তনামা কবিতাবলী, হযরত পয়গম্বরের জীবনী, রাজা মহিমরঞ্জনের পশ্চিম ভ্রমণ ও চমচম, এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে। এ-গুলোও অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ করার কাজে এখুনি এগিয়ে আসতে হবে। রওশন আলী, হাবীবুল হোসেন ও আজিজ উদ্দীনের অনুবাদ সাহিত্য, মীর্জা ইউসুফ আলীর সৈয়দ আলী, সৌভাগ্য স্পর্শমণি', ঈমাম গায্যালীর 'আহ্য়া-উল-উলুমের' বঙ্গানুবাদ বা মওলানা শামসুল হকের বেহেশতী যেওর'-এর (মওলানা আশরাফ আলী থানভী থেকে) পুনর্মুদ্রণের বন্দোবস্ত করতে হবে; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কারিগরীবিদ্যা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক অবিলম্বে বাংলায় প্রণয়ন ও তরজমার বন্দোবস্ত করতে হবে। নতুবা অফিসে-আদালতে ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার প্রবর্তন সুদূরপরাহত হয়ে পড়বে। প্রতিশব্দ ও পরিভাষা তৈরির কাজে আমাদেরকে তাই সর্বপ্রথম হাত দিতে হবে। পরিশেষে বলে রাখি, আমরা যদি আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে সমাজ সংগঠনের দিকে অগ্রসর হই, তবে আগে চলার ধাপ্পা দিয়ে তা আমাদের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর তা হবে প্রগতির নামে বিকৃত ও পরের ধনে পোদ্দারী। কারণ, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপরেই মুসলিম-প্রধান বাংলাদেশের ভিত্তি। সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক উন্নয়নে সহনশীলতা, ধৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদের সামনে বিকাশের পথ খুলে দেবে।

www.pathagar.com

৯.

পুঁথি-সাহিত্যের ভূমিকা

যারা মনে করেন যে, পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যেই কেবল বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতির নজির খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা একটি আংশিক সত্যকে খুব বড় করে তুলে ধরেন। আর কেবল পুঁথি-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই রেনেসাঁ লুকিয়ে আছে, এমনিধারা আত্মবদ্ধতাও খুব সুখকর নয়। ইতিহাসের আলোকে অবশ্য এ-কথা খুবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলিম বাদশাহ্‌দের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কল্যাণেই বাংলা ভাষা মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পুঁথির মধ্য দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। বিরাট পুঁথি-সাহিত্যের সবটুকু মুসলমানের ঐতিহ্যের বাহকও নয়। বরং অনেক স্থলে ইসলামের সঙ্গে তার বিরোধ রয়েছে। কখনও কখনও হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি একসাথে মিশে গিয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত দেবমাহাত্ম্য প্রচারে যে সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তাকে প্রতিহত করবার জন্যেই কিছুটা সেই ধরনের অথচ ভিন্ন মাল মশলা দিয়ে জনপ্রিয় মুসলিম পুঁথির আবির্ভাব হয়। এর মধ্যে অনেকগুলোতে ইসলামী জীবনদর্শনকে সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবলমাত্র এই শেষোক্ত পুঁথিতেই ইসলামী সংস্কৃতির আংশিক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে (...লেখকের মতে সপ্তম শতক থেকে) শাহ্ মুহম্মদ সগীর, (ইউসুফ-জোলেখা), সৈয়দ সুলতান, (১৫৫০—১৬৪৬ জ্ঞানপ্রদীপ, মকতুল হোসেন), মোহাম্মদ খাঁ (১৫৮৮—১৬৫০) ও সৈয়দ মুর্তাজা দরবেশ সাহেবের লেখায় ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। সৈয়দ সুলতান নিজে দরবেশ ছিলেন ও সাধারণের ভাষায় কাব্য চর্চার ফলে তাঁর লৌকিক আবেদন ছিল অপরিসীম। ষষ্ঠ ও সপ্তদশ শতকের সাহিত্যের উপরই পরবর্তী যুগে বাঙালি মুসলিম ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। মীর মোহাম্মদ

www.pathagar.com

শফী ও মোহাম্মদ কবীর (মধুমালতী) থেকেই পুঁথি লেখা একরকম শুরু হয় বলা চলে। পুঁথির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। যে যুগে এ সংযোগের অন্যান্য উৎসগুলো ছিল নিতান্ত দুর্বল ও শিথিল, তখন পুঁথি সাহিত্য মুসলিম গণমনে বিরাট সাংস্কৃতিক বন্ধনীর কাজ করেছিল। পুঁথিকারগণ বাস্তববাদী ছিলেন। জনপ্রিয় হিন্দু পূরাণ থেকে রূপক নিয়ে মুসলিম কাহিনী ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্মোচন করতেও তাঁরা কসুর করেন নি। মুসলিম মানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করাই ছিল তাঁদের মূল নিরিখ। দশশত সপ্তাব্দীর পুঁথি সাহিত্যে শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌র নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইনি মহব্বৎনামা, ইউসুফ জোলেখা, আমীর হাম্‌জা-প্রথম পুস্তক, জঙ্গনামা, সত্য-পীরের পুঁথি ও সোনাভানের পুঁথি লেখেন। হুগলী জেলার ইসমাইল গাজী সাহেবের নিকট থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেন। পরগনার মোহাম্মদ ইয়াকুব জঙ্গনামা লেখেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৈয়দ হামজা (জন্ম—১৭৭৩) আমীর হামজার দ্বিতীয় অংশ লেখেন (তাছাড়া হাতেমতাঈ, সোনাভান, জয়গুনের পুঁথি)। সৈয়দ হামজা শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌কে আধ্যাত্মিক অধিকর্তা বলে স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে শাহ্ সাহেবের দেখা হয় নি। কারণ গরীবুল্লাহ্ ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর লোক।

শাহ্ গরীবুল্লাহ্ যে বাদশাহ বা দেওয়ানের কথা বলেছেন, তার দ্বারা East India Company-কে বোঝানো হয় নি, কারণ মুঘল বাদশাহই ছিলেন তখনকার দিনে সমগ্র জনসাধারণের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'মহব্বতনামা'র একটা লাইন থেকে শাহ্ গরীবুল্লাহর লেখায় মুসলিম সাংস্কৃতিক চেতনার মূল সুরটি ধরা পড়ে :

আল্লাহ্‌তায়ালা ছালামত রাখিবে বাদশারে
ছের ছালামতে রাখ বাদশার উজিরে ॥
দোজখ আজাব হইতে তারাও করতার
ঈমান বজায় রাখ মুমিন সবার।
আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান
সবাকার তরে বান্দা হও নেগাবান ॥

বোধহয় শাহ্ গরীবুল্লাহ্ আলাওলের (১৬০৭—১৬৮০) সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ের লেখাতেই মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু আলাওলের সাথে শাহ্ সাহেবের পার্থক্য এই যে, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ মধ্য-বাংলাঞ্চলে প্রচলিত সাধারণ

www.pathagar.com

লোকের বাংলা ভাষায় যে পুঁথি রচনা করেন তা কৃত্রিম ভাষায় রচিত হয় নি। তাই জনগণের মধ্যে এ পুঁথি একান্তভাবে মিশে গিয়েছিল। তাছাড়া তাজুদ্দিন মোহাম্মদ কাসাসুল আম্বিয়া-১ম পুস্তক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেজাউল্লাহ্, আমিরুদ্দিন ও আসরাফ আলী (১৮৬১) এ বই এর উন্নত রূপদান করেন. মোহাম্মদ খাতের (ছহী বড় শাহনামা, কাসাসুল আম্বিয়া), মুন্সী মোহাম্মদ জোনাব আলী (তাজকিরাতুল আউলিয়া), মুন্সী মফিজুদ্দিন (আলিফ লায়লা), ফকির মোহাম্মদ শাহ্ (ছহী বড় সোনাভান), জয়নুদ্দিন (রসূল বিজয়), হায়াত মাহমুদ, শফীউদ্দিন, ফয়জুল্লার (গোরক্ষ বিজয়) নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনিশ ও বিশ শতকে জ্ঞাত অজ্ঞাত অগণিত পুঁথিকার লেখনী ধারণ করেছেন। অনেক পুঁথি লোকের মুখে মুখে রক্ষিত হয়ে এসেছে। বিশ শতকে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ও মোহাম্মদ আব্বাস পুঁথি রচনা করেছেন। কাজেই পুঁথিকে নিছক বাইরের জিনিস মনে করা ভীষণ ভুল হবে। পরবর্তীকালে কৃত্রিম ভাষায় সাহিত্য রচিত হবার কালে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ভাষার প্রতি উন্মাসিকতার বহর খুব বেড়ে যায়; তাই, আমাদের সংস্কৃতিতে পুঁথির দান এ-মানসিকতার চাপে অস্বীকৃত থেকে না গেলেই ভাল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তওহীদবাদকে তুলে ধরার ব্যাপারে পুঁথির কার্যকারিতা অপরিসীম সাফল্য লাভ করেছে। জীবনের সঙ্গে সুগভীর সংযোগের ফলে জীবনের সহজ সত্য ও অনুভূতি এতে প্রতিভাত হয়েছে। জীবনের শান্ত সুমিতভাবে পুঁথিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই সাধারণ লোকের জীবনে পুঁথির প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। হাজার হাজার লোক এর মাধ্যমে জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছে, রসপিপাসা মিটিয়েছে।

অবশ্য পুঁথির আঙ্গিক খুবই দুর্বল। বার বার একই শব্দ ও ভাব ব্যবহারে এটা ধরা পড়ে। এ-আঙ্গিকে উঁচু দরের সাহিত্য রচিত হতে পারে কি না সন্দেহ। কিন্তু এর আরও একটি দিক আছে। আঙ্গিকের জটিলতাই কেবল শিল্পকর্মের উৎকর্ষের বাহক নয়। রচনা, লেখা ও আঙ্গিকের ঊর্ধ্বগতির সাথে সাথে পুঁথির সহজ সৌন্দর্য ও সাধারণ মানবিক সারল্য ধরে রাখতে পারা চাই। নইলে সুন্দর শিল্পবস্তু গড়ে উঠতে পারবে না। নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-চেতনা থেকে বিচ্যুত হলে 'বাবু-সাহিত্য' গড়ে উঠতে পারে; কিন্তু মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ভাটা পড়তে বাধ্য।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রেও পুঁথির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কায়কোবাদ, মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আলী আহসান ও ফররুখ আহমদের ওপর এর প্রভাব নানাদিক দিয়েই সুস্পষ্ট। কায়কোবাদের 'মহরম শরীফ' মুহম্মদ খাঁর 'মক্তল হোসেন'-এর ছায়াবলম্বনে রচিত হয়েছে। মোহাম্মদ এয়াকুবের

www.pathagar.com

'জঙ্গনামা', মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধুর' মাল-মশলা জুগিয়েছে। মোজাম্মেল হক 'শাহনামা' রচনায় মুন্সী মোহাম্মদ খাতেরের 'ছহি বড় জঙ্গনামা' থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। মোহাম্মদ দানেশের 'চাহার দরবেশে'র আধুনিক অনুকৃতি হল সৈয়দ আলী আহসানের 'চাহার দরবেশ। ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেমে' এই পুঁথির প্রভাব সুস্পষ্ট। ফররুখের অমিত্রাক্ষর, কথ্যভাষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অমিত্রাক্ষরে নতুন দিগদর্শনের জন্ম দিয়েছে। এলিয়টের 'The Rock and Murder in the Cathedral-এর সাথে এর তুলনা করা চলে। তা'ছাড়া শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যরত্ন প্রণীত 'লায়লা মজনু', সৈয়দ আবদুল মান্নানের 'গুলে বকাওলি', মোহাম্মদ ইয়াছিনের 'জোলেখা', আবুল মনসুরের 'মুসলমানী কথা' ও আশরাফুজ্জামানের 'শায়ের নামার' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নতুন সাহিত্য রচনায় যেমন পুঁথি থেকে প্রচুর মাল-মশলা পাওয়া যেতে পারে, তেমনি এ-যান্ত্রিক যুগে আধুনিক বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে সহজ সারল্য এনে দেবার ব্যাপারেও পুঁথি আমাদেরকে অংশতঃ পথ দেখাতে পারবে। মুসলিম মানসের বিবর্তনের বিশ্লেষণ-অনুশীলনেও এর গুরুত্ব কম নয়।

www.pathagar.com

১০.

ইকবালের জীবনদর্শন

মুসলিম ভারতে আধুনিক রাজনৈতিক বিবর্তনের সবচাইতে শক্তিমান এবং প্রতিভাশালী নায়কদের মধ্যে ইকবাল ছিলেন অগ্রগণ্য। মুসলিম জাতির হতাশা, নিশ্চেষ্টতা ও পতনের জন্যে তাঁর ক্ষোভ ছিল নিদারুণ ও দুঃখ ছিল অপরিসীম। পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্যবাদ তাঁকে খুশী করতে পারল না। তাই তিনি গভীর অধ্যয়ন আর কঠোর সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, এসেছে আজ প্রগতির যুগ। নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমহীনতা, জীবন সংগ্রামে পরাঙ্মুখতা, ক্লীবতা বা দুর্গতির যুগ এ-নয়। সারা মুসলিম জাহানে জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। পশ্চিমী সভ্যতার জাঁকজমকে কেউ যেন না ভোলে। সেই জাগৃতির আলোক-বর্তিকা বহনের অগ্রদূত সারা বিশ্বের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুসলিম আজ জেগে উঠেছে; নতুন প্রাণের রক্তবেদিকায় নতুন সৃজন মহিমায় তাঁরা জেগে উঠেছে বিশ্বের দিকে দিকে। আজ চিরঞ্জীব ইসলামের জাগরণ চাই, তার সামাজিক রূপায়ণ চাই। ইসলামী জীবনধারার ওপরে প্রতিষ্ঠিত এক সত্য বিশ্বাস ও উপলব্ধিগত সংগ্রামময় আদর্শ জীবনবোধের দিকে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানালেন ঘুমন্ত ভারতীয় মুসলমানকে।

উপমহাদেশে যখন মধ্যযুগীয় হাবভাবের চূড়ান্ত অন্ধতা বিদ্যমান ছিল ও সবে পশ্চিমী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, সে-সময়েই ইকবাল এলেন একদিকে অন্ধতা ও অন্যদিকে চোখ ঝলসানো সভ্যতার মাঝামাঝি এক বলিষ্ঠ ও প্রতিশ্রুতিশীল জীবনদর্শন নিয়ে—যা মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব ও মানবতাকে বিসর্জন না দিয়ে সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে শেখাল। একদিকে যেমন তিনি পাশ্চত্য দর্শন অধ্যয়ন করলেন, অন্যদিকে আরবি-ফারসী ও উর্দু সাহিত্যও ছিল তাঁর নখদর্পণে। ইসলামের মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যার জায়গায় কুরআনিক ইসলামের মারফত মানবসমাজ পরিচালনার কথা তিনি সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁর কবিতার পরতে পরতে মিশিয়ে দিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুর্শিদ হচ্ছেন মওলানা জালালউদ্দীন রুমী, কিন্তু ইকবাল

www.pathagar.com

মধ্যযুগের সুফিবাদের সুপ্তি ও হতাশার বাণীকে সমালোচানার কষাঘাতে জর্জরিত করলেন।

ইকবালের জীবনদর্শনের সবচাইতে বড় কথা হল : 'খুদী' বা অহ্‌ম। 'খুদী'-কে জাগ্রত করাই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য। আত্ম-উপলব্ধি ছাড়া কর্ম অর্থহীন। ব্যক্তিত্ব বা খুদীর বিকাশ হয় কর্মের মধ্য দিয়ে। 'খুদীর' বিকাশ হয় সমাজ জীবনে :

ব্যক্তির প্রাণ সমাজ সঙ্গ
আর কিছুতেই নয়,
সিন্ধবক্ষে বাঁচে তরঙ্গ
আর কিছুতেই নয়।

এই 'খুদী'-কে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডী থেকে বাঁচাতে হবে। খুদীর বিকাশ সাধনা করতে হলে আদিশক্তির বা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য, নিজের ইচ্ছাকে দমন করা ও নিজেকে দায়িত্বশীল আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে মনে করা—এই তিনটি মানসিকভাব রাখা অপরিহার্য। আল্লাহ্‌ সবচাইতে বড় খুদী। সেই বড় খুদীর যত কাছে যাওয়া যাবে ততই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে। ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে মিশে যায় না, সান্নিধ্যে আসে মাত্র, পদার্থ অবহেলার বস্তু নয়। জড়পদার্থের সংস্পর্শেই ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ হয়। বিশ্ব প্রকৃতির শেষ নেই—এ চিরন্তন ও চিরগতিশীল। ইকবাল বলেন যে জড়প্রকৃতির চেতনাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় নয় ও এমনকি জড়প্রকৃতি বুঝতে পেলেও জ্ঞানলাভের আর একটি উপায় গ্রহণ করতে হয়। ইকবাল এর নাম দেন 'ইনটুইশন' বা যোগচেতনা। সবাই এই যোগচেতনার অধিকারী হতে পারেন। ইসলামের ধর্মীয় জীবনে আছে তিনটি স্তর : ঈমান, চিন্তা ও গবেষণা। ইকবাল বুদ্ধিবাদের বিরোধী না হলেও অতি-বুদ্ধিবাদিতার ঘোর নিন্দা করেছেন। অতিবুদ্ধিবাদিতার ফলেই ইউরোপে বিরাজ করছে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা। বুদ্ধিমত্তা ও মানবতার মিলন তাই তাঁর কাম্য :

আজ তুমি এই
বুনিয়াদ গড়ো, নয়া দুনিয়ার
মিলন সাধন
বুদ্ধিমত্তা ও ভালবাসার

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, তার অন্তর্নিহিত বিপুল শক্তিকে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ্‌র কাছে সব চাইতে প্রিয় যে 'খুদী', তার রূপায়ণের জন্যে সেই শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। ইকবালের স্থান সাধারণ দার্শনিকের অনেক ওপরে—তাঁর

www.pathagar.com

মধ্যে আমরা দেখি চিন্তা ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর আদর্শবাদ ছিল একান্তভাবে বাস্তব। তিনি বললেন যে, তওহীদের ওপর ভিত্তি করে আশাবাদী অধ্যবসায় ও বাস্তববাদী সমাজ সংগঠন একান্তভাবে ইসলামী। ইকবাল মানুষের পরাজয়ে বিশ্বাস করতেন না। আত্মার পবিত্রতা ও কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে। ইসলাম এমন একটি জীবন নীতি যা খুদীর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে সহজ পথ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইকবাল তাই দিতে চেয়েছেন, ইসলামের জীবনপদ্ধতির সারনির্যাস। আল্লাহ্‌র একত্ব ও সার্বভৌমত্বের ওপরে গঠিত একটি রাষ্ট্র তাঁর লক্ষ্য। আল্লাহ্‌র একত্বের মাঝে মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস করে তার ভয়, সন্দেহ ও দুঃখ দূর হয়ে যায়। তওহীদ থেকে পাওয়া মানবিক স্বাধীনতা, সাম্য ও সংহতিই এই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং মানবিকতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিই এর প্রধান লক্ষ্য। রিসালাত বা নবুয়ত মুসলিমকে একতাবদ্ধ করে। তারপর মানুষ হচ্ছে আল্লাহ্‌র খলীফা; তার কাজ হল প্রকৃতির শক্তিকে বশে এনে মানব সমাজে তওহীদবাদ ও সামাজিক বিচার কায়েম করা। আল্লাহ্‌র ইবাদত বুদ্ধিমত্তা ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষকে একটি চলিষ্ণু সত্তায় পরিণত করে।

তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের জন্য এক সম্মানজনক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাই তিনি মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্যে মুসলিম নেতৃত্বকে করেছিলেন উদ্বুদ্ধ কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমানের মঙ্গল ইকবালের এ-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। ইসলামী জীবনদর্শনের ওপর এক সুখী সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে তিনি দুনিয়ার বুকে ইসলামী আদর্শের বাস্তবরূপের বিকাশের জন্যে ছিলেন সদা উদগ্রীব। নিম্নোধৃত কবিতায় কবির সেই জাগরণ মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে :

১। বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে,
বিদ্যুৎ-বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার
শীর্ষে বাঁধো নীড়;
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধ্বে,
আরো উর্ধ্ব স্তরে,
যেন যোগ্য হতে পারো জিহাদের—
এই জিন্দেগীর;
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হতে পারে যেন
এই প্রাণবহ্নির উপরে।

www.pathagar.com

২। বিশ্বাসহীন কাফের যে দিন
বিশ্বে হয় সে হারা :
মুমিনের মাঝে হারায় নিখিল
জগতের প্রাণধারা।

৩। 'সমুদ্রের মাঝে রাখো জলবুদ্বুদের মত
অধঃমুখ পেয়ালা তোমার;
হও তুমি সম্মানিত মহান মানব আর
হও সম্মানিত খলিফা আল্লার।

আল্লাহ্‌র জন্যে, সত্যের জন্যে, ইনসাফের জন্যে সংগ্রাম বা জিহাদ মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। দেশ জয় যে জিহাদের কাম্য, তা ইসলামে নিষিদ্ধ বা হারাম হয়েছে :

মুমিনের দিল বিজয়ী হয় প্রেমে
যে মুসলিম প্রেমিক নয়,
সে নয় মুসলিম—সে অকৃতজ্ঞ, কাফের।

ইকবাল বলেন, ইসলামই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে। কুরআনের মতে জ্ঞানের তিনটি উৎস আছে : আত্মিক অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি ও ইতিহাস। ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগানো অপরিহার্য :

বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয় জ্ঞান-আহরণ
শিল্পের উদ্দেশ্য নয় তথ্য আমন্ত্রণ,
বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল জীবন গড়িয়া তোলা
নব রূপায়ণে
বিজ্ঞান আনিয়া দেয় দীপ্তিকণা মানুষের মনে।

পশ্চিমী সভ্যতার যা কিছু মঙ্গলজনক তা গ্রহণ করবার জন্যে কবি আহ্বান জানান :

পাশ্চাত্যের শক্তি নিহিত রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে,
তোমার পাগড়ী তো জ্ঞান আহরণের পথে
কোন বাধা নয়।

www.pathagar.com

ইকবালের প্রচারিত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শবাদী, দেশ-কাল, বংশ ও ভৌগোলিক সীমানার অনেক উর্ধ্বে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে নাস্তিক্যবাদ, বর্বরতা, শোষণ ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। তারা জাতি, স্থান ও বংশের পূজা শুরু করেছে। ইকবাল বলেন, তওহীদ ও কা'বাকে কেন্দ্র করে এক সার্বজনীন মানবসমাজ গঠনই ইসলামের লক্ষ্য। স্বদেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস :

১। আমরা দেশের কোনো সীমা চিনি নাই
দুইটি নয়ন হতে একক রশ্মির মতো আমরা সবাই।
হেজাজ, ইরান, চীন সব আমাদের
আমরা তাদের।

২। বসন তোমার হয়নি মলিন
স্বদেশ-ধূলিতে অপরিসর,
তুমি ইউসুফ নয়নে তোমার
কেনান-সমান প্রতি মিসর।

ইকবাল গণতন্ত্রের মূলনীতি সমর্থন করেন, কিন্তু সংখ্যার ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া পছন্দ করেন না।

গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সরকার
যাতে মানুষকে গণনা করা হয়,
হয় না তার মূল্য যাচাই করা।

'এই গণতন্ত্রের আওতায় জুলুমের দৈত্য সাম্যের পরী সেজে নেচে বেড়ায়।'

'আল্লাহ্‌র বাণী না মানলে মানুষের অভিধান কেবল বাষ্প ও বিজলীতেই সীমাবদ্ধ থাকে।'

এই কি সেই পশ্চিমী সভ্যতা
যা পুরুষকে করেছে বেকার,
আর নারীকে সন্তানহীন?

ইকবাল পশ্চিমী সাম্যবাদ ও পশ্চিমী গণতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ কোনটিকেই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে দুটিই নাস্তিক্যবাদী। তবে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের মূলনীতির সঙ্গে ইসলামের বিরোধ নেই। ইকবাল এ কথা বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে কোন রাষ্ট্রের ডিক্টেটর নির্বাচিত করা হলে তিনি

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক নীতির মারফত ইসলামী জীবনদর্শনের রূপায়ণ করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতেন।

উভয়ই (পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদ)
আল্লাহ্‌র থেকে গেছে সরে, মানুষকে দিয়েছে ধোঁকা
মানবতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের যাঁতা তলে
কেউ কেড়ে নেয় শরীর থেকে জীবন
আর কেউ হাত থেকে রুটি।

ইকবাল সব রকমের জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। মোল্লাতন্ত্র ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ আওয়াজ :

১। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও।

২। এ জমি তোমার নয় হে ভূস্বামী, তোমার তো নয়,
নয় পূর্বপুরুষের, তোমার আমার কারো নয়।

৩। কুরআন কি জান? পুঁজিবাদীর এই কুরআন মৃত্যু পরোয়ানা
যার কিছু নেই সেই কৃষক শ্রমিকের এ বন্ধু
সুদ দীলকে কালো করে, টাকা জমালে কোন ফায়দা নেই,
তুমি যা ভালোবাস তার থেকে দান না করলে
কোন সওয়াব পাবে না,
জমি থেকে রুজি সংগ্রহ কর,
কিন্তু এই জমি খোদার।

৪। ঐ দেখ আসে দুর্গত—দীন দুঃখীর রাজ!
পাপের চিহ্ন মুছে দাও, ধরা রাঙিয়ে দাও ॥
করো ঈমানের আগুনে তপ্ত সোনালী খুন।
বাজের সমুখে চটকে ভয় ভাঙিয়ে দাও ॥
ওঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাপন লাগিয়ে দাও ॥

www.pathagar.com

কিষাণ মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল।
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও ॥

ইকবাল এসেছেন মুসলিম জীবনে নব-জীবনের দিশারীরূপে। তিনি গেয়েছেন নবযুগের নয়া তারানা। ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত, বিমূঢ় ও হতাশাপূর্ণ মুসলিম জনগণকে তিনি দিয়েছেন আশার আলো, পথের মশাল। আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে মুসলমান মাঁথা নোয়াবে না। অতীত যেমন অবহেলার বস্তু নয়, তেমনি চলিষ্ণু সমাজকেও স্বীকার করতে হবে। এ-জন্যে প্রয়োজন 'ইজতিহাদের'। 'ইজতিহাদের' মারফত সমাজ জীবনে ইসলামী নীতির রূপায়ণ করতে হবে, পরিবেশ ও প্রয়োজনের ওপর খেয়াল রেখে। আধুনিক মানবসমাজ গঠনের পক্ষে তিনটি জিনিস অপরিহার্য : বিশ্বনিখিলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মারফত মানবসমাজের সুষ্ঠু বিবর্তন। মুসলিম কখনও পরাজয় জানে না, পরাজয় মানে না, অনন্ত তার জগৎ, তার দৃষ্টি নতুন নতুন দিগদর্শন; তার সামনে রয়েছে মুক্ত :

১। এই আকাশ আর এই নক্ষত্র পুরানো হয়ে গেছে।
আমি এক নতুন পৃথিবী দেখতে চাই।

২। হে মুসলিম, 'সাহস, সত্য ও ইনসাফের বাণী
গ্রহণ কর; তবে তুমি আবার দুনিয়াকে পথ দেখাবে'।

৩। হে খোদা, তুমি মুসলমানকে ঘুমহীন চক্ষু
ও শ্রান্তিহীন হৃদয় দান কর।

www.pathagar.com

১১.

ইকবাল-সাহিত্যে সমাজদৃষ্টি

ঊনবিংশ শতাব্দীর যবনিকা নেমে আসছে আর ঘনিয়ে আসছে মুসলিম জীবনের ঘনঘটা। এমনি দিনে মুসাফিরের যাত্রা শুরু হল এক দুর্গম পথে। অতীতে গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতে সঞ্চয় করা সে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আজ কোথায় হারিয়ে গেছে; বাহুতে সে বলবীর্য আর নেই, নীল আসমানের তারারা কোন অতলে ডুবে গেছে। মুসলিম মুসাফির পেছন পানে চেয়ে দেখল অতীতের গর্ভে। আগামী দিনের জীবনের ইতিহাস বুঝি পাওয়া যাবে সেখানে। অনাগত ভবিষ্যের সোনালী জীবনের দিকে সে এগিয়ে যেতে চায়—তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, কঠোর তার সাধনা, তার লক্ষ্য স্থির ; জীবনকে সে একান্ত করে পেতে চায়, মৃত্যুকে তাই সে দোসর করেছে; জীবনকে বাঁচাতে সে আত্মাহুতি দিতে চায়, আত্মোপলব্ধির মাঝে সে আত্মার নির্বাণ খুঁজে ফেরে।

পথিক পথ চলছিল আনমনে। তবু শুধু পথ চললে তো আর জীবন হয় না, নিছক অস্তিত্ব আর মৃত্যুময় গতি, কোন পথে কে জানে? তাই সে পেতে চাইল এক জীবনবাণী, আর গাইল জীবনের জয়গান; নিখিল বিশ্বের এক মহান শক্তিকে কেন্দ্র করে সে তার আত্মাকে জাগ্রত, বিকশিত ও চিরগতিময় করবে, যৌবনের মহিমা ষোলকলায় গিয়ে পৌঁছবে এক সাধনা স্নিগ্ধ পুর্ণিমায়।

এই কর্মবীরের জয়গাঁথা গেয়েছেন দার্শনিক মহাকবি ইকবাল। সাধনামুখর এক জীবনদর্শন ইকবাল কাব্যকথার মূল নিরিখ। যৌবনে তাঁর পরিবেশ ছিল সূফীবাদ বা মুসলিম মরমীবাদে সিক্ত ও সম্পৃক্ত। মওলানা মীর হাসান স্বীয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা ইকবালের হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক টমাস আনল্ডের সাহচর্যে, ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে উচ্চশিক্ষার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ইকবালের একটা সুষ্ঠু ধারণা জন্মে। এমনি করেই ইকবালের মনে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

ঘটল এবং তাঁর কাব্যে প্রাচী ও প্রতীচির হল এক অপূর্ব সম্মিলন। ইকবালের কাব্য-প্রতিভা ও অনু পরম রসাবেশ সহজেই রস-পিপাসুদের আকৃষ্ট করল, আর জড়তা, ক্লীবতা ও দুর্গতির গহ্বরে নিপতিত মাঠ-ঘাটের পথ-প্রান্তরের মানুষ খুঁজে পেল অভূতপূর্ব শিহরণ ও কর্মচাঞ্চল্য। সূফী কবি মওলানা রুমী ছিলেন ইকবালের কাব্য-পথের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা। তিনি বলেছেন :

রুমীর ইঙ্গিতে মোর মাটি হ'ল সোনার সমান
এক বিন্দু ভস্ম পেলো লেলিহান শিখার সম্মান।

অনুবাদ : ফররুখ আহমদ

ইকবাল সাহিত্যের ভাবের প্রাচুর্য, রচনাশৈলীর স্বচ্ছতা ও ভাষার সজীবতায় সত্যিই অনবদ্য। মুসলিমের অধঃপতন আর বিশ্বজোড়া হিংসাত্মক সংগ্রাম ও হানাহানি ইকবালের হৃদয়ে সঞ্চার করেছে গভীর বেদনাবোধ; তাঁর সংবেদনশীল মনের আকুতি ভাষার মূর্ছনায় ঝংকৃত ও সাবলীল ভঙ্গিমায় রূপায়িত হয়েছে। মুসলিম মরমীবাদে ভিড় করেছিল আত্মবিস্মৃতি ও আত্মরতি। ইকবালে এই নিশ্চিন্ত প্রশান্তি নেই; সেখানে আছে 'খুদী' বা অহমের দৃঢ় পদক্ষেপ আর বিপুল আত্মশক্তির সম্ভার, যার মধ্যে তিনি নিখিল বিশ্বের বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বুদ্ধিহীন প্রেম মৃত্যুর শামিল আর প্রেমহীন চিন্তা পথশ্রান্ত, নির্জীব । প্রেম ও বুদ্ধির সমীকরণে তিনি এক আলোকদীপ্ত পথের সন্ধান পেয়েছেন। নির্জীব প্রাণ মুসলিম জীবনে ইকবাল জাগরণের মশাল জ্বেলেছেন । সাধনাদীপ্ত মানুষের আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। ইকবাল মুসলিম রেনেসাঁর কবি, অতীতের প্রাণ-নির্যাস গ্রহণ করে তিনি বর্তমানকে ঢেলে সাজাতে চান; তাই তিনি অনাগত যুগেরও কবি। ইকবাল শুধু মুসলমানের কবি নন, মানবতার কবি, নিপীড়িত মানুষের কবি। তিনি বলেন : তুমি যদি সত্যিকারভাবে মুসলিম হতে চাও, তবে ইসলামের তওহীদবাদকে সব মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, আর মানবতাই তওহীদবাদের সারকথা। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ এসে প্রাচ্যের ঘাটে এক অভূতপূর্ব দোলা দিয়ে গেল। বিদগ্ধমনা, উদার-হৃদয়, বিশ্বপ্রেমিক ইকবাল অনুভব করলেন সে প্রভাব । স্বকীয় আত্মশক্তিকে অটুট রেখে তিনি সমন্বয় করতে প্রয়াস পেলেন এ দু'টি ধারাকে।

ইকবাল-দর্শনের একটা বড় কথা হল 'খুদী' বা অহম্। এ খুদীকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির বিকাশের রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। খুদীর উপলব্ধি যেখানে নেই, সেখানে বিকাশের অপমৃত্যু আর চলিষ্ণু বিবর্তন ছাড়া খুদী অস্তিত্বহীন মানুষের

www.pathagar.com

আত্ম-রহস্যের ও আত্মবিকাশের মূল বাণী আসরার-ই-খুদীর' ছত্রে ছত্রে ঝংকৃত হয়েছে। আত্মাকে জান, আত্মার সম্ভাবনা প্রসারিত কর, এ-ভাবে তুমি যেন হতে পার বিশ্বনিয়ন্তার দক্ষিণ হস্ত। তিনি তো তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, আল্লাহ্‌রও আছে তেমনি ব্যক্তিত্ব। বিকাশ ছাড়া জীবন নেই, তোমার পরিণতিই তোমার জীবন। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতাই মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। ইকবালে দেখি খুদী-মহিমার জয় জয়কার :

দৃষ্টি যখন ফিরায়েছি আমি মোর আত্মার পাথরে,
দেখেছি তখন আছে সুগোপন সিন্ধু আমারি মাঝারে।
আত্মবিকাশে দীপ্ত হয়েছে বর্তমানের দিন,
আগামী উষার দিগ্‌ বলয়ের ছবি হল রঙ্গীন।

অনুবাদ : ফর্‌রুখ আহমদ

সমাজ ছাড়া ব্যক্তির চিহ্ন নেই; সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিকে সুসংহত করে তোলে। সমাজ-জীবন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। বুদ্ধির আবেগ ও ঔজ্জ্বল্য প্রশংসা, কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তা যথাযথ নয়। প্রেম ও নীতির যাদুস্পর্শ ছাড়া বুদ্ধি নিরর্থক। ঈমান, চিন্তা ও আবিষ্কার সুন্দর জীবনের তিনটি নক্ষত্র।

নয়া জমানার অভ্যুত্থানে ইকবাল সাধারণ মানুষের নব-জাগরণ প্রত্যাশা করেন। মানবতাই মানুষের বড় পরিচয় :

মাটি আর পানি থেকে তোমার সৃষ্টি.
তবু তুমি বল আমি আফগান তুর্কী,
আমি মানুষ—আমার আর কোন পরিচয় নেই
তারপর যা খুশী : হিন্দী বা তুরানী।

মানবতার মূর্তপ্রকাশ ইসলামী সমাজ-দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তিনি এক বাস্তব সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন : মুসলমানেরা যদি সত্যিই মুসলমান হন, তবে আর ভয় কিসের? এ স্বপ্ন ব্যর্থ হবার নয়। নয়া সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইনসাফ ও জিহাদের তাগিদে তিনি বজ্রকণ্ঠে শপথ নিতে বলেন। আল্লাহ্‌র একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও মানব-ভ্রাতৃত্ব— এ হল ইসলামী সমাজের মূলকথা। সত্যের পথে, মানবতার পথে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বা সংগ্রাম করা মানুষের মহান কর্তব্য। বাহ্যিক আবরণের স্থানে তিনি পেতে চেয়েছেন সহানুভূতি, প্রেম, প্রীতি আর গেয়েছেন প্রেমের

www.pathagar.com

জয়গান। তাই তিনি প্রেম ও বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে মৌলিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ চেয়েছেন :

এই সব আকাশ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে
আমি নব উষার এক নয়া জমানার প্রতীক্ষা করছি।
মুসলিমের দুনিয়া সীমাহীন—
অনন্ত দিগন্তের পানে তার যাত্রা।
ফোরাত দানিউব বা নীল
তার দরিয়ার একটি তরঙ্গ মাত্র।

রসূলের জীবনে তোমার চলার পথের দিগ্‌দর্শন গ্রহণ কর—তাঁর জীবন জাতির আত্মা, মুসলিম জাহানের ঐক্যবোধ সেখানে নিহিত :

সত্যাশ্রয়ী মুসলিম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়
রসূলের গৌরবের বিচ্ছুরিত রশ্মিগুলো নিয়ে,
অনেক সিনাই গড়া হয়েছিল
তাঁর পথের ধূলি নিয়ে।

মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। প্রকৃতির শক্তিকে সে অসীম জ্ঞানশক্তি বলে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনবে। সৃষ্টি ও মানবতার উৎকর্ষ এই মানুষ খলীফা : সে আল্লাহ্‌র শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীর বুকে।

কবি কর্মময়, প্রার্থনা-মধুর জীবন কামনা করেন। প্রার্থনা হৃদয়ের কালিমা দূর করে আর মানুষ কাজের মাঝে ডুবে যাবার অপরিসীম প্রেরণা লাভ করে। ইবাদত সময় ও কালের সংকীর্ণতা ভেঙে দেয়, বিশ্বশক্তির সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন তার ও আমাদের মনকে উদার ও বিস্তৃত করে দেয়। বিশ্বনিখিলের শান্তি নির্যাসে অবগাহন করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা এই পথেই সম্ভব। বুদ্ধির জ্ঞান অপরিহার্য, কিন্তু বুদ্ধি মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান তাই চালিত হবে বোধলব্ধ জ্ঞান দ্বারা । সুখী সুন্দর নয়া দুনিয়া তৈরির কাজে আধ্যাত্মিকতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইকবাল সর্বপ্রকারের জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। বিশ্ব-নিখিলে আল্লাহ্‌র রাজত্ব—যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সবই তাঁর। সুষ্ঠু জীবিকার্জন মানুষের জন্মগত অধিকার। ইকবাল বলেন :

কুরআনের চোখে শ্রমিক মালিকের একই আসন
কুরআন পুঁজিবাদের মৃত্যু ঘোষনা করে

www.pathagar.com

এর নীতি শ্রমিক মজুরের সহচর,
জাকাতের এই তো আসল চেহারা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের চোখ ঝলসানো রূপ তাঁর ঘৃণার উদ্রেক করে। ভেতরের অন্তর্নিহিত সারবস্তুকে তিনি অনুশীলন করতে বলেন। মোল্লাতন্ত্র, তোষামোদ ও সস্তা প্রগতিকে তিনি দারুণ কষাঘাতে জর্জরিত করেন—বে-ঈমানী জুলুমই এ-সবের মধ্যে উকি দিয়ে ফিরছে। যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

শাহীন বাজ পাখির মত হও, নীলিমার উর্ধ্বে উঠে :
আমিরী নয় দিল্-ফকিরীর পথ যে তোমার
আত্মারে দিও না বেচে। নাই যদি থাক রূপের বাহার।

দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানের কাছে ইকবালের জীবন ও সাহিত্যের মহান তাৎপর্য হল : তিনি আধুনিক যুগে ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপায়ণের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক ও মহাকবি।

ভৌগোলিক সীমারেখা বা বর্ণভাষার আওতায় ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়, তওহীদবাদ ও রিসালতের উপরেই ইসলামী সমাজের ভিত্তি। দেশপূজা ইউরোপে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা যুদ্ধ, নিপীড়ন, আগ্রাসন আর নারকীয়তারই জন্ম দিতে পারে। সারা বিশ্ব-ই আমার স্বদেশ। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের আওতায় সাম্য-সংহতি ও স্বাধীনতা চাই সমগ্র মানব-জাতির জন্যে। এই বাণীই কুরআনি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তি হৃদয়ের সিংহাসনে সু প্রতিষ্ঠিত :

সমুদ্র মৎসের মত মুক্ত জীবন যাপন কর।
তবেই স্থানের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হবে।
রাজা-বাদশার ভয় থেকে মনকে মুক্ত কর
এক উপাস্য আল্লাহ্‌ই তোমার জীবনের মূলধন
রসূল হিজরত করে বুঝিয়ে দিলেন
নীতিজ্ঞান মাটির চেয়ে অনেক খাঁটি।

ইকবালের সাহিত্য ইসলামী জীবন-দর্শনের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। তাঁর কবিতার ছন্দে ছন্দে ও Reconstruction of Religious Thought in Islam-এর পাতায় পাতায় ইসলামের জীবনবোধ কখনও মধুর ছন্দে লীলায়িত কখনও বা বুদ্ধির প্রখরতায় প্রোজ্জ্বল হয়েছে। ইংরাজিতে তিনি গদ্যকবিতায় হযরত রসূলে করীমের

www.pathagar.com

(সা.) জীবনী লিখতে চেয়েছিলেন, সেই বইয়ের নাম দিয়েছেন The Book of a Forgotten Prophet, কিন্তু মৃত্যু এসে সে কাজে বাধ সাধল।

ইকবালের দর্শনে আধ্যাত্মিক জীবন সত্যযুগের প্রতীক এবং বস্তুবাদী জড়বাদ ও ভোগবাদ তামসিক যুগের অভিব্যক্তি। বস্তুকে তিনি অবহেলা করেন না; কিন্তু বস্তুকে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণও মনে করেন না। বস্তু হল আধ্যাত্মিকতার মাল মশলা। তাই বাস্তবতা অবহেলার বস্তু নয়, আধ্যাত্মিক নীতির মারফত সামাজিক পরিবর্তনের ও বিবর্তনের বেলাভূমি। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের বৈষয়িক সাম্য ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কাগজী-গণতন্ত্র উভয়ই তাঁর সমালোচনার কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। হতাশাদীর্ণ মানুষের আজ পেতে হবে নিখিল বিশ্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ব্যক্তির আধ্যত্মিক মুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার উন্মোষ বাস্তব সমাজ গঠন :

সাম্রাজ্যবাদের দানব গণতন্ত্রের মুখোশ পরে নৃত্য করে।
আর তুমি ভাব যে স্বাধীনতার পরীরা সব নাচছে।

সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্বোধন করে ইকবাল বলেন :

তুমি রাজতন্ত্রের অস্থিমজ্জা ধ্বংস করেছ
সব প্রভুকে বিনাশ করেছ
'লা ইলাহা' থেকে 'ইল্লাল্লাহ্'র দিকে
একবার ফিরে এস দেখি।
আল্-কুরআনের নীতি ছাড়া সিংহের উদার মন মেশে
শৃগালের ধূর্ততায়
আল্লাহ্র প্রেম ছাড়া বুদ্ধিমত্তা অসম্পূর্ণ।

শিল্প-বিজ্ঞান সম্পর্কে ইকবালের ধ্যান-ধারণা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কবি বলেন : নীতিবোধ ও সুষ্ঠু জীবনবোধ ছাড়া শিল্প-বিজ্ঞান সব ব্যর্থ। সত্যের মূর্ত প্রতিচ্ছবি হল শিল্প-বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনবোধের মূল্য কম নয়। ইসলামের ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষর। আল্ কুরআনই জন্ম দিয়েছে সেই পরীক্ষামূলক গবেষণার কথা যা ইতিহাস, প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতাকে করেছে মন্থন। আধুনিক ইসলামী সমাজ তাই বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও বাস্তব পরিবেশকে মানবিক করে তুলবে।

গিরিকন্দর মরুপ্রান্তর
মানুষের দিব্য দৃষ্টির দিশারী

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে
তোমার অযুত সম্ভাবনার বিস্তৃতি,
সূর্যের রশ্মি ও বন্যার শক্তি
তোমারই জন্যে
বস্তু মনের জগত জয় করো তুমি।

ইকবালের শিল্প অহিফেন সেবকের শিল্প নয়। শিল্পের কাজ হল সত্যের আলেখ্য রূপায়িত করা। সুন্দরের অভিসারে জীবনকে সুন্দর, রূপময় ও গতিময় করা। কবির মতে মানুষের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত তন্ত্রীকে নাড়া দেওয়া শিল্পের মহান উদ্দেশ্য—যা কিছু অসুন্দর, অপবিত্র ও কালিমাময় তার বিরুদ্ধে শিল্পীর ফরিয়াদ শেষ হবার নয় ; প্রকৃত শিল্প জীবনের সমস্যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় :

শিল্প যদি পরিপূর্ণ জীবনের দিশারী ও মানুষের চলার পথের দীপবর্তিকা না হয়, তবে শিল্পকলা অর্থহীন। আর শিল্পের বিকাশ ব্যক্তিস্বাধীনতা ছাড়া অসম্ভব। শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নিজস্ব খুদী ও মূল্যবোধ রূপায়িত হয়। সামাজিক খুদীর মাঝে ও মানুষের তমদ্দুনে তা এক নতুন সমাজ-চেতনা এনে দেয়। শক্তি জীবনবোধের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধন, আর শিল্পেরও। ইকবাল বলেন, আলহামরার কক্ষে কক্ষে আমি যেন আল্লাহু-আকবরের খোদাই করা তসবীর দেখতে পেলাম। কালের বক্ষে এ-তসবীর শাস্বতের মহিমায় ভাস্বর, উজ্জ্বল। শক্তি, গতি ও মুক্তি—ইকবালের মতে শিল্পের তিনটি বিশেষ গুণ।

সংকীর্ণ গোষ্ঠিবাদের বিরুদ্ধে ইকবাল বজ্রকঠোর আওয়াজ তুলেছেন। ইসলাম দেশ-ভাষা-বর্ণ-গোষ্ঠির উপরে নীতিবোধ ও আদর্শকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আজকের মুসলমানের মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠিগত ও ভাষাগত বিদ্বেষ কবির মনকে ব্যথিত করেছে। তাই তিনি বললেন যে, মুসলিম জীবনে আরবি সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের ফলে যে সংকীর্ণ গোষ্ঠিবাদ দানা বেঁধে উঠেছে তাকে ধ্বংস করতে না পারলে মুসলমান তথা ইসলামী সমাজের মুক্তি সুদূর পরাহত। আধুনিক জাতীয়তাবাদ এই গোষ্ঠিবাদকে ইন্ধন জোগাতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

ইকবাল ইসলামের এই ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলিম চিন্তাধারায় যে নবযুগের সূচনা করেছেন, সে জন্যে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অফুরন্ত। সে ঋণ অসীম, তাঁর অবদান চিরন্তন।

www.pathagar.com

১২.

ইকবাল ও মুসলিম চিন্তাধারার কয়েকটি কথা

সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সমারসেট মম একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন। সাহিত্য ও কবি সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধা করা মানুষের পক্ষে অনেকটা সংস্কারজাত, ফ্যাসানের জিনিস। তাই শিল্পকর্মে সত্যিকার আগ্রহ ও অভিনিবেশ না রেখেই আমরা তার প্রশস্তি গাইতে শুরু করি। কবি-দার্শনিক যত বড় হবেন, অবুঝ প্রণতি ও তোষামুদির বহরটাও সেই পরিমাণে দুঃসহ স্তরে গিয়ে ঠেকবে। তাই আত্মপরিচয় লাভ করতে পারলেই বোধহয় এ বিশ্রী 'গলাধঃকরণ অবস্থা' থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। শেক্সপীয়ারের উল্লেখে 'মম' যা বলেছিলেন, তা ইকবালের বেলায় সমানভাবেই প্রয়োগ করা চলে। এ জন্যেই আমাদের দেশে ইকবালকে চেনাজানার আসরটা খুব বেশি সহজলভ্য করে তোলা প্রয়োজন। কারণ মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ভিত্তিমূলের গভীর প্রদেশের খবর ইকবালের লেখার যেমনটি মেলে ঠিক তেমন পুরোনো লেখকদের মধ্যে অন্য কোনও জায়গায় খুঁজতে যাওয়া নিছক ঘোরা-ফেরা বই আর কিছুই নয়।

জীবন গতিময়, গীতিময়। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় জীবন-গীতিকা গতিময়তার মাঝেই হারিয়ে গেছে। গতিশীল জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়েছে ও এক একটি চিন্তাধারা বিশেষ থেকে সামান্যের পর্যায়ে পৌঁছে এতখানি সর্বজনীকৃত (Generalized) হয়ে গেছে যে, এই গোঁড়ামির মাঝে মানুষের মানবিক সত্তা ও গীতিময় জীবন ছিন্ন, অবহেলিত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। সত্য, সুন্দর বলতে কিছু নেই—এ কথাই তখন মানুষের মনে দাগ কেটেছে বারে বারে।

মুসলিম সভ্যতায় গীতিময়তা যতখানি আছে, গতিময়তা সে পরিমাণে নিতান্ত সামান্যই লক্ষ্য করা গেছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মৌলিক নীতির বিবর্তন হঠাৎ করে থেমে স্তম্ভিত হয়ে যেতে বসেছিল। অতীতের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা ও অনুশীলনকে আমরা মৌলিক বা নির্বিশেষের পর্যায়ে ফেলে দিয়েছি। ফলে বিবর্তিত

www.pathagar.com

সমাজের সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারিনি। জীবনের গতিময়তা অস্বীকার করার ফলে জীবন থেকে সৌন্দর্যানুভূতি বিনষ্ট ও অপসৃত হতে বসেছে, পরিশেষে গীতিময়তাও বিলুপ্ত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ইকবাল মুসলিম মানসকে গতিশীল ও চলিষ্ণু করবার জন্যে সাধনা করে গেছেন। যাতে করে জীবনে আবার নতুন করে পথ চলা শুরু হতে পারে, জীবন আবার গীতময় হয়ে বৈচিত্র্যসুলভ জীবনধারার সৃষ্টি করতে পারে। সভ্যতার বিভিন্ন নিরিখ ইকবাল প্রত্যক্ষ করলেন—একদিকে রইল প্রতীচ্যের অস্থির প্রলাপ ও নিষ্করুণ গতিশীলতার মরণ-কান্না; সৃজন-প্রক্রিয়ার মাঝেও ধ্বংসলীলার মহাতাণ্ডব; অন্যদিকে জীবনকে অস্বীকার করে তথাকথিত পুণ্যময় জীবনের স্থবিরতা। এত নিছক আত্মকেন্দ্রিক স্থৈর্য, জীবনময় শান্তশালীন ব্যক্তিত্ব নয়। ইকবাল এ-জীবনে এনে দিতে চাইলেন পথ চলার বাণী। বাস্তব জীবনকে অস্বীকার করে নাজাত লাভ করা দুর্লভ। সূফী মরমীবাদের এ-মহাসত্য তিনিই এ যুগে মানুষের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন। কিভাবে ইসলাম গ্রীক সভ্যতার ভাবকেন্দ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে ও সে-সংগ্রামে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে তা দেখিয়ে দিয়ে ইকবাল Robert Briftanlt প্রমুখ দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একমত পোষণ করলেন। ইসলাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান উদ্‌গাতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে মুঘল আমল অবধি ইসলামের অপব্যাখ্যা ও আগাছাগুলো দূরে সরিয়ে দিয়ে ইকবাল ইসলামের ও তওহীদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরার বিরামহীন চেষ্টা করেছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবিক সত্তাকে ফরাসী বিপ্লবের হাজার বছর আগেই ইসলাম স্বীকৃতি জানিয়েছিল; ফরাসী ঐতিহাসিক লে বোঁ (Le Bon) বলেছেন : ক্রুসেডের মাধ্যমে এবং সিসিলি, ইতালি ও স্পেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে ইসলামের আইনভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা প্রবেশ করে এবং রুশো ও অন্যান্য দার্শনিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইকবালের দৃষ্টিতে, ইসলামের মৌলিক আদর্শে বাকবিতণ্ডার অবকাশ নেই—বিরোধ যা আছে তা ঐ বিশেষ বা Particular ব্যাপারে। তাই অজ্ঞানতা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি বর্জন করতে পারলে, ইসলামের মূল আদর্শ তুলে ধরা মোটেই কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। ইসলামী সংস্কৃতির কথায় যারা সন্ত্রস্ত ছিলেন, তাঁদেরকে ইকবাল স্পষ্টভাবে তাদের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানগণ যখন সব কালে ও সব দেশে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারেন নি, তখন তথাকথিত মুসলিম সংস্কৃতিকে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা চলে না। আদর্শ হিসেবে ইসলামকেই তুলে ধরতে হবে ও ইসলামী সংস্কৃতির আলোকেই সংস্কৃতির বিচারে হাত দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও স্থবিরতাও পরিহার না করলেই নয়।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল অভিযানের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অ-মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ইসলামী আইনের বিবর্তনে অ-মুসলিমের ক্ষমতা থাকতে পারে না, অতীতের মুসলমানদের ব্যাখ্যা আজও সমানভাবে মৌলিকরূপে কার্যকরী—এ সব ধারণার ফলে 'ইজতিহাদের' দরজা বন্ধ হয়ে গেছে— এ বিশ্বাস অনেকের মানসে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

রেনেসাঁর দিশারীরূপে আবশ্যকতায় ইকবাল ইজতিহাদের নতুন প্রেরণা যোগালেন। আইনসভাকে এ ক্ষমতা দেবার জন্যে ইকবাল সুপারিশ করেছেন। উলামাদের হাতে এ ক্ষমতা থাকবে, না প্রতিনিধিদের হাতে থাকবে—এ এক জ্বলন্ত প্রশ্ন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিদের এ ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার ব্যাপারে আর দেরী করা চলে না।

এ দুনিয়া পাপ-কালিমাময় বলে গণ্য হতে পারে না। প্রাকৃতিক শক্তি ও বাসনার অপব্যবহারই অসুন্দর ও অমঙ্গলময়। জ্ঞান, আত্মসংযম ও আত্ম-শুদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত ফকিরী বিদ্যামান।'ফাক্‌র' ও সন্ন্যাসবাদ পরস্পর ভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। 'পৃথিবীকে জয় করে লাভ, কিন্তু এর কালিমা যেন তোমাকে স্পর্শ না করে। পলায়নী মনোবৃত্তি বর্জন কর।

সংকীর্ণ গোষ্ঠিবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইকবালের ক্ষমাহীন ফরিয়াদ আর বজ্রকঠিন জিহাদ। আধুনিক দুনিয়ার অনেক জাতির (দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি) সঙ্গে তুলনায়, সংকীর্ণ গোষ্ঠিবাদ মুসলমানদের মধ্যে নেই। মসজিদে-ময়দানে এ কথা জ্বলন্ত সত্য হয়ে ওঠে। তাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টোয়েনবি একে তাঁর `Islam and the West'-এ আধুনিক ইতিহাসে ইসলামের মহা অবদান বলে আখ্যাত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, মুসলমানদের মধ্যে সংকীর্ণ racialism কি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছে? আশরাফ-আতরাফের সামাজিক ভিত্তি যা'ই হোক, এহেন বিভেদ ব্যবধানের অমানবিক দিকটা কি আমরা ধুয়ে মুছে ফেলতে পেরেছি? আমাদের মধ্যে বর্ণবিভেদ আছে এ যেমন বাড়িয়ে বলা হয়, তেমনি অগণতান্ত্রিক ব্যবধানকে চুপিসারে ঢেকেঢুকে রাখা ইসলামী আদর্শের দিক থেকে সত্যিই এক ঘৃণ্য ও মারাত্মক পরিস্থিতি।

ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্ব সম্পর্কে গান্ধীজি যে কটাক্ষ্য করেছিলেন তা মুসলিম গণমানসের নির্ভুল ব্যাখ্যা নয়—কিন্তু এর মধ্যে যে পরবর্তী যুগের মুসলিম সমাজের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও সমালোচনা লুকিয়ে আছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আরবি হরফে না লিখলেই ইসলাম হয় না—এ ধরনের সংকীর্ণতাও ইসলামের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতিতে ও মুসলিম মানসে আরবি ভাষার গুরুত্ব কোনদিনই হ্রাস পাবে না।

www.pathagar.com

এক-একটা জাতির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ইকবাল স্বীকার করেন আর সে বৈশিষ্ট্যের ওপর রাষ্ট্র গঠনের অধিকারও বাদ পড়ে না। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নামে স্থানিক, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণতা তিনি মেনে নিতে পারেন নি। স্বদেশিকতা স্বভাবগত জিনিস। কিন্তু স্বদেশপ্রেম যখন মানবতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসাকে বিনষ্ট করে দেয় তখন তা বিপথে ধাবিত হয়। তাই আধুনিক জাতীয়তবাদ ও জাতিভিত্তিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন। সমাজ গঠনের জন্যে জাতিগত, স্থানগত অবস্থা মেনে নেওয়া চলে আর তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু গোষ্ঠি বা স্থান, রাজনীতি বা সমাজনীতির নৈতিক ভিত্তি রচনা করতে পারে না। কারণ তাতে করে জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনের ও বহির্বিশ্বে নৈরাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। Nehru Report-এর নজির দেখিয়ে ইকবাল বলেছিলেন : Communalism in its higher aspect is Culture. তাওহীদ বা সার্বজনীন আল্লাহ্‌ভিত্তিক মানবতাবাদই সমাজের ভিত্তি রচনা করবার ভরসা রাখে।

ইকবাল আরও বলেছেন—সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দূর করতে না পারলে সত্যিকার ইসলাম আমাদের জীবনে ফলপ্রসূ হতে পারবে না ও ইসলামী সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতে ইসলামকে অনেক সময় 'মুসলিম' সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়। কিন্তু এই দেশগুলোতে ইসলামের প্রভাব বিপ্লবমুখী হলেও, মুজাদ্দিদে আলফ-ই-সানীর (রহ.) পূর্বে এ উপমহাদেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থা গঠনের কথা কেউ ভাবেন নি। বিজয়ী মুসলিমের আগমন কোনও ধর্মীয় বা আদর্শগত আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল না। তাই 'মুসলিম' রাষ্ট্র গঠিত হলেও ইসলামী রাষ্ট্র সেদিন সুসংগঠিত হতে পারে নি। তাই এ-কথা বললে খুব বেশি বলা হবে না যে, ফকির-দরবেশদের সঙ্গে ইসলামের শুভাগমন যদি একান্তভাবে জড়িত থাকত, তবে বাংলা-পাক-ভারতের ইসলামী ইতিহাস হয়ত বা আরও বেশি গৌরবোজ্জ্বল হতে পারত।

ইকবাল এমনি করেই সার্বজনীন ইসলামী আদর্শকেই বড় করে মুসলমানের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, সত্যিকার গণতন্ত্র শুধু কাগজে-কলমে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ একমাত্র ধর্মই মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও অনুভূতসত্তা একীভূত করে আনতে পারে। এ কথাকে আরও সম্প্রসারণ করে বলা চলে যে, ইসলামের মতে কোন একটি দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মে মৌলিক সার্বজনীন নীতি বই আর কিছুই সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করতে পারে না।

কারণ সংখ্যাগুরু কর্তৃক স্বীয় আদর্শের বৃহত্তর দিগদর্শনের প্রসারণ ও প্রতিপালনের মধ্যে অনায়াসেই সমগ্র সমাজে প্রকৃত ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ-দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইকবাল-দর্শন

www.pathagar.com

তথা ইসলামী জীবনাদর্শের অনুশীলন শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, আজকের দিনে মানবসমাজের জন্যেও অপরিহার্য। জীবনকে স্বীকার করে আগামীর পানে এগিয়ে যেতে হবে ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ-জন্যে চাই দূরদৃষ্টি ও শক্তিমত্তা। আর দূরদৃষ্টি ধর্ম ও প্রেম বা ইশ্‌ক থেকেই পয়দা হয়।

মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিন্তার নৈরাজ্য বিরাজ করছে ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যেও ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কেউ কেউ খলীফাকে হাতের ক্রীড়নক করে খুশী হয়েছেন। কেউবা খিলাফতের ধর্মীয় ভিত্তিই অস্বীকার করেছেন। আবার কোন কোন লেখক আল্লাহ্‌র আইনের সার্বভৌমত্বের কথা চিন্তা না করেই খলীফাকে খৃস্টান পোপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জোয়াকিম ওয়াক (Joachim Wach) তাঁর 'ধর্মীয় সমাজতত্ত্বে' (Sociology of Religion, Chicago, 1949 : 306) বাদশাহকে আল্লাহ্‌র খলীফা ও কাযীদেরকে রসূলের খলীফা বলেছেন। কিন্তু আসলে খলীফাগণকে রসূলের খলীফা বলেই গণ্য করা উচিত। আর মানবিক খলীফার কথা কেউ বড় একটা বলতেই চান নি। এ পরিস্থিতিতে ইকবালের খিলাফতের নীতি আশার বাণী বহন করে এনেছে। জীবনের সমগ্র অখণ্ড সত্তার ওপর জোর দিয়েই তিনি নৈতিক, বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুগভীর মৌলবৃত্তির বাস্তব জীবন্ত ও স্বাভাবিক কার্যক্রম উদ্ভাসিত করেছেন। যা অতীতের ঐতিহ্যকে বর্জন করে ভবিষ্যতের আশা-ভরসার বাহক হতে পেরেছে। মুসলিম ইতিহাস ও ইসলামী জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দর্শন পরিবেশিত হবার ফলে পাশ্চাত্যের সব চিন্তানায়কেরা তাঁর দর্শনের মূল সুরটি সব সময় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাঁর কবিতা বিশ্ব-মানবিকরূপে প্রোজ্জ্বল—কিন্তু দর্শনের প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তিনি নিজের সমাজ ও জাতিকেই বেছে নিয়েছেন। ইংরাজী প্রবাদ `Only the stars are neutral'-এর সভ্যতা নিতান্ত সীমায়িত। নইলে শনিচক্র আর গ্রহের ফের কথাগুলো অবাস্তব হয়ে যেত। উদারতার ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য হওয়া চলে, কিন্তু ভালমন্দ সত্যাসত্য ও সুন্দর-অসুন্দরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে কোনও ফাঁকির কারবার নেই। তাই সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনের কথা ইকবাল ভুলতে পারেন নি। দর্শন নিয়ে নিছক কল্পনারাজ্যে সফর করেও তিনি শান্তি খুঁজে পান নি। কারণ মনে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছেন :

খোদার প্রেমিকরা বনে বনে ফিরছেন
যিনি খোদার বান্দাদের ভালবাসেন
আমি তাঁর দাস হতে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

ইকবাল ছিলেন মহাকবি-কাব্যোদ্যানে তাঁর আনাগোনা রসপিপাসু মনে তৃপ্তির খোরাক জুগিয়েছে। কবিমনের ওপর দিয়ে প্রতিভাদীপ্ত কঠোর সাধনার যে পথ বহুদূর গিয়ে ঠেকেছে, তা ইকবালের দার্শনিক নিয়ামক। সূক্ষ্ম দর্শনের নিগূঢ় আলোচনায় নিজেকে মগ্ন না রেখে, তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান তিনি মুসলিম সমাজের সংস্কারে প্রয়োগ করলেন। ইসলামকে সম্যকভাবে বুঝতে না পারলে ও তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারলে আধুনিক দুনিয়ার মুসলিমের দুর্দশা ঘুচবে না। এ দৃঢ় প্রত্যয়ই ইকবালকে ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারার পুনর্গঠনের ব্যাপারে গভীর বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিকমূলক চিন্তাধারার দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু মানুষের ক্ষমতাও অনেক। কারণ তার আছে নিজস্বসত্তা ও তার প্রকাশ খুদী। অদৃষ্টবাদে জর্জরিত মুসলমানকে তিনি আশার বাণী শোনালেন :

'নিজের খুদীকে গড়ে তোলার মধ্যেই
আল্লাকে পাওয়ার প্রজ্ঞান লুকায়িত।
যেখানেই আমি সেজদা করি,
সেখানে হাজার ফুল ফুটে ওঠে।
জীবন-নদীতে ঝাঁপ দিয়ে
তরঙ্গের সাথে সংগ্রাম কর।
সংঘর্ষের মাঝেই চিরন্তন জীবনের সম্ভাবনা।
শাহীন তুমি বাঁধবে বাসা পাহাড়-চূড়া খুঁজে।
আসমানকে ডেকে বললে, দেখ আমার আনন্দ;
আমার আরম্ভ তুমি দেখ, দেখ আমার পরিণতি;
গতিই জগতের নিয়ম—
গতিমান যে সে বেঁচে গেল;
থেমেছে কি ধ্বংস হয়েছে।
যদি তুমি জীবন্ত হও
তবে নিজের পৃথিবী
তুমি তৈরি করে নাও।
আত্মসম্ভাবনার ঘোমটা খুলে ফেল
চাঁদ সূর্য তারাদের ধরে আনো
কারো উন্নত সত্তা এমন
যেন তক্‌দীর লেখার আগে
শুধায় আল্লাহ্ বান্দাকে
'কী বাসনা তোর হৃদয়ে জাগে?'

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞান নিছক অভিজ্ঞানের (Emporism) স্তর পেরিয়ে যেমন দার্শনিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে, তেমনি দর্শনও ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রেনেসাঁর পর থেকে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সঙ্গ সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানের দর্শন গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন ও ধর্মের বিরোধ আজ অতীতের ইতিহাসের একখানি পড়া বই আর কি! বিবর্তিত বিচিত্র রূপের পরিণতি হলেন আল্লাহ্ যার মধ্যে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার তিনি সব জিনিসের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট। তাই মানব-অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্কে বাদ দেয়া অবৈজ্ঞানিক অতীতের অকেজো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

ফরাসী মানববৈজ্ঞানিক Clande Levi Strenss বলেছেন যে, জীবন সম্পর্কে ইসলামের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে তা আধুনিক সামাজিক মনোবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও সামাজিক মানব-বিজ্ঞানের কার্যক্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সঙ্গে অনেকখানি সমভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। ইসলাম জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছে। আধুনিক যুগে Mesmer (১৭৩৩—১৮১৫)-এর Hypnotism Rhine-এর Extra sensory perception ও Richet-এর 'Crytaes thesia of Sixth sense কার্যতঃ এ সমস্যা বাস্তব দিক দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান আজও মুসলিম অধ্যাত্মবাদের অনেক পিছনেই পড়ে আছে। কারণ লাতিফালব্ধ জ্ঞানের কাছ দিয়েও আধুনিক মনোবিজ্ঞান এগোতে পারে নি।

ইশ্ক বা প্রেমের মাধ্যমে ইকবাল এ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হয়েছেন। অপূর্ণতা থেকেই আসে পরিপূর্ণতার ঊর্ধ্বগতি। আর ইশ্কই সত্তা, কামনা ও অনুভূতির মিলন ঘটাতে পারে। সত্যিকার প্রেমিক খুদী উদ্বুদ্ধ পদার্থিক জগতকে আত্মস্থ করে তাঁকে আয়ত্ত করেন ও স্বয়ং আল্লাহ্কেই তাঁর ব্যক্তিত্বের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গতিময় লীলায়িত আয়ত্ত শক্তিই হল জীবন। জড়পদার্থ একদিকে বড় বাধা সৃষ্টি করে আর অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। জীবনী শক্তির বিকাশে ও স্বাধীন সত্তার স্বরূপ প্রকাশে জড়জগতের অবদান নিছক অবহেলার ব্যাপার নয়। কারণ কার্যক্রমের শেষ কথাই হল জীবনের বিচিত্র লীলা।

শুষ্ক ঐক্য সাধনে বা অতীতের কৃত্রিম উজ্জীবনে মুসলিম জীবনের কালিমা ঘুচবে না, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের বৃহত্তর পটভূমিকার মাঝে আবার নতুন জীবন গড়ে তুলতে হবে। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য খুঁজে বার করতে হবে, জীবনকে স্বীকার করতে হবে, নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মুসলিম সমাজ নীতির পরিপূর্ণ ছবি হয়ত ইকবাল দিতে পারেন নি, আইনের সুসংগঠন

www.pathagar.com

করার সময়ও তিনি পান নি। কয়েকটি বিষয়ে ইকবাল তুরস্ককে আদর্শস্থানীয় বলে অভিহিত করেছিলেন। এ সব মতের সঙ্গে এক না হয়েও আমরা বলতে পারি, ইকবাল এ যুগের মুসলিম রেনেসাঁর সর্বপ্রথম অধিকর্তা ও ইসলামী সংস্কৃতির অবিস্মরণীয় প্রতিভূ হিসেবে চির-উজ্জ্বল হয়ে রইলেন। খিলাফতের কথা বলে তিনি প্লেটোর মত দাসদের থেকে আলাদা guardianship চান নি ..... ইসলামী আইনের সার্বভৌমত্বের উপরই খিলাফতকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।

অনুশীলন ও বিশ্লেষণের জন্যে প্রয়োজন দর্শনের আর চির সত্যের জন্যে ধর্মের। কিন্তু দর্শন যখন চির সত্য দান করতে চায় তখন তা ভ্রান্ত পথে চলে। আবার ধর্ম যখন বিশ্লেষণের স্থান দখল করে বিচার বিশ্লেষণ একেবারে বাদ দিয়ে ফেলে, তখন সত্যিকার ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ধর্ম ও দর্শনের সত্যিকার মিলনেই আমাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। এ বিষয়ে ইকবাল আমাদের প্রথম দিশারী। নিখিল বিশ্বের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় দর্শন যা বলে ধর্মীয় অনুভূতিতে তা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে রূপান্তরিত হয়—বুদ্ধিবৃত্তি-জ্ঞান জীবনের সমগ্র গভীর সত্তার মাঝে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে ধর্ম একটি বাস্তব প্রয়োজন—একটি বাস্তব সত্য। নিছক কষ্টকল্পনা নয়। তার বাহ্যিক রূপ পরিবেশের বিভিন্নতায় ও মানুষের খামখেয়ালীতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু তওহীদবাদ, সামাজিক ন্যায়নীতি ও প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য সর্বত্র পরিলক্ষিত, সুস্পষ্ট ও সুপরিস্ফুট। শুধু অনুবৃত্তির মাধ্যমে নয়, প্রাণের মাধ্যমেও আজ ধর্মের আসল জিনিসটি তুলে ধরবার দিন এসেছে। আর একজন বিশ্বাস করে তাই বিশ্বাস করি (ঈমান মুহ্‌মাল) বা কিতাবে লেখা আছে তাই বিশ্বাস করি (ঈমান কামিল) খুব বেশি কার্যকরী নয়। বুদ্ধিভিত্তিক ঈমান (হাক্কুল ঈমান) খুবই প্রয়োজনীয়; আর সবার উপরে হল, বুদ্ধি ও সমগ্র সত্তা দিয়ে বিশ্বাস একিন বা Conviction থেকে জন্ম হয়। এ ধরনের বিশ্বাস ও খুদীর ব্যাপ্তির জন্যেই আমাদের সাধনা করতে হবে।

ইসলামের জীবনীশক্তি অটুট রয়েছে ও ভবিষ্যতেও চিরঅম্লান থাকবে। কিন্তু বড় বড় নীতি কেবল দর্শন ও চিন্তাধারাতেই সীমাবদ্ধ থাকে; তাতে সাধারণ মানুষের জীবন সুন্দররূপে গড়ে উঠতে পারে না। পরিবেশ ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে ইসলামী জীবনদর্শনের বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমেই ইসলামের সুবিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

১৩.

ইসলামী সমাজ গঠনে ইজতিহাদ

কেবলমাত্র শুষ্করীতিনীতির ভেতরেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়; কেননা ইসলাম হল সামাজিক মানুষের সজীব জীবনদর্শন। সমাজ গতিশীল। সেজন্যে ইসলামকে সময়ের চাহিদা, প্রয়োজনের তাগিদ ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমান তালে চলতে হয়। ইসলামের মূলগত ভাব যে সমাজে নিত্যনতুন প্রয়োগের ভেতর দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়, সে সমাজেই এই সঙ্গতি রাখা সম্ভব হয়ে থাকে। এ সমাজকেই আমরা বলি ইসলামী সমাজ; ইসলামের নীতিকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে জাগ্রত, জীবন্ত ও চলমান সমাজ।

ইসলাম ও ইজতিহাদ

ইসলামের ফিকাহ্ বা আইনবিজ্ঞানে 'ইজতিহাদ' বলে একটা কথা আছে। আইনের কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত গঠন করার নামই হচ্ছে ইজতিহাদ। অনেক আধুনিক লেখক ইজতিহাদ বলতে পুনঃব্যাখ্যা বা পুনর্বিশ্লেষণও বুঝেছেন। আমরা ইজতিহাদ কথাটির এর চেয়েও ব্যাপক একটা সংজ্ঞার স্বীকৃতি দেব। আমাদের সংজ্ঞায় বিচারপ্রতিষ্ঠা ও মুসলিমের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার তাগিদে—ইসলামী সমাজ গঠনের প্রয়াসে—ইসলামের মূলগত ভাবের উপর ভিত্তি করে আইনের সম্প্রসারণ করা ও নতুন নতুন জিনিস গ্রহণ করার নামই হবে ইজতিহাদ। আমাদের আদর্শবাদ যাতে করে কেবলমাত্র অলস কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত না হয়, শুধু বায়বীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না থাকে, যাতে করে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে বাস্তব, সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে সেই প্রচেষ্টাই হবে এখন আমাদের।

কুরআন ও হাদীসে ইজতিহাদ

প্রাথমিক যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে, ইসলামের ইতিহাসে এই প্রচেষ্টা নতুন ও অভিনব হলেও, এটা কিন্তু একটা নিছক মস্তিষ্ক-সঞ্জাত বা ধার করা পরিকল্পনা নয়।

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসেই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট নজির ও নির্দেশ রয়েছে। 'যারা আমাদের পরিচালনা পেতে চায়, তাদেরকে নিশ্চয়ই আমরা পথ দেখিয়ে দিয়ে থাকি' [আল-আনকাবুত : ৬৯]।

হাদীসে আছে যে, হযরত (সা.) যখন মু'আজকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা করে পাঠালেন, তখন তাঁকে হযরত (সা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কিভাবে তিনি শাসনভার পরিচালনা করবেন। মু'আজ উত্তর দিলেন যে, কুরআন শরীফই হবে তাঁর পরিচালক। কুরআনে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ না থাকলে তিনি কি করবেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে, হাদীসের নির্দেশ অনুসারেই তিনি শাসন চালাবেন। হাদীসেও কোন বিষয়ে নিশানা না থাকলে তিনি স্বীয় বিবেক ও বুদ্ধিমত্তার উপরেই নির্ভর করবেন। এছাড়া হযরত (সা.) নিজেই বলেছেন যে, যুক্তির চেয়ে অধিক সুন্দর জিনিস আল্লাহ্ আর সৃষ্টি করেন নি। আর এক জায়গায় বলেছেন : আমার পরে আর কোন নবীর প্রয়োজন হবে না, কিন্তু সংস্কারকের প্রয়োজন হবে। আর বলেছেন : আমি মানুষ ভিন্ন আর কিছু নই। যখন ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন আদেশ দান করি, গ্রহণ কর; আর মনে রেখো দুনিয়ার বিষয় সম্বন্ধে আমি সাধারণ মানুষের উপরে নই [মিশকাত শরীফ—কিতাবুল ঈমান]। কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক নিয়মেরও বিবর্তন হবে। এগুলোকে তুলনামূলক (Allegorical) দিক বলা যেতে পারে। এখানে শেষ হাদীসটার অর্থ ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, ইসলামের সাধারণ নীতির ভিত্তিরূপে ও হযরতের (সা.) ধর্মপ্রচারে এক একটি ঘটনার পরিপূরক হিসেবে বা নির্দেশকরূপে যে সব বিষয় ওহীর মারফত হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইসলামের সেইসব মূল বিষয়গুলোর সত্যতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হযরতের (সা.) কাছেই পাওয়া যায়। ধর্মের মূল বিষয়গুলোর (মুহকামাত) কোনও পরিবর্তন নেই। কিন্তু বৈষয়িক বিষয় সম্বন্ধে যেমন একদিকে কুরআন হাদীসের দিকে মূলগত ভাব ও আদর্শের কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে, তেমনি বিবেক বুদ্ধিরও যথেষ্ট অনুশীলন করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সমাজ জীবনেও ইসলামের স্বরূপ প্রকাশ করা ও ইসলামকে কার্যকরী করাই হচ্ছে ইসলামের মিশন। জামাতে নামায পড়া, সুদ প্রথা নিষেধ করা, হজ্জ যাকাত ও মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য দেওয়া ও সমাজে বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুরআনে পরিষ্কারভাবে যেখানে বলা থাকবে সেখানে ইজতিহাদের কোনও অবকাশ নেই। সঠিক নির্ভুল ইজতিহাদ কুরআনের সুষ্ঠু নীতিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলবে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের বাস্তব ও মুক্ত জ্ঞানানুসন্ধানের প্রেরণা থেকেই এসেছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি। পাশ্চাত্য মনীষীরা এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করেন। দুনিয়ার প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে ও গবেষণায় রত থাকতে কুরআন-হাদীসে উদাত্ত আহ্বান রয়েছে। আজকের দিনে আমরা বাস্তব দৃষ্টি হারিয়েছি, আমাদের ইজতিহাদী নীতিকেও বিসর্জন দিয়েছি। কিন্তু অ-মুসলিম লেখকেরাও এ-কথা স্বীকার করেছেন যে, ইসলামে বাস্তব বিষয়ের স্বীকৃতি থাকায় বর্তমান দুনিয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার শক্তি ইসলাম রাখে। গোলভজিহার বলেন যে, ইসলামের মধ্যে নিহিত সাম্যনীতির মারফত ইসলাম আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যেতে পারে। মিশরের আবদুহু ও আল্লামা ইকবাল ইজতিহাদের উপরে জোর দিয়েছেন।

সমাজ নীতিতে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, অ-মুসলিমের সঙ্গে ব্যবহারে এবং জাতীয়তাবাদ, পর্দা ও ভাষা সম্বন্ধে ধারণায় ইজতিহাদী নীতিকে কাজে লাগানো যাবে। কোন বিষয়ে ইসলামের নীতিকে সম্প্রসারণ করতে হবে, আবার কোন বিষয়ে ইসলামের মূলনীতির প্রচার করে ভুল ধারণার শিকড় কেটে দিতে হবে। সমাজনীতিতে (রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিবিজ্ঞান ও তমদ্দুন) আমরা ইসলামের নীতিগুলোকে আদর্শ ও পরিবেশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রসারণ করব ও কাজে লাগাব। চুরির শাস্তি হিসেবে যে হাত কেটে ফেলতে হবে, তার মানে নেই। তখনকার আরব সমাজে যেটা প্রযোজ্য ছিল, এখন সেটা প্রয়োজন নাও হতে পারে।

ইসলাম, ধনবাদ ও কমিউনিজম

ইসলামী সমাজনীতির রূপ দিতে গিয়ে মনে রাখতে হবে যে, শ্রেণী আধিপত্য বিশ্বাসী জুলুমশাহী ধনবাদের সঙ্গে ইসলামের কোন রফা হতে পারে না। ইসলামের উদ্দেশ্য ও ধনবাদের উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই ধরা পড়ে। অন্যদিকে নিহিলীয় (নৈরাজ্যবাদী) জড়বাদ বা কমিউনিজমের সঙ্গেও অর্থনৈতিক বিষয়ে ইসলামের অনেক মিল রয়েছে বটে; কিন্তু এর দর্শন, নীতি ও কার্যধারার সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য বিস্তর। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি বাতলে দেবার জন্যে সদিচ্ছা থাকলেও ধনবাদের শ্রেণীহিংসা রুখতে গিয়ে, শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-আধিপত্য দূর করতে গিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির খাতিরে, দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রেণী-আধিপত্যই সেখানে জেঁকে বসে; রাষ্ট্র-ঝরে-যাওয়া-রূপ-নৈরাজ্যবাদিতার সেখানে

www.pathagar.com

কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু হযরত উমরের যুগে স্রষ্টার প্রতি দায়িত্বশীল মানুষ মানবিকতার উপর ভিত্তি করে সেই মধ্যযুগেও যে সমাজব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন, সমগ্র মানব ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। তবে ইসলামের আদর্শভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, তা বলা যায় না। সাংগঠনিক প্রচেষ্টা দ্বারা সে আদর্শকেই আজ পূর্ণতর রূপ দিতে হবে। তবু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সে সমাজে পরিশ্রম করে রোজগার করা যেমন একদিক ছিল, তেমনি রাষ্ট্র থেকে সবাই সুবিধা পেত। রাষ্ট্র যে কেবলমাত্র জাতিগত বা শ্রেণী-প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের এই ধনবাদী রূপ ও এই জড়বাদী বিশ্বাস হযরত (সা.) নিজে ও প্রাথমিক যুগের মুসলিম খলীফাগণ নসাৎ করে দিয়েছেন। প্রথম খলীফাগণ দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্বশীল মানুষ সততার তাগিদে অর্থনৈতিক শ্রেণী-আধিপত্যের উপর ভিত্তি না করেই জালিম শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে পারে। তবে কি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক থাকবে না? থাকবে। কিন্তু সে শাসন অর্থ—শ্রেণীগত বা বংশগত নয়; সে আধিপত্য কার্যক্ষমতাগত ও চারিত্রিক। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে ইসলামী শাসনের এখানেই অনেকটা পার্থক্য ধরা পড়ে। অধ্যাপক নোলডেকে বলেছেন যে, হযরত উমরের এই সমাজবাদী কাঠামো টিকে না থাকাটা ইসলামের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়েছে।

'ইজতিহাদ' প্রয়োগের পদ্ধতি

ইজতিহাদী নীতি প্রয়োগ করবার সময়ে এ-কথা বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসলামের আদর্শকে আশ্রয় করে অগ্রসর হতে হবে এবং যেখানে যা কিছু ভাল পাওয়া যায় তা গ্রহণ করতে হবে। চীন দেশে তো কুরআন-হাদীস ছিল না; তবুও শিক্ষার তাগিদে সেখানে যাবার কথা হাদীসে আছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরা আপত্তি করি যে, এগুলো ইসলামবিরোধী, শ্রেণীহিংসায় বিশ্বাসী নাস্তিক ও নীতিজ্ঞানহীন পুঁজিবাদী সমাজে তৈরি, তাই গ্রহণ করব না, তবে সেটা বোকামীর চূড়ান্ত হবে; ইতিহাসের অমোঘ বিচারে আমাদের অপমৃত্যু হবে। তেমনি নাস্তিক নিহিলীয় জড়বাদ বা কমিউনিজমের দর্শন ইসলামবিরোধী এই অজুহাতে এর ভেতরে যে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও বাস্তব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার মূল্য না বুঝলে প্রাথমিক যুগের মুসলিমেরা কুরআনের যে মুক্ত-উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞান চর্চা করে 'ইউরোপের শিক্ষাগুরু' আখ্যা পেয়েছিলেন, সে দৃষ্টিভঙ্গী বরবাদ করে দেয়া হবে। অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যবশতঃ কমিউনিস্টরা ইসলাম সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অপরিপক্ক

www.pathagar.com

ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় দিলেও, মুসলিমের পক্ষে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দেয়া মানে নিজেকেই বিসর্জন দেয়া, কারণ ইসলাম হল বিজ্ঞানের জনক। কমিউনিজমের দর্শন ও কার্যধারার সঙ্গে ইসলামের আকাশ-পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও, এর অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের সঙ্গে ইসলামের সমাজনীতির অনেকটা মিল আছে। তা ছাড়া মার্কিন-কমিউনিস্ট নেতা আর্ল ব্রাউডার বলেন যে, মার্কসবাদ হচ্ছে রাজনীতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। এই যদি সত্যি হয় তবে এই দৃষ্টিভঙ্গী ইসলামবিরোধী নয়। কারণ এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই সভ্যতায় ইসলামের অবদান। বর্তমান ধনবাদী সমাজের রূপ-বিন্যাস করতে গেলে এবং কমিউনিজমের খুঁত দেখাতে গেলেও, মার্কসবাদ আমাদের পড়তে হবে—ইসলামের মূলনীতির আলোকে তাকে যাচাই করতে হবে। কোন জিনিস সম্যক জ্ঞান লাভ না করে সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা, অজ্ঞানতার পরিচয় ও ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। যিনি মার্কসবাদ পড়বেন তিনিই কমিউনিস্ট, এ-ধারণারও কোন সঙ্গত কারণ নেই।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

অপরদিকে আধুনিক সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে যে-সব কথার প্রচলন রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে জড়বাদীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও বৈজ্ঞানিকতার ব্যাপারে 'মনোপলি' বা একচেটিয়া অধিকার দাবী করেন। সমরেন রায় বলেন :

'To assume a supernatural power is directly opposed to the spirit of scientific enquiry. The advance of modern science decreated the gods which were created by their predecessors in order to explain these natural phenomena. Today we need not assume anything suppernatural for the governance of nature.'—(Miscellany, 'What is materialism'—P. S. Published by Samaren Roy on behalf of Renaissance Publishers. 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta.)

কিন্তু আমরা জানি যে ইসলাম একটা ধর্ম হলেও মুসলিমকে বাস্তব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতেই আহ্বান জানায়। কাজেই জড়বাদীদের এই মনোভাব ইসলাম সম্বন্ধে মারাত্মক অজ্ঞতা ও অন্ধতা থেকেই এসেছে—একজন শিক্ষিতের ধ্বজাধারী লোককে এই অজ্ঞানতার জন্যে মার্জনা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অজস্র প্রমাণ যে কেবল কুরআনে ও প্রাথমিক মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের ইতিহাসেই পাওয়া যায় তা'ই নয়, হাদীসেও এর সুস্পষ্ট নজির রয়েছে। হযরতের (সা.)

www.pathagar.com

একমাত্র পুত্র যখন মারা যান, তখন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এটা লক্ষ্য করে সাধারণ লোক বলতে শুরু করল যে, হযরতের (সা.) পুত্রের মৃত্যুর শোকে প্রকৃতি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। হযরত (সা.) এই কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।

ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক আন্দোলন

বিজ্ঞানে ইসলামের দানকে খাটো করা আর বেশিদিন চলতে পারে না। সভ্যতার ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর গোলত্ব নিয়ে যখন খ্রিস্টান পাদ্রীদের মধ্যে ঝগড়া হত ও বিজ্ঞান চর্চার অপরাধে গ্যালিলিও, কোপারনিকাসকে নির্বাসন ভোগ করতে, ব্রুনো ডেজিলাস, হাইপেশিয়া ও জনৈক মহিলাকে পুড়ে মরতে হয়েছিল, আর ভানিনির জিহ্বা তুলে ফেলা হয়েছিল—তখন মুসলিম দেশগুলো অশেষ উন্নতি করেছিল, মুসলিম মহিলারাও এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্যা ছিলেন। আল্লাহ্‌র একত্ব বা তওহীদ থেকেই এসেছে মুসলিমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপাত। তাই বস্তুর বিষয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে ইসলাম বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং উদাত্ত আহ্বান জানায়। অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলামের এখানেই পার্থক্য। ইসলাম বলে যে, বাস্তব বিষয়ে ও আধাত্মিক বিষয়ে আল্লাহ্ নির্ধারিত পৃথক পৃথক নিয়ম চালু রয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিয়মগুলো অনুধাবন করে সে অনুযায়ী জীবন গঠন করাই প্রত্যেক মুসলিমের কাজ হবে। আধ্যাত্মিক নিয়মগুলো বাস্তব নিয়ম থেকে পৃথক—যার ইচ্ছা সে বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন করতে পারেন। তবে এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, বাস্তব নিয়মগুলো আবিষ্কার করাও মুসলিমের কর্তব্য। তওহীদের উপর ভিত্তি করে মুসলিমকে আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাসী করে দিয়ে ইসলাম তার ভেতরে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করে। কাজেই মুসলিমের ব্যাখ্যা যেমন করা নেই তেমনি ভাববাদী দার্শনিকদের মত বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ মিশিয়ে ফেলা যায় না। কারণ এ দুটির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কাজ করে চলেছে। ইসলাম বলে যে, প্রকৃতির শক্তি বা পূর্বযুগের দেব-দেবীগুলো মানুষেরই তাবেদার। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টিভঙ্গী এর থেকেই জন্মলাভ করে।

ইসলাম, বস্তু ও মন

মুসলিমের পক্ষে বস্তুর অন্তর্নিহিত নিয়মগুলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আবিষ্কার করা আল্লাহ্‌র ইবাদতের শামিল। (স্রষ্টার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘণ্টা চিন্তা করার সঙ্গে সত্তর বছর সালাত পড়ার তুলনা করা হয়েছে হাদীসে)। তাই বস্তুজ্ঞানহীন সন্ন্যাসবাদ

www.pathagar.com

বা স্যার রাধাকৃষ্ণণের বা বার্কলের অধ্যাত্মবাদ থেকে ইসলামের মূলগত ব্যবধান রয়েছে। ইসলামের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীই ইসলামের মূলনীতিকে সম্প্রসারণ করতে ও যুগে যুগে কাজে লাগাতে সাহায্য করে; অন্যদিকে ইসলামের অধ্যাত্মজ্ঞান নৈতিক মানসিক পবিত্রতার পথ সুগম করে দিয়ে মুসলিমকে, মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য দিতে শেখায় ও দায়িত্ববোধের সৃষ্টি করে। সুতরাং জড়বাদীদের কথা থেকেই বোঝা যায়, এরা ইসলামকে ভালভাবে কেন, মোটেই পড়ে নি।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার বাহকেরা (জড়বাদী ধনবাদী ও জড়বাদী-সাম্রাজ্যবাদী) বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামের কাছ থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। কিন্তু এরা কেউই সম্পূর্ণরূপে প্রগতিশীল নয়—এর পেছনে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ধনবাদীদের ব্যক্তিবাদী উদারনীতি বা লিবারালিজম মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রগতির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এ-সব সাময়িক, পূর্ব-দর্শনের প্রতিক্রিয়ারূপী চরম দর্শনকে কেন্দ্র করে যখনই সমগ্র মানব সভ্যতার সামগ্রিক ভিত্তি রচনা করতে চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তখনই এগুলো প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রগতিশীল উদারনৈতিক ব্যক্তিবাদের অর্থনৈতিক প্রয়োগ থেকেই ধনবাদের অরাজকতা, ঔপনিবেশিকতা ও মানুষের উপর মানুষের জুলুম জন্ম নিয়েছে। অন্যদিকে নিহিলীয় সমাজবাদের প্রগতিশীল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (অবশ্য থিয়োরীর দিক দিয়ে চরমবাদী প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়ে আসায় এর ভেতরও অনেক দার্শনিক প্রমাদ আছে, বাস্তবক্ষেত্রে রুশ ইতিহাসেও এই প্রমাদগুলো ধরা পড়েছে।) ছাড়িয়ে যখনই বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিকে রূপ দিতে যাওয়া হয়েছে তখনই তা ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল কথা, এ সব দর্শনের পেছনে প্রকৃত মানবিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগাবার পক্ষে অনুকূল কোন নীতি ছিল না, এখনও নেই। লোভের খাতিরে ইসলামের নীতি বর্জন করার ফলে মানুষ চরম দর্শনের দাস হয়ে পড়েছে। গতিশীলতা জীবনের চিহ্ন হলেও, আলেয়ারূপ চরমবাদী দর্শনের পেছনে পেছনে চললে—চলা হয় বটে কিন্তু সেটা অগ্রগতি হয় না, সেটা হয় ঘোর প্রতিক্রিয়া।

ইসলাম, পরিপূর্ণ জীবনদর্শন

অন্য ধর্ম বা দর্শনের চাইতে ইসলাম বেশি প্রগতিশীল এজন্যে যে, ইসলাম অজ্ঞানতা দূর করতে গিয়ে চরমবাদের রূপ নিয়ে আসে না, মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য স্বীকার করে না; তাছাড়া কেবল ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ করেই ইসলাম বসে থাকে না, ইসলামের প্রেরণা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকেই সমভাবে

www.pathagar.com

রয়েছে। সেজন্যে ইসলামকে কুরআনে পূর্ণতম ধর্ম বলা হয়েছে। ধনবাদীরা (জড়বাদী) ইসলাম সম্বন্ধে খোঁজ রাখে না, লোভ ও আধিপত্যের খাতিরে এরা অধ্যাত্মবাদী। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ লোককে অজ্ঞান রেখে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে এরা খেতে চায়। আবার সমাজবাদীরা ইসলামের সমাজনীতি সম্বন্ধে পড়াশুনা না করেই, ইসলামকে অন্য ধর্মের সঙ্গে এক গোষ্ঠিতে স্থান দেয়। সুযোগ-সুবিধা বুঝে নিজেদের দার্শনিক সমর্থন না থাকলেও, ধর্মের সঙ্গে কখনও কখনও বোঝাপড়া করে (তবু মানুষের ধর্মস্পৃহাকে চেপে রাখতেও পারে নি): নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দেবার চেষ্টা করে সব বিষয়েই প্রগতিশীলতার বাহবা নিতে চায় ও জড়বাদের সাহায্যেই তারা জড়বাদকে ধ্বংস করতে চায়—যা অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখলাম যে, উদারনীতির ভুল অর্থনৈতিক প্রয়োগ বা প্রতিক্রিয়া (Reaction) স্বরূপ যে সমাজবাদ এলো, তা তার (ধনবাদ) ক্রিয়ার (Action) অনেকগুলো গুণ লক্ষ্য করে অনেক জিনিসের সার্বজনীন সংজ্ঞা (যেমন ধর্মের সংজ্ঞা) দিয়ে ফেলল; তাছাড়া বস্তুর ওপর মানুষের মানসিকতার কোন প্রভাবের স্বীকৃতি না দেওয়ায় জড়বাদ অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। সমাজ বিজ্ঞানের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষ শুধু একটি বস্তুপিণ্ড নয়, তার মন বলেও একটি জিনিস আছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে দেখলে, মাবন-সভ্যতায় ধনবাদ ও সমাজবাদ উভয়ই প্রতিক্রিয়াশীল। ইসলামী সমাজ গঠনে এ-কথাটা যেন আমাদের মনে থাকে।

ইসলামী শিক্ষা : আসল ও নকল

ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইজতিহাদী নীতি প্রয়োগ করতে হবে। তথাকথিত মুসলিম দেশগুলোতে বৈদেশিক শাসন ও রাজতন্ত্র প্রবর্তিত থাকায় ইসলামী শিক্ষা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা অচল হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে হেস্টিংসের আমলে যে 'ইসলামী শিক্ষার' প্রবর্তন করা হয়েছিল, সেখানে মুসলিম জাতিকে পঙ্গু করে ফেলবার ঘোর ষড়যন্ত্র ছিল। এ শিক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন মুসলিমের পতন এনেছিল, অন্যদিকে ক্লীবতা, জড়তা ও অন্ধতার ভেতরেও তাকে ডুবিয়ে রেখেছিল। ইসলামী সমাজগঠন তো দূরের কথা, ইসলামী সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠ ধারণাও এই শিক্ষা থেকে পাওয়া সম্ভব হয় নি। মনে রাখতে হবে যে, কুরআন-হাদীসের জ্ঞানলাভ করলেই ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এগুলো হল অপরিহার্য দীপ বর্তিকা, কুরআন-হাদীসের আলোকে দুনিয়া-জাহানের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করা ও সেই লব্ধ জ্ঞানকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করাই হল ইসলামী

www.pathagar.com

শিক্ষার সঠিক পরিচয়। কোন একটি বিশেষ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করা যেতে পারে—কিন্তু ইসলামী ও অ-ইসলামী শিক্ষার ভেতরে পরস্পর পার্থক্য নির্দেশ মারাত্মক। কেননা, শুধু শিক্ষা কেন, মুসলিমের প্রতিটি কাজের মধ্যেই ইসলামী আদর্শের প্রভাব থাকবে। ঐভাবে পার্থক্য নির্দেশ করলে, ব্যবহারিক জীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আরম্ভ ও উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে তার সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করাই হবে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা।

ইসলাম ও মোল্লাবাদ

একদিকে যেমন ইসলামী শিক্ষার পূর্ণবিকাশ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি অজ্ঞ মোল্লাদের ইসলাম-বিরোধী প্রচারণা, কুসংস্কার ও মিথ্যা গল্প-কিস্‌সাগুলোও প্রচারের মারফত দূর করা চাই। ধর্মের নামে যারা ধোঁকা দেয় ও ধর্মকে যারা ব্যবসায়ে পরিণত করে, তাদের সম্বন্ধে কুরআনে বহু সাবধান বাণী আছে। আর হযরত (সা.) বলেছেন : 'দুনিয়া ধ্বংস হবার অব্যবহিত পূর্বে মিথ্যাবাদীরা এমন সব মিথ্যা গল্প রচনা করবে যেগুলো তোমরা শোন নি, এমন কি তোমাদের পূর্বপুরুষেরাও কখনও শোনে নি; তাদের থেকে দূরে থাকবে।' শিক্ষা বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার অনুসন্ধানী ভাব থেকে আমাদের সমাজ কত দূরে আছে, নীচের এই ঘটনা থেকে সেটা বোঝা যাবে। ইংল্যান্ডে যখন প্রথম উড়োজাহাজের প্রবর্তন হল, তখন খ্রিস্টান পাদ্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে এতে চড়তে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, প্লেনে চড়াটা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়—আর এটা যদি তাঁর অভিপ্রেত হত তবে তিনি মানুষকে নিশ্চয়ই উড়বার জন্যে ডানা দিতেন। এই মনোভাবের এ-দেশীয় সংস্করণও পাওয়া যাবে। ১৯৪৮ সালে ঈদের জামাতে এক ইমাম সাহেব বলেছিলেন যে লাউড স্পীকার হযরত (সা.) ব্যবহার করেন নি, তাই আমাদের ব্যবহার করা চলবে না। উটের দুধ খেতে হবে, বহু দাম দিয়ে উট কিনে চড়তে হবে—পরনের কাপড় থেকে আরম্ভ করে পানাহার পর্যন্ত বর্জন করবার উপক্রম হবে। নতুন জিনিস গ্রহণ করার সময় অবিশ্যি আদর্শচ্যুত হলে চলবে না; কিন্তু হযরতকে (সা.) অনুসরণ করা মানে ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা নয়; আর ধর্মে বাড়াবাড়ি করতে তো নিষেধ করাই হয়েছে। তারপর ইসলাম প্রচার করবার সময়ে কোন জিনিসটা অপেক্ষাকৃত বেশি দরকারী, কিভাবে উপদেশ দিলে কার্যকরী হবে ও যাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে তাদের মানসিক উৎকর্ষ কতখানি এ-সব দিকে নজর রাখতে হবে। ধর্মীয় গোঁড়ামী সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোর পরিপন্থী। আমাদের পল্লীসমাজে যে সব মিথ্যা প্রমাদের বহুল প্রচলন

www.pathagar.com

রয়েছে এগুলো যত শীঘ্র লুপ্ত করা যায় ততই মঙ্গল। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে এগুলো আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে। মসজিদে মসজিদে শিক্ষিত ইমাম নিয়োগ, মসজিদে মসজিদে দেশী ভাষায় ইসলামের সমস্ত দিকগুলো যাতে করে প্রচার করা হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

ইসলাম ও অ-মুসলিম

ভারতের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অ-মুসলিমের অবস্থা বাংলাদেশে খারাপ নয়। কিন্তু প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার সম্বন্ধে মুসলিম অ-মুসলিম জনসাধারণের এমনকি, অনেক নেতারও কোন ধারণা নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে শৈথিল্য আসে এই অজ্ঞানতা থেকেই। ইসলামের মতে ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। ধর্ম-প্রচারে কেবল যুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিমা-পূজকদের প্রতিমাকে পর্যন্ত মন্দ বলা নিষিদ্ধ আছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মজলুমকেই সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করবেন না, যে তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়াশীল নয়। যে জাতিরই হোক না কেন, যারা এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসী থাকবে ও ভাল কাজ করবে তাদের কোন ভয় নেই। অ-মুসলিমকে যে মুসলিম পীড়া দেয় সে মুসলিমই নয়। এ-সবই কুরআন-হাদীসেরই নির্দেশ। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দাবী প্রতিষ্ঠা করে হযরত (সা.) যে ফরমান জারী করেছিলেন তা থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিমের স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে জানা যায়। হযরত উমর শুধু রাজ্য শাসনকালেই নয়, মৃত্যুকালেও অ-মুসলিমের অধিকার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে যান। আধুনিক রাষ্ট্রে এই নীতিরই আমরা সম্প্রসারণ করতে পারি–মধ্যযুগে যে সব দাবী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি—সেগুলোও আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে মেনে নিতে পারি। প্রকৃত ইসলামী সমাজে ধর্মান্ধতার স্থান কখনই থাকতে পারে না। অনেক সংখ্যালঘু নেতা বলে থাকেন যে, দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করার কথা বলা ছেড়ে দিলেই তাঁরা নিরাপত্তা পাবেন। কথাটা ঠিক উল্টো। কুসংস্কারের ফল কুয়াশা ও কুয়াশার ফল সংঘর্ষ। ধর্ম মানেই ধর্মান্ধতা নয়। ধর্মান্ধতা ও ধার্মিকতার ভেতরেও পার্থক্য আছে। কাজেই যতদিন ইসলামকে অজ্ঞানতার কুয়াশায় রাখা যাবে ততদিনই তাদের ভয়। ইসলামকে অনেকে হয়ত স্বার্থে নিয়োজিত করতে পারে, কিন্তু জুলুম কেবল ধর্মেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশ সেবার নামে দেশকে জুলুম করে এমন লোকেরও অভাব নেই। শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনের মারফতই এগুলো দূর করতে হবে। মানবতা ও আল্লাহ্র প্রতি দায়িত্বের ভিত্তিতেই অ-মুসলিমের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম মুসলিমকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। ইসলাম যে তরবারির দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল, ঐতিহাসিকদের এ মিথ্যা মোহও আজ আর নেই।

www.pathagar.com

এখানে ইসলামের মূলনীতি সম্বন্ধে কতকগুলো বিষয় স্থিরচিত্তে অনুধাবন করা প্রয়োজন। ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন করলে প্রতিক্রিয়াশীলতা আসে কেবল তাদেরই জন্যে যাদের ধর্ম ছুৎমার্গ শিক্ষা দেয়, কালাপানি পার হতে নিষেধ করে। যারা রাজনীতিতে নির্বিবাদে ম্যাকিয়াভেলীর সুবিধাবাদ ও নীতিজ্ঞানহীনতা গ্রহণ করেছে, যাদের ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত দিকেই (কেবলমাত্র পুরোহিত সমাজে) সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তব জীবনের অনেক কথায় বিশেষ করে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক হবে সে সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে না। কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিগত ও মানসিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেজন্যে প্রকৃত মুসলিমের একটি বাস্তব জীবনদর্শন ও জীবনের মিশন আছে। অন্য ধর্মীয়দের এটা নেই বলেই, তাদের বৈষয়িক ও ধর্মীয় বিষয় আলাদা করতে হয়। এদের ধর্ম অন্য ধর্মের লোককে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয় এবং ধর্ম থিওরীগতভাবে থাকলেই যথেষ্ট হয়, আর বৈষয়িক বিষয়ে নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিতেও তাদের কিছু আটকায় না। কিন্তু সম্প্রদায়গত মুসলিম সমাজ ও ইসলামী সমাজের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। ইসলামী সমাজে জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ হিসেবে মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠা হবে—কারণ সব সম্প্রদায়কেই ইসলাম আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবরূপে দেখে। কাজেই এই সমাজে সম্প্রদায়গত লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেবল সম্প্রদায়গত উন্নতি করলেই মুসলিমের কর্তব্য শেষ হয় না—যুক্তির দ্বারা সমাজে বিচার প্রতিষ্ঠাও মুসলিমের কাজ। হিন্দুধর্মের কোন কাজ না করলেও হিন্দু থাকা চলবে, কিন্তু ইসলামী সমাজে কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত মুসলিমের কোন মূল্য থাকবে না যে পর্যন্ত বাস্তবজীবনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা না করা হয়। ইসলামী সমাজ মানে কেবলমাত্র মুসলমানের সমাজ নয়—ইসলামের মূল-ভাবের ওপর ভিত্তি করে যেখানে বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মানুষ হিসেবে মানুষ যেখানে তার অধিকার পেয়েছে— সেই সমাজই ইসলামী সমাজ। অর্থনীতি, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইসলাম প্রগতিশীল ও মানবিক পথ নির্দেশ করে। সেজন্যে প্রকৃত ইসলামী সমাজই হবে অ-মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ। দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম-প্রচারকেরাই যে মূলতঃ ইসলাম প্রচার করেছেন প্রকৃত মুসলিম এ কথা বিশ্বাস করে; এবং সে-সব ধর্ম-প্রচারকেরাও মুসলিমের সমশ্রদ্ধার পাত্র। কুরআনের মতে, ইসলাম সমস্ত মানুষের মঙ্গলের জন্যেই আর হযরত (সা.) এসেছিলেন দুনিয়ার রহমত হিসেবে, তিনি তাই শত্রুকে পর্যন্ত অভিসম্পাত করেন নি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র

আমাদের বর্তমান সমাজের এই অবস্থায় বাংলাদেশকে যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র বলে মনে করেন তাঁরা ভুল করেন। কারণ ইসলামী সমাজ যতদিন গঠিত না হচ্ছে আর যতদিন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একই রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে না আসতে পারছে, ততদিন, ইসলামী রাষ্ট্র কথাটার কোন অর্থ হয় না। তবে বলা যেতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা যদি আমরা সত্যিই করি, তবে অজ্ঞ লোকদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতা দেখে ক্ষমা করলেই যথেষ্ট হবে না, তাদের মধ্যেও ইসলামের সুষ্ঠু প্রচার চাই। আর সব বুঝে-শুনেও যে-সব স্বার্থান্বেষীরা (হিন্দু ও মুসলিম নামধারীরা) অন্য রকম প্রচার চালাবেন তাঁদের ভেতর কোন কুমতলব আছে বুঝতে হবে। তাঁদেরকে আমরা তিনটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : (১) ইসলাম ধর্ম বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকই বুঝায়, (২) সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধের মধ্যে পার্থক্য আছে, (৩) ইসলাম মানুষের ওপর মানুষের অর্থনৈতিক জুলুম বরদাশত করে না ও প্রকৃত ইসলামী সমাজে ধনবাদের কোন চিহ্ন থাকতে পারে না।

তথাকথিত মুসলিম রাজতন্ত্র ও জিযিয়া এ দু'টি জিনিসই ইসলামী সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণের বড় কারণ। ভারতের মুসলিম রাজা-বাদশাদের শাসন ইসলামী শাসন ছিল না, তাই সে-সমাজ বা রাষ্ট্রের দোষ দেখিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন সম্রাট ধর্মনিষ্ঠ থাকলেও ভারতের মুসলিম সম্রাটেরা যে ইসলামী সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন নি, এটা নিঃসন্দেহ। প্রথম চার খলীফার পর থেকেই ইজতিহাদী নীতির সমাজিক প্রয়োগ অচল হয়ে পড়ে; আব্বাসীয়দের সময় থেকে শুষ্ক রীতিনীতির বাঁধন এত দৃঢ় হয় যে, ইসলামের মূলগত ভাবের কথা লোকে ভুলে যায়, তাই ইসলামী সমাজ গঠনের তো কোন কথাই ওঠে না।

ইসলাম ও জিযিয়া

জিযিয়া সম্বন্ধেও মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে। মাথাগুণতি জিযিয়া ইসলামের বিধানগত জিনিস নয়। এটা একটা রোমক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম শাসকেরা জিযিয়াকে রেখে ছিলেন উদারতার উপর ভিত্তি করে। যুদ্ধে বিজিত অ-মুসলিমের কাছ থেকে নেয়া জিযিয়া কর মাথাগুণতিও ছিল না— স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম ও বৃদ্ধদের এই কর দিতে হত না। দেশ রক্ষার্থে সমস্ত মুসলিমকে যুদ্ধ করতে হত আর সুস্থ সবল অ-

www.pathagar.com

মুসলিমেরা যদি দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ না করতে চাইতেন তবে তাঁদেরকে এই কর দিতে হত। যুদ্ধে যোগ দিলে জিযিয়ার টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হত। কাজেই মুসলিম দেশের জিযিয়ার মূল ভিত্তি ঔদার্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেজন্যে ঐতিহাসিক শেফলার এই জিযিয়াকে 'A Trifling matter' বলেছেন। আর গিবন বলেছেন, 'Moderate'। আমাদের দেশে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নামে অনেকগুলো অন্যায় দোষারোপ করেছেন। কিন্তু সে-সব ভুল এখন একে একে ধরা পড়েছে। পুনর্বার জিযিয়া কর বসানো আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু হিন্দু মন্দির নির্মাণ ও সাধুদের জন্যে তিনি যে কত জমি ও টাকা দান করেছিলেন, লন্ডন মিউজিয়ামে রক্ষিত আওরঙ্গজেবের ফরমান থেকেই সেটা জানা যায়। হিন্দু-মুসলিম সমস্ত শান্তিপ্রিয় প্রজাবৃন্দের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি যে সম্রাটরূপে নিজকে আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী মনে করতেন, সে-কথা তাঁর চিঠিগুলোতে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইসলামবিরোধী রাজতন্ত্রের আওতার ভেতরে থেকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি, তখন সম্ভবও ছিল না। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর কারণ ত্রিবিধ : (ক) জিযিয়া ইসলামী প্রতিষ্ঠান নয়; (খ) আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হলে প্রত্যেক নাগরিককেই দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে হবে; (গ) যুদ্ধে বিজিতের প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক; ইসলাম সম্বন্ধে সুষ্ঠু প্রচার দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতা ও অন্ধতা দূর করতে হবে।

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ

তারপর জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ আদতেই ইসলামবিরোধী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট উইলসনের জাতীয় নিয়ন্ত্রণবাদের মারফত জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগান হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। সমাজে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামের ভিত্তিতে সমস্ত মুসলিম দেশগুলোকে এই সামাজিক (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক) কাঠামোর ভেতরে আনতে হবে। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের স্থানে ইসলামের নীতিকে প্রথমে কর্মশীল করে তুলতে হবে; তারপর একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে। তবে নিজ নিজ দেশে ইসলামী সমাজগঠন করা আমাদের প্রথম কাজ হবে।

www.pathagar.com

ইসলাম, পর্দা ও অবরোধ

আমাদের দেশে ও অনেক মুসলিম দেশে যে পর্দা প্রথার প্রচলন রয়েছে—তার সঙ্গে ইসলামী বিধানের কোন সঙ্গতি নেই। পারসিক এই পর্দা প্রথা—অজ্ঞানতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক ভণ্ডামী ও দুর্নীতির জন্যে অনেকাংশে দায়ী। কুরআনে শালীনতা ও চরিত্রের পবিত্রতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে ও মেয়েদের পক্ষে খুব নিকট কয়েকজন পুরুষ ছাড়া অন্যের সামনে বাহ্যিক জাঁকজমক প্রদর্শন নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রাখাও যেমন ইসলামে নেই, তেমনি বর্তমান আধুনিকাদের লোক-দেখানো হাবভাব ও পুরুষালী ঢংও সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী। কাজেই যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা কুরআনের পর্দানীতির ভিত্তি; সেই পন্থাই সংযত ও দৃঢ় যুক্তির মারফত সমাজে প্রচার করতে হবে। মেয়েরা যাতে করে শালীনতা বজায় রেখেও প্রয়োজনমত স্বাচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে সেই ধরনের পোশাকও তৈরি করা দরকার; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদেরও সংযত ও শোভন মনোবৃত্তি লাভ করা চাই। কুরআনের দির্দেশে শুধু মেয়েদেরকেই পর্দা করতে বলা হয়েছে তা নয়, পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি অবনত করতে বলা হয়েছে।

ইসলামী সমাজ ও ভাষা-সমস্যা

পরিশেষে ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধেও একটুখানি আলোচনা প্রয়োজন। ভাষার ব্যবহারটা মোটেই সমস্যা নয়— সমস্যাটা তৈরি করে এখন তার সমাধান খোঁজা হচ্ছে। কুরআন শরীফ পড়বার জন্যে ও ইসলামের সার্বজনীনতা বজায় রাখবার জন্যে আরবি (অবিশ্যি অর্থ বুঝে) আমাদের পড়তে হবে। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সামাজিক জীবনে— সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে— ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে প্রত্যেক স্থানের দেশীয় ভাষার মারফতই শিক্ষার প্রসার করতে হবে। প্রকৃত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ইসলামী শিক্ষা কেবলমাত্র আরবি-ফারসীর ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকায় মুসলিম-সমাজে ভাষা সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, মূলগত ভাবের উপরেই ইসলাম নির্ভর করে, কোন বিশেষ ভাষার উপরে নয়। ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণের খাতিরে কোন বিশেষ ভাষাজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে— কিন্তু দেশের সাধারণ লোকের ভাষায় ইসলামকে প্রচার না করে কুক্ষিগত করে রাখলে, মানুষের উপরে মানুষের আধিপত্য সম্ভব হতে পারে, কিন্তু ইসলামের সাহায্যে জীবন গঠন সম্ভব হবে না। ইসলাম প্রচারিত হবার পূর্বে আরবে ও পারস্যে পৌত্তলিকতাপূর্ণ অনেক শব্দ

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে-সব দেশের সেই সেই ভাষার মাধ্যমে ইসলাম চর্চা করতে কোন বাধাই হয় নি। প্রয়োজনমত শব্দ গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে। তাই কোন একটি ভাষাভাষী (যেমন উর্দুভাষী) লোকই শুধু মুসলিম, আর সবাই মুসলিমই নয় বা একটু নীচু দরের— এ মনোভাব সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী— এই মনোভাব পোষণ করলে কেবল ইসলামের সার্বজনীন শান্তিপূর্ণ সমাজগঠনের মিশনকেই অস্বীকার করা হয় তা নয়, পবিত্র ইসলামের জাতিভেদ প্রথা ও হিন্দু ব্রহ্মণ্যবাদ স্বীকার করে নেওয়া হয়।

ইসলামের মূলনীতির পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাই যে, কোন ভাষা বা কোন ভাষাভাষী লোকের ভেতরেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। সেজন্যে বিভিন্ন স্থানে মুসলিমের মাঝে যে-সব বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো বজায় রেখেই ইসলামবিরোধী শব্দগুলো ভাষা থেকে (সে উর্দুই হোক আর বাংলাই হোক) বর্জন করতে হবে ও দেশীয় ভাষার সাহায্যে ইসলাম প্রচার করে প্রকৃত ইসলামী সমাজ গঠন করতে হবে। সেটা যতদিন সম্ভব না হয় ততদিন ধর্মান্ধতা, শরাফতি, বংশগর্ব ও মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যই আমাদেরকে ঢেকে রাখবে—প্রকৃত ইসলাম আমাদের সমাজে সক্রিয় হয়ে উঠবে না। ইসলামের অনুশাসনগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

মনে রাখতে হবে যে, আরবিই হোক, ফারসীই হোক, বাংলাই হোক আর উর্দুই হোক, প্রত্যেক ভাষাতেই ইসলামসঙ্গত ও ইসলামবিরোধী মতামত প্রকাশ করা যায়। কোন একটি ভাষা হলেই তা প্রকৃত ইসলামী ভাবধারার গ্যারান্টি হবে এ-কথা সত্যি নয়। আমাদের অশিক্ষিত দেশে সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলন করতে গেলেও বিদেশী ভাষা কোনমতেই সুবিধাজনক নয়— ইংরাজীর মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করার ফল থেকেই এ-কথাটা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কাজেই দেশকে শিক্ষিত করে তুলতে হলেও দেশীয় ভাষাকে বাহন করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ইসলামকে মানুষের জীবন সহজ সুন্দর না করে তুলে উর্দু হরফ প্রবর্তন করে শিক্ষাকে কতকগুলো বিদেশী লোকের ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখার যে তুঘলকী পরিকল্পনা চলেছিল সেটা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোর পরিপন্থী। আর ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা না হলে প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয়। ইসলামের প্রকাশ হয় স্বার্থ-খেয়ালবশে— হরফ চাপিয়ে দেয়ার ভেতর দিয়ে নয়। মানুষের জীবনেই হয় ইসলামের প্রকৃত বিকাশ।

www.pathagar.com

ঔদাসীন্য ও স্বার্থসংঘাতে জর্জরিত হয়ে মুসলিম চিন্তাধারায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা অনেকদিন ধরেই আমল পায় নি। কিন্তু আজ চরমবাদী দর্শনের সংঘর্ষের ঘনঘটায় যখন সমস্ত পৃথিবী ঢেকে গিয়েছে, সে সময়ই ইসলামের সামাজিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রকৃষ্ট সময়। এ-কাজে ইসলামের আদর্শশ্রয়ী ইজতিহাদ বিশেষ সহায় হবে। বর্তমান দুনিয়ার সমাজব্যবস্থা বেশিদিন টিকতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র স্বার্থপরতা ও জড়বাদের উপরে তার প্রতিষ্ঠা। লোভ ও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে কোন নীতিই ধনবাদী ও সমাজবাদীরা দিতে পারে নি। কাজেই ইসলামী সমাজ গঠনে একদিকে যেমন ধনবাদী ও সমাজবাদীদের মিথ্যা প্রচারণা ও শ্রেণীনীতি থেকে হুঁশিয়ার থাকা দরকার, তেমনি মোল্লাগণও যেন আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে। ইমামতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, পরীতন্ত্র ও হোজাতন্ত্র (ধর্মের নামে ব্যবসা) থেকে মুক্ত থেকে ইসলামের মৌলিক ভাব ও নীতিই হবে আমাদের সামাজের ভিত্তি। ইসলামী সমাজে পুরোহিত সমাজ বলে কিছু থাকতে পারে না। ইসলামে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ব্যক্তির সরাসরি যোগাযোগ। আল্লাহ্‌র আইন বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার চাবিকাঠি কারুর হাতেই থাকে না। এখানে এই আইনকে সুযোগ্য ব্যক্তিরা বুঝিয়ে দিতে পারেন বা অর্থ করতে পারেন। প্রকৃত আলেম বা পীর ইসলামী সমাজে থাকবেন। তাঁরা উপদেশ দিতে পারেন ও আধ্যাত্মিক নিয়মগুলো যাঁরা জানতে চান তাঁদের শিখাতে পারেন। এ-জন্যে তাঁদের নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করতে পারি। কিন্তু তাঁরা উপদেশদাতা মাত্র— তাঁদের কাছে না গেলে বা দরগায় বাতি না দিলে নাজাত বা মুক্তি সম্ভব নয়—এ মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী।

এটা বুঝতে পারলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এভাবে নতুন মোড় নিতে পারলে, শুধু ইসলামী ইতিহাসের নয়, দুনিয়ার ইতিহাসের ধারাও বদলাবে।

www.pathagar.com

১৪.
লেখক ও তাঁর সামাজিক দায়িত্ব

নিজের মন, অনুভূতি, বিশ্বাস এবং উচ্চতর আদর্শবাদের প্রতি আত্ম-নিবেদনের চেতনার সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নিজের পছন্দ সম্পর্কে লেখককে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং সত্য ও সাধুতার প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে। স্বীয় মন ও জীবন বিধান নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবকাশ লেখকের জন্যে অপরিহার্য। অপছন্দনীয় মানুষ বা ঘটনাবলীকে প্রশংসা করতে লেখক বাধ্য থাকবে না। এর অর্থ হচ্ছে, নিজের অনুভূতি সম্পর্কে চিন্তা করার এবং তা প্রকাশ করার অধিকার লেখকের থাকবে। লেখককে থাকতে হবে দাসোচিত আনুগত্যের ঊর্ধ্বে এবং অন্যান্য লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যের বাইরে।

নিজের পেশার প্রতি সত্যনিষ্ঠার জন্যে লেখককে স্বাধীন পরিবেশে জীবনযাপন করতে হবে, দাসত্ব এবং শৃংখলার মধ্যে নয়। অর্থাৎ তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে স্বাধীন পরিমণ্ডলে অবস্থান করতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলে মানবিক চেতনার সৃজনশীল অগ্রগতি সম্ভব হবে। আর সামাজিক স্বাধীনতা বলে সুসংহত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের নিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে, যে বুনিয়াদের উপর লেখক ও নাগরিক বাধাহীন অগ্রগতি ও উন্নয়নমূলক জীবনের আস্বাদ পেতে পারে।

ব্যক্তি, মানুষ এবং জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে লেখক উদাসীন থাকতে পারে না। কারণ স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে এবং মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে স্বীয় ভূমিকা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে এটা অপরিহার্য।

স্বীয় মৌলিক জিজ্ঞাসা, নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি লেখককে আনুগত্যশীল হতে হবে। এগুলোর ভিত্তিতেই লেখক বিকাশ লাভ করে, এবং তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কিন্তু সহজ কাজ নয়। ক্রমবর্ধিতভাবে সাহিত্যের বাণিজ্যকরণ এবং কারিগরী ও পরিচালনামূলক সমাজ

www.pathagar.com

(Managerial society) কাঠামোতে আমলাতন্ত্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপের ফলে অপরিহার্যভাবেই লেখকের স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে। জীবিকা আহরণের জন্যে কিংবা কোন রকমে জীবিকা নির্বাহের জন্যে লেখককে তাঁর আদর্শবাদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে আপোষ করতে হচ্ছে।

দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে আমাদের অনেক লেখকই সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধ্বসে গেছে। কিন্তু সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে যে সমাজ পরিবর্তনকে গ্রহণ করে থাকে, সেখানে এগুলো স্বাভাবিক। তাই তাঁরা বন্ধ্যা, শূন্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে উন্নাসিকতা সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করে থাকেন।

কর্তব্যপরায়ণতার খাতিরে লেখককে তাঁর সমকালীন পটভূমিতে সৌন্দর্য, প্রেম ও মানবিকতা সম্পর্কে স্বীয় ধারণা গড়ে তুলতে হয়। বাস্তব সম্পর্কে লেখকের ধারণা তাঁর সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। লেখক সমাজেরই মানুষ, তাই তাঁর সৌন্দর্যবোধ মানবিক সম্পর্ক—নিরপেক্ষ হতে পারে না, প্রেম ও সার্বজনীন মানবিক চেতনায় সংযুক্ত হয়েই সৌন্দর্যবোধ বিকাশ লাভ করবে। অবশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আঙ্গিক ও রূপরেখার মাধ্যমে এক-এক ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একমাত্র স্বাধীন পরিবেশেই লেখক নিজেকে তুলতে এবং প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে স্বীয় ধারণা প্রকাশ করতে সমর্থ। সত্যিকার স্বাধীনতা অবিভাজ্য এবং ব্যাপক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। পরিচালনামূলক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আজাদী ছাড়া আজকের জটিল ও আন্তঃনির্ভরশীল সমাজে সৃজনধর্মী সৃষ্টি কঠিন। মূল্যবোধ ও আচরণের মান প্রতিষ্ঠায় লেখককে অবশ্যই সহায়ক হতে হবে। মানব-সভ্যতা সংরক্ষণে এবং মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা বিকাশেও লেখককে সহায়ক হতে হবে। সাধারণ মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি সম্পর্কেও তাঁকে নিবিড়ভাবে অবহিত হতে হবে এবং এভাবে তাঁকে শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের বুনিয়াদ গড়ে যেতে হবে। আজকে এই যুগসন্ধিক্ষণে অরাজকতা হতাশাবাদ, পলায়নী মনোবৃত্তি এবং আত্মরতি—সে পুরাতনই হোক বা আধুনিকই হোক—প্রতিরোধই হচ্ছে লেখকের কর্তব্য।

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও অগ্রগতির সঙ্গে জনসাধারণের জন্যে ভারসাম্যময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আনয়নের উদ্দেশ্যেও লেখককে সচেষ্ট হতে হবে। প্রেম ও

www.pathagar.com

সৌন্দর্য সম্পর্কে নিজের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে লেখকের পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। ন্যায়বিচার একটা সার্বজনীন মানবিক ধারণা, কিন্তু এর প্রয়োগ আপেক্ষিক। সুতরাং লেখকের উচিত ন্যায়বিচারের সাধারণ ও প্রায়োগিক উভয় দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা।

আজকের দিনে সমাজ-কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, কারিগরী অগ্রগতি হচ্ছে দ্রুততর গতিতে। এর ফলে সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তলিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রকটতা থেকে একনায়কত্বের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি আমাদের সমাজ কাঠামোতে বর্তমান একনায়কত্বের সমর্থকরা তাকে আরও জোরদার করেছে।

সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার প্রতি প্রধানতঃ এই ধরনের স্বৈরাচারী হুমকি বিদ্যমান এবং লেখকরাও অপরিহার্যভাবেই এই হুমকির আওতাধীন। সুতরাং লেখককে অবশ্যই এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। উন্নততর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বুনিয়াদ সুসংহত করার ব্যাপারে লেখকেরও দায়িত্ব রয়েছে।

রাজনৈতিক একনায়কত্ব

কমিউনিস্ট দেশসমূহে রাজনৈতিক একনায়কত্ব চরম সীমায় পৌঁছেছে, এমন কি সেখানে সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কেও রাষ্ট্রীয় হুকুম দেয়ার রেওয়াজ রয়েছে। হাঙ্গেরীয় কবি গাইউলা ইলির ভাষায় :

'যেখানে স্বৈরাচার
সেখানেই স্বৈরাচার
যেখানে স্বৈরাচার
সেখানে প্রতিটি ব্যক্তিই শৃংখলিত
পূতিগন্ধময় এই সৈরাচার তোমার
থেকেও নির্গত হয়
আর তুমি নিজেও স্বৈরাচারী হয়ে যাও।'

(স্বৈরাচার সম্পর্কে একটি কথা ১৯৫০)

রাজনৈতিক একনায়কত্ব, অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং সাংস্কৃতিক স্বৈরাচারের যমজ ভাই—যা রাজনৈতিক একনায়কত্বের পরিণতি। অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর মধ্যেই

www.pathagar.com

রাজনৈতিক কাঠামোকে একনায়কত্বে পরিণত করার প্রবণতা নিহিত। সুতরাং নিজস্ব পথে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে লেখককে চেষ্টা করে যেতে হবে এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের শক্তিকে জোরদার করে তুলতে হবে।

অর্থনৈতিক একনায়কত্ব

অর্থনৈতিক একনায়কত্বের বুনিয়াদ বিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। কম-বেশি অতীতের সকল সমাজ-ব্যবস্থাতেই অর্থনৈতিক একনায়কত্ব বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এর রূপ ফুটে উঠেছে, আবার কমিউনিস্ট সমাজ-কাঠামোতেও অন্য এক রূপে এই একনায়কত্ব প্রতিভাত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ তার উপযোগী নয় এমন মজুরী গ্রহণে বাধ্য (অবশ্য রাষ্ট্রীয় কানুন এবং ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আংশিকভাবে সংশোধিত হয়েছে)। জীবিকার জন্যে লেখককেও আয় করতে হয়, তাঁরও মজুরী প্রয়োজন। প্রকাশকের স্বেচ্ছাচারের কাছে তাঁকে অসহায়ভাবে বলি হতে হয়। তাই লেখক তাঁর পেশাকে সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যভিত্তিক করতে বাধ্য হচ্ছেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক লেখক খুব কদাচিৎই পান। শুধুমাত্র জীবননির্বাহই তাঁর জন্যে কঠিন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জনৈক ইংরেজ কবি লেখকদের এই দুর্দশার কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

There are poets that line by it
The poor fellows that line by it
Our writers can not even line by it.

কমিউনিস্ট দেশসমূহ অর্থনৈতিক একনায়কত্বের মাধ্যমেই কাজ করে, (পুঁজিবাদী দেশসমূহের মত প্রত্যক্ষভাবে নয়) এবং শ্রমিকরা বৃত্তি নির্বাচনে খুব সামান্যই স্বাধীনতা ভোগ করে। কমিউনিস্ট দেশসমূহে সাধারণ শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানো অ-কমিউনিস্ট দেশসমূহের চাইতে কঠিন। স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বের অভাব এবং কমিউনিস্ট পার্টির স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ এর কারণ।

অধিকতর সামঞ্জস্যের সঙ্গে আয় বণ্টন, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং যুক্তিসঙ্গত হারে নির্ধারণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থনৈতিক একনায়কত্ব দূর করা যায়। প্রকাশকদের নিগ্রহ থেকে লেখকদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে নয়া আইন রচনা করা যায়। অধিকতর কার্যকরীভাবে লেখকদের সাহায্য করার জন্যে সরকারকে চাপ দেওয়া উচিত। কল্যাণমূলক সকল সামাজিক কর্মসূচির এই যুক্তি সত্যিকার গণতান্ত্রিক দেশসমূহের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। যথাযথ সুযোগ

www.pathagar.com

বিধানের অভাবের জন্যে সমাজই দায়ী। ইসলামে নীতিরই অভিব্যক্তি রয়েছে হক্কুল্লাহ্ (আল্লাহর অধিকার)-এর হক্কুন্নাস (মানুষের অধিকার)-এর মধ্যে।

বৃত্তি নির্বাচনে স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায় এবং স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের জন্যে কমিউনিস্ট দেশসমূহে লেখকদের সংগ্রাম করা উচিত। পাস্তারনকের মত যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে লেখার জন্যে প্রতিটি লেখকেরই আওয়াজ তোলা প্রয়োজন। অবশ্য গোটা বিষয়টাই রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল।

সর্বহারা একনায়কত্ব

একটা অর্থনৈতিক মর্যাদা দ্বারা শাসিত মানসিকতার মধ্যেই সর্বহারা একনায়কত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। হতাশা প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রবণতার জন্ম দেয়। সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুন চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে লিখেছেন :

'কঠোর পথে গোলযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টার... পরিণতিতে সেই গোলযোগই আমাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।' (মুকাদ্দিমা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪)

সমাজের নিম্নশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক প্রবণতা ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছে। এর নজীর রাশিয়ার কমিউনিজম, ইতালীর ফ্যাসিজম, আমেরিকার ম্যাকার্থীজম, লাতিন আমেরিকার পেরোনিজম প্রভৃতি।

মানবকল্যাণমূলক সমাজ ও জন্ম পরিকল্পনা, সুপ্রজননবিদ্যা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বিরোধিতা করার একটা প্রবণতা নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিদ্যমান। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, মজদুর শ্রেণী সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিরোধিতা করেছে। তারা অনড় অটল রাজনৈতিক চিন্তাধারা পোষণ করে, মধ্যবিত্তদের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্যে মাথা ঘামায় না. তাই স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক আজাদী অস্বীকৃতিতে সাধারণতঃ তাদের মধ্যে অসন্তোষ বা হতাশা সৃষ্টি করে না।

কমিউনিস্ট স্বৈরাচার এবং তাদের অনড় সহজবোধ্য রাজনীতি নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আইজেনেকের (The Psychology of Politics, London, 1954, P.127) বিশ্লেষণ মুতাবিক মধ্যবিত্তদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর অধিকতর কঠোর মনোভাবাপন্ন এবং মধ্যবিত্তরা তাদের চেয়ে

www.pathagar.com

অধিকতর উদার ও 'কোমল ভাবাপন্ন'। এমন কি মধ্যবিত্ত কমিউনিস্টও নিম্নশ্রেণীর গণতন্ত্রীর চেয়ে অধিকতর উদার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশসমূহের জন্যে এ যেন বিপদ সংকেত। কারণ নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সহায়তায় একনায়কত্বের সমর্থকরা যদি একবার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়, তা'হলে রাজনৈতিক কাঠামোও অনিবার্যভাবেই স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করবে। তাই অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্যেই অবশেষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক আজাদী বলি দিতে হবে।

নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে অধিকতর উদার ও সহিষ্ণু করার দায়িত্ব লেখকদের। গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করতে হবে; সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং ভারসাম্য অপরিহার্য।

সামাজিক একনায়কত্ব

গোষ্ঠিতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার ফলে এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশেই সামাজিক একনায়কত্ব বিকাশ লাভ করেছে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় বিনা তর্কে অন্যদের মতবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়। গোষ্ঠিপ্রধানের আধিপত্য যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, তাকেই সাধারণতঃ ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। কঠোর যাজকতন্ত্রের মাধ্যমে প্রযুক্ত ধর্ম কিংবা ধর্ম যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মী পদ্ধতিতে প্রযুক্ত না হয়, তাহলেও একনায়কত্বের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। যাজকতন্ত্রের সঙ্গে গোষ্ঠিতন্ত্রের সাদৃশ্য বিরাজমান। (অবশ্য আমি এ-কথা বলছি ন যে, ধর্ম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।)

লেখক যুবসমাজের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেবে এবং পিতার মতই সে-সম্পর্কে উদার ভাবাপন্ন হবে। লেখক সমাজের সত্যিকার ধর্মীয় চেতনা প্রচার করবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই ধর্মীয় চেতনার সত্যিকার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবে। সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতার চিরাচরিত মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রতিযোগিতার সমন্বয় সাধনের জন্যে লেখককে অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে। আজকের দিনের পটভূমিতে সমাজে আমাদের মুল্যবোধ গ্রহণের উপরই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের গঠন নির্ভরশীল।

দলীয় একনায়কত্ব

দলীয় একনায়কত্বের রূপ স্রেফ অর্থনৈতিক নয়। কতিপয় ঘটনাপ্রবাহের পরিণতিতেই এ ধরনের একনায়কত্ব গড়ে ওঠে। দলীয় প্রবণতা এমন এক ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি করে, যার ফলে দলীয় লোক না হলে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা,

www.pathagar.com

অধিকার বা সমদর্শিতার উপযুক্ত নয় বলে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশের সংবাদপত্রের মতামত এবং রিপোর্ট এই ধরনের মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

যাঁদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ রয়েছে, তাঁদের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই এ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। সচেতন জনমত এ সংকীর্ণতা ও দলীয় রাজনীতি দূর করতে সক্ষম। দলীয় অন্ধতার (Fanaticism) বিভিন্ন রূপ রয়েছে— পুরাতন অন্ধতা বা মোল্লাবাদ, আধুনিক অন্ধতা বা চরম আধুনিকতা এবং বিপ্লবী অন্ধতা বা লাল মোল্লাবাদ।

সামাজিক পশ্চাদপদতা ও অশ্লীলতা

এও এক ধরনের সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং একনায়কত্ব। জন-সাধারণের সত্যিকার জীবনযাপন পদ্ধতি ও আচরণের মধ্যেই এর প্রকাশ। ফলে লেখক সাধারণের অশ্লীল রুচির নিকট তাঁর শৈল্পিক রূপ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

নতুন করে জীবন গঠনের তাগিদে সদ্য আজাদীপ্রাপ্ত দেশগুলোকে নতুন শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও আঙ্গিকসহ নতুন ভাষা গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণ হয়ত এটা পছন্দ করবে না। এতদসত্ত্বেও লেখককে সুন্দর ও নিপুণভাবে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। লেখককে উদারমনা হতে হবে এবং তাঁর ভাষার ধরন ও সাহিত্যের আঙ্গিককে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে সামঞ্জস্যময় করে তুলতে হবে। সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁকে সর্মালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার

অবিবেচনাপূর্ণ জনপ্রিয়তা এবং স্থূল অশ্লীলতা থেকে লেখককে দূরে সরে থাকতে হবে। তাঁকে সচেতন এবং সজাগ থাকতে হবে। ভাল গ্রন্থাগার লেখককে বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রাখতে সাহায্য করবে। লেখকদের অধিকার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

আজকের শিশুই আগামী দিনের লেখক। জীবনের সকল দিক থেকে অশিক্ষা দূর করতে হবে। প্রধানতঃ ইসলামের অনুপ্রেরণা হতে বাংলাদেশের আদর্শবাদের মৌলিক মানবিক উপাদানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারসাম্যময় শিক্ষা-পদ্ধতি কায়েম করতে হবে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে 'জিহাদের' মতই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলাম ছিল উদারতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও অন্বেষার মহান অগ্রনায়ক। রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের চাপে পরবর্তী সময়ে ইসলামের এই ভূমিকা স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ সময় এসেছে, ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধের কাঠামোতে মানবিক স্বাধীনতার ইসলামী নীতিকে পুনরায় কার্যকরী করা। ইসলামের বুনিয়াদে ভারসাম্যময় সমাজ গড়ে তোলার জন্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের স্থায়ী ও কালনির্দিষ্ট ভূমিকা সীমাবদ্ধ রূপ ও চিরন্তন সত্যের মধ্যে সীমারেখা টানতে হবে। ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং আজকের কারিগরী যুগের অন্তরদেশে তার রূপ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লেখককে আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে। আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ববোধ এবং মানবিক প্রেম তাঁর জন্যে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণের ধারণার বিপরীত বলেই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পরীক্ষা নিরীক্ষাকে বিপজ্জনক আখ্যা দান ঠিক নয়। তবে নতুন ধ্যান-ধারণা আমাদের বুনিয়াদী মূল্যবোধ এবং মানুষের মর্যাদা ও ভারসাম্যময় স্বাধীনতার পরিপন্থী হলে চলবে না।

'নূতন অন্তর্দৃষ্টির অভাবে নিষ্ঠা শক্তিহীন এবং শ্রেষ্ঠ কৌশল অর্থহীন কারণ এ শুধু যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতেই পর্যবসিত হয়। প্রতিটি নতুন এবং ভাল জিনিসকেই খেয়ালিপনা মনে হতে পারে .... তবে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খেয়ালী আওয়াজও শ্রবণ করতে হবে ..... অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে নতুন সব কিছুর নিকটই আমরা আত্মসমর্পণ করব ..... জীবনের যে কোন প্রকাশ থেকে জীবন অনেক দীর্ঘতর।' (ব্রুস্টার গিমেলিন, দি ক্রিয়েটিভ প্রসেস।)

www.pathagar.com

১৫.

শিল্পকলা ও সাহিত্যের সমালোচনা

শিল্পকলা ও সাহিত্যের সমালোচনার পথ ঘোর কণ্টকাকীর্ণ। শিল্পের সত্যিকার মূল্যায়ন সহজ নয়। 'সাহিত্যের দিন ফুরিয়ে গেছে, এ-কালে সৃষ্টিধর্মী কোন কিছুই আর সম্ভব নয়—এ দুর্দশার যুগে শিল্প-সাহিত্য নিজস্বরূপে পরিস্ফুট হতে পারে না।' এমনিধারা কত কথা ও বক্র মন্তব্যই যেন আজকের দিনের সমালোচনার ধাত বাতলে দেয়। সমকালীন সাহিত্য এমনিতেই শ্রদ্ধা বহন করে আনতে পারে না—কারণ সমকালে মননশীলতার মূল্য নিরূপণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর বিশেষ করে সব নতুন শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যখন একটা আত্মঘাতী শৌখিন নাক সিটকানো ভাব অহরহ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মাধ্যমে সাহিত্যের মূল্য নিরূপপ করতে যাওয়াও নিরর্থক। সমাজ জীবনে যে বিবর্তন চলেছে, তারই অনুরূপ, সাহিত্যেও অবিরাম ভাঙাগড়া ও ওঠানামার স্রোত বয়ে চলেছে। এ-প্রবাহে শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে সমালোচককেও আন্দোলিত হতে হয়। তার ওপর শিল্পীর মানসিক চিন্তা ও প্রকৃতি প্রায়ই অনির্ধারিত থাকে। ছন্দহারা এ সভ্যতার আবর্তে সবই গিয়ে পড়েছে ছন্নছাড়ার দলে।

সমালোচনা বিপদ এখানেই কাটে না। শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা এমনিতেই একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ। স্ব স্ব শিল্পকর্মের সমালোচনা সহ্য করার মত মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের ধাতের বাইরে। আর সমালোচনাটুকু যদি বা একটুখানি শ্লেষব্যঞ্জক বা অসঙ্গত হল, তবে তো আর কোন কথাই নেই। সমালোচক গোষ্ঠির সঙ্গে সব সম্পর্ক ও সংযোগ ছিন্ন করবার জন্যে তাঁরা উঠে-পড়ে লেগে যান। ধৈর্যের বাঁধ সামলাতে না পেরে তাঁরা একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। এর আবার আর এক উল্টো দিক আছে। মাত্রাহীন স্তুতি, স্তাবকতা ও অতিভাষণেরও ছড়াছড়ি দেখা যায়। ফলে প্রতিশ্রুতিশীল নতুন শিল্পীদের পক্ষে প্রতিভার স্বীকৃতি পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনি সার্থক শিল্পকর্মের যথাযথ সমালোচনাও একরকম অসম্ভব ব্যাপার। অহেতুক সমালোচনা বস্তুটিই হাল ফ্যাশন, যা ইতরতা ও হিংসার পর্যায়ে পড়ে—অজ্ঞতাপ্রসূত আত্মগৌরব ও নীতিহীনতা থেকে যার জন্ম।

www.pathagar.com

দলগত কোন্দল ও পক্ষপাতিত্ব এসেও বাধ সাধে সত্যিকার সমালোচনার পথে। আদর্শের দিক থেকে আপনি কোন দলের লোক সে হিসেবেই করা হবে আপনার শিল্পকর্মের বিচার । স্পর্ধা বৈ কি! আপনি যদি ধর্মীয় নীতিবোধের অনুসারী হয়ে থাকেন তবে আপনি যাই লিখুন না কেন, সমালোচকের প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা আর হেঁয়ালী আত্মম্ভরিতা আপনাকে তিলে তিলে পিষে মারবে ও আপনার লেখা নিয়ে অহেতুক ফিস্‌ফাস্ গুজ্‌গাজ্ শুরু হয়ে যাবে। এ ধরনের সমালোচনায় সর্বজ্ঞতার হাস্যকর পরিহাস ছাড়া আর কীই বা আছে। আবার ধরুন, শব্দযোজনা আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাস যদি সাধারণের থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্নতর হল তো আর রক্ষা নেই। এ-সব সমালোচকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও রীতিমত চমকে উঠতে হয়। আপনি যদি চাষী মজুরের দুর্দশার বাস্তব আলেখ্য চিত্রিত করেন বা কলা কৈবল্যের সাধক বলে পরিচিত হয়ে থাকেন কিংবা গণতন্ত্রের অনুসারী হন, তবে অমনি শত শত কণ্ঠে আওয়াজ উঠবে—'শিল্পের অপমৃত্যু, সাহিত্যের অপঘাত'। কিন্তু এত হৈ চৈ আসল শিল্পবস্তুটির বিচার না করেই; শিল্প বা সাহিত্য হিসেবে তা উৎরেছে কিনা তা না দেখেই, তার বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্য বিচার না করেই।

কেউ হয়ত বলে উঠবেন, সাহিত্যে যদি শ্রেণীসংগ্রামের চিহ্নিত না হল, তবে তা সাহিত্যের পর্যায়েই উন্নীত হতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিক গুণপনা বা শৈল্পিক উৎকর্ষের বিচার শিল্প-সাহিত্যের মানদণ্ডে হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কল্পিত এই বর্ধমান আভিজাত্য থেকে তাই সমালোচনাকে আজ রেহাই দিতে হবে।

সমালোচক হিসেবে আপনি যদি হিন্দু শিল্প-সাহিত্যে হাত দেন আর দেবদেবীর সহস্রোল্লেখ দেখে ভড়কে যান তবে আপনার আসল কাজই বাদ পড়ে যাবে। আবার এক ব্যক্তি ধর্মভাবাপন্ন বলেই তার হাতে শিল্প ফোটে না, এ-কথা যদি আপনি বলতে চান তবে তাও হবে এক ঘোরতর অন্যায়। আমাদের দেশে শেষোক্ত শিল্প সাধকদের সম্পর্কে অযথা তালগোল পাকিয়ে এই একই দোষারোপ করা হল। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণের সাধারণতঃ দুটো ব্যাখ্যা আছে। একরকম হল আপাত মোল্লাকী ব্যাখ্যা-সমস্যাটির শিল্পগত ব্যাখ্যা তো দূরের কথা শুধুমাত্র আদর্শের দিক থেকে তলিয়ে দেখবার ক্ষীণতম প্রবৃত্তিও যার মধ্যে নেই। অপরটি হল মনোজ্ঞ ও চিন্তাশীল দার্শনিক ব্যাখ্যা। এ দৃষ্টি দিয়েই ইমাম গাযযালী বলেছিলেন : 'আল্লাহ্ মানুষকে এমন করেই সৃষ্টি করেছেন যার ফলে তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অনুভূতিরূপ আগুনের পেয়ালা। সংগীত ও সুষম ভঙ্গীমা তাকে আন্দোলিত করে, আর আনন্দ সরোবরে, মনের মাধুরীর মধ্যে যেন সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সুষম ভঙ্গীগুলো উচ্চমার্গের নিরূপম সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এর

www.pathagar.com

মাধ্যমেই মানুষ এক অব্যক্ত জগতের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করে– তার মনে এমন সব আবেগ অনুভূতি লাগে, যা ব্যক্ত করবার শক্তি তার নেই। প্রথম দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারায় রয়েছে অতীতদিনের হুবহু প্রবর্তনার চিন্তাহীন অপপ্রয়াস। আর দ্বিতীয়টিতে যে নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রেরণাই শুধু আছে তা নয়, নতুন পরিবেশে ও অভিনব সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জীবন দর্শনকে বিভিন্ন সমঝোতায় ঢেলে সাজাবারও রয়েছে অদম্য স্পৃহা তার মধ্যে। এ স্বচ্ছ দৃষ্টি ও চিন্তাকেই ক্যান্টনওয়েল স্মিথ তাঁর 'মডার্ন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া'তে প্রগতিশীল বলে আখ্যাত করেছেন। কারণ তার মধ্যে নিহিত আছে সক্রিয়, জীবন্ত ও উদ্দীপনাময় ভাবসম্পদ ও ভবিষ্যৎ সমাজের অনাগত সম্ভাবনা।

এই গতিশীল মনোভাবকে যদি সমালোচক পুনরুত্থানবাদ বা রিভাই-ভ্যালিজমের সঙ্গে এক বলে মনে করেন, তবে তা হবে নিছক বিকৃত মনের প্রলাপ। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই হ্যাভলক এলিস বলেন : 'সুউচ্চ মার্গে ধর্ম সহজ সরল ও সুন্দর। ইসলামের পয়গম্বরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন জীবন সায়াহ্নে ফেলে আসা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন, 'আমি পৃথিবীকে ভালবাসি—নারী ও সুগন্ধি জিনিসের জন্যেই।'

('মরালস, ম্যানারস এ্যান্ড মেন', থিংকার্স, লন্ডন, ১৯৪৬, ৯৫ পৃষ্ঠা।) সত্যিকার জীবন্ত ধর্ম জীবনের মৌল প্রবৃত্তিকে ধুয়ে মুছে সরিয়ে ফেলতে চায় না— তার দু'কূল ছাপানো গতিবেগ সুমিত ও প্রশমিত করে মাত্র। এক্ষেত্রে সংগীত ও সুকুমার শিল্প অস্পৃশ্য নয়, সাহিত্য নয় দুর্নীতির পর্যায়ে। নৈরাজ্যবাদে কবলিত চিন্তাধারার যুগে কোন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ত বা বলে ফেলতে পারেন যে, সাহিত্য দুর্নীতির বাহক বা কোন আধুনিকপন্থী হয়ত বলতে পারেন যে, ধর্ম প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর । তাই এক্ষেত্রে চিন্তারাজ্যে বিন্যাস সাধনের প্রচেষ্টার মাঝে, নতুন করে জীবনধারা ও দর্শনের তাল মিলিয়ে সুর দেবার সাধনায় নিছক ক্ষ্যাপামী বা স্তাবকতা প্রত্যক্ষ করলে তা'হবে নিতান্ত ছেলেমানুষী। বিশেষ করে ক্ষ্যাপামী মনে করাটা যদি এ কারণেই হয়ে থাকে যে, আপনার জীবনাদর্শ ধর্মীয় বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রেই হোক আর প্রগতির ব্যাপারেই হোক, স্ব প্রণোদিত আত্মশুচিতা অপরিহার্য; পিউরিটানী মনোভাব ভয়ানক মারত্মক।

গোঁড়া ধর্মপন্থীদের অনেকে গোটা শিল্পকেই পঙ্কিল পাপ-কালিমার মাঝে ফেলে দিয়েছেন। শৈল্পিক সৌকুমার্য ও সৌন্দর্যের বিচার করতে তাঁরা এতখানি অক্ষমতা দেখিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে অজ্ঞান সামর্থ্যহীনতার পর্যায়ে পড়ে। তাঁরা মানব-প্রকৃতির দোষত্রুটি, ভুল-চুক সমূলে উৎখাত করতে চান। আত্মপুণ্যময়তার মাঝে তাঁরা এমনই নিমগ্ন থেকে যান যে, তাঁরা প্রচার করে বসেন যে, কবিতা ও

www.pathagar.com

সাহিত্য প্রতিনিয়ত সৎব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত। এক্ষেত্রে সাহিত্যের যেটুকু মূল্য আছে তা হল দুষ্ট বদলোকের প্রশ্রয় দেয়া ও আহাম্মকদের খুশী করা। কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে মানব-প্রকৃতির বৃত্তিগুলোর স্ফুরণের জন্যে শিল্প-সাহিত্যের মূল্য দর্শন বা ইতিহাসের চাইতে অনেক বেশি। সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষ জাতিগঠনেও সমধিক গুরুত্ববহ। নিছক অনাবিল আনন্দ দানের খাতিরে হলেও, কেবল সে কারণেই শিল্প-সাহিত্যের একক ভূমিকা রয়েছে, যা নিজস্ব বিশিষ্টতায় দীপ্তিমান। মানুষের মনের পেলব নিভৃতে আঘাত করে বা আবেদন জানিয়ে, শিল্প মানুষকে সত্য, সুন্দর মঙ্গলের পথে চালিত করে আর মানুষের জন্যে সত্যিকার সহানুভূতি প্রকাশ করে মানব স্বাধীনতার পথ খুলে দেয়। শিক্ষা দেবার ঔদ্ধত্য থেকে দূরে রয়েছে বলেই শিল্প-সাহিত্যের শিল্প হয়ে ওঠে একান্তভাবে আত্মগত ও নিবিড়। আর তার মধ্যে মানুষের জীবন দর্শনের সত্যিকার ছাপ থাকবেই। থাকাটা স্বাভাবিক । আপাতঃদৃষ্টিতে কোন থিওরী প্রমাণ করার প্রচেষ্টা শিল্পকলায় থাকে না, কিন্তু কোনটি শিল্পীর মনের অনুরূপ আর কোনটি নয় এ প্রশ্নের জবাব স্বাভাবিকভাবেই শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয়।

দার্শনিক চিন্তার কথা ও শিল্পসম্পর্কীয় সাধারণ দর্শনের প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র। শিল্পের দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা তার বিষয়বস্তু। সে দিক থেকে কেউ যদি সব শিল্পকলাকেই অগ্রাহ্য করতে চান তবে দার্শনিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন সত্যটুকু খুলে ধরবার প্রয়োজন এসে পড়ে সর্বাগ্রে। স্বীয় দর্শনের আলোকে ব্যাপারটি সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হয়। যিনি বলেন বোঝানোর দরকার নেই, তাঁর সঙ্গে আমরা একমত নই। অবশ্য এ কথা সত্যি যে, শিক্ষার বিস্তার হলে শিল্পদর্শন সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কিছুটা পাল্টে যাবে. কিন্তু কেবল সাধারণ শিক্ষা এ জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়।

সুকুমার শিল্পের প্রসারে চিন্তাবিন্যাস ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সাহিত্যে নিছক প্রচার-প্রয়াস এক মহা দুর্যোগ। ব্যক্তিমনের স্বতঃ-স্ফুরণ সাহিত্যে প্রতিভাত হয়। ব্যক্তির চিন্তাধারা, মানস-মনন ধ্যান-ধারণা যে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে সাহিত্যে রূপায়িত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

শিল্প সাহিত্যকে ব্যক্তিমনের জীবনধারার আশ্রয়ী হতে হবে। কিন্তু সাহিত্য যদি নিছক প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার বাহন হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবার অনুপযুক্ত। সাহিত্যে প্রচার-সর্বস্বতার ফলে শিল্পকলা শুধু ব্যর্থ আর শিল্পমানস ও শিল্পসাধনা ব্যাহত হয় তাই নয়, সত্যের পদস্খলনের আশংকা ঘটে।

www.pathagar.com

শিল্পীর ব্যক্তিমানসের নিভৃততম প্রদেশের অনুভূতি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আকারে ইঙ্গিতে নিজস্ব প্রকাশ-সাধনায় রূপায়িত, স্বতন্ত্র চিহ্নিত ও বিশিষ্ট প্রতিভায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে।

জীবন-প্রশ্নের স্রোতে শিল্পীমন যদি একেবারে ভেসে না গিয়ে থাকে, তাতে কোন দোষ নেই। তবে সমালোচকের আপন বিশেষ দল থেকে ও বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন বলেই, 'প্রচার অখ্যাতি' সে শিল্পীর ওপরে আরোপ করা নিতান্ত অসমীচীন হবে।

শিল্পকলার সার্থক সমালোচকের সুকুমার সংযোগ, সহানুভূতি আর চোখজাগা মন ও মনজাগা চোখ না থাকলে সে সমালোচনা কৌণিকতার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

সৃষ্টিধর্ম শিল্পকলার মাধ্যমে যে শাশ্বত, চিরন্তন ও সর্বপ্রসারী মূল্যবোধ ও শিল্পনিষ্ঠা আছে, তা আবেগ-অনুভূতি ও দিল-দরদ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করবার স্পৃহা মূর্ত হয়ে উঠবে সত্যিকার সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে। খাঁটি সমালোচক শিল্পীর সঙ্গে চিত্তযোগ প্রত্যক্ষ করবেন।

বাইরে থেকে অপরজন মনে করলে শিল্পীকে সমক্যরূপে চিনতে পারা যায় না। তাঁকে চিনতে-জানতে হলে সাহিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়—শিল্পীর অঙ্গনে বা সাহিত্যের আসরে নৃত্য না করলে বা গান না গাইলেও অন্ততঃ রস-সংগ্রহ করার মত আনন্দরসঘন মন থাকা চাই।

সভ্যভাষণ কিঞ্চিৎ অপ্রিয় হলেও সমালোচক পিছ-পা হবেন না। কিন্তু অপ্রিয় কোন্দল সৃষ্টি যেন তাঁকে অহেতুক সমালোচনার পথে না নিয়ে যায়। কারণ শিল্পের মৌলিক গুণ তো নিছক বাদানুবাদ ও কোন্দল সৃষ্টিতে নয়। আত্মগত অনুভূতির গভীরে থাকে যে একাগ্রতা, তাকে স্বচ্ছ আঙ্গিকে তুলে ধরাই শিল্পীর কাজ। এ-কথা মনে রেখেই সমালোচক তাঁর লেখনী ধারণ করবেন।

'ভাল লেগেছে' বা 'দূর কিচ্ছু হয় নি' এমনিধারা মন্তব্য অশিক্ষিত মনের প্রলাপ বই আর কিছু নয়।

সমালোচনার সময়ে সমালোচক তাঁর নিজের মন ও তাঁর সামাজিক মন ও চেতনার প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেন। শত চেষ্টা করেও তিনি একেবারে এগুলোর উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। এদিক দিয়ে দেখলে সমালোচনা মাত্রই সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু শিল্পীর মত সমালোচককেও রস-পিপাসু মন নিয়ে বিশ্ব-সৌন্দর্য ও বাস্তব সত্যের অফুরন্ত উৎস থেকে রসদ যোগাড় করতে হয়। তাঁকে যুগ, সময় ও রুচির চাহিদা পার হয়ে মধ্যম পন্থাটি বেছে নিতে হয়।

সত্যিকারভাবে রসসৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করে শিল্পবস্তুর বিচার করতে হলে এমন এক ধরনের নিবিড় মন-সংযোগের প্রয়োজন, যা শুধু শান্ত সমাহিত শিল্পদৃষ্টির

www.pathagar.com

মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। সমালোচক শিল্প-সৃষ্টির নব নব আস্বাদনকে স্বীয় অনুভূতির জারকরসে একান্তরূপে আত্মগত করে নেন। শিল্পীর যে বিশিষ্ট শিল্পসাধক মনটিতে শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, তাকে আগেভাগে চিনতে পারা চাই। সমালোচনারও একটা নিজস্ব শিল্প আছে আর তা শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও সংঘাত থেকে জন্ম নেয়।

শিল্পবস্তু যেমন আনন্দ দিয়ে আমাদের কাছে টানতে পারে তেমনি সংঘাতের পথে ও শিল্পের সাথে রসপিপাসু মনের মিলন ঘটতে পারে। তাই নিছক শিল্প নিয়ে শিল্পীমনের সম্পূর্ণ বিচার সম্ভব হয় না। শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় শিল্পীমনের গভীরতম অনুভূতিসঞ্জাত যে ঐশ্বর্যের ও শিল্পীমনের খোঁজ পাওয়া গেল, তা যেন শেষটায় শিল্পজাত বিচার ও দার্শনিক মূল্যায়নে ব্যবহৃত হবার দাবী করতে পারে। কোন্ মূল্য বা দৃষ্টিকোণ নিয়ে শিল্পী কথা, ছবি ও আঙ্গিকের অবতারণা করেছেন ও ব্যবহার করেছেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

শিল্পকর্মে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট ও অনবদ্য সত্তা রূপায়ণ লাভ করে। সে-সত্তাই শিল্পকে জীবন্ত করে তোলে ও তারই ফলে শিল্প শাশ্বতের অমর জগতে উঠতে পারে। সে শিল্পমান সমালোচক যুগের রুচিমাফিক বুদ্ধি অনুযায়ী সুপরি ব্যক্ত করবেন। অতঃপর তিনি চিরন্তনের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ব সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্প-বস্তুর আত্মীয়তা প্রত্যক্ষ করবেন।

শিল্পবস্তু ও রসপিপাসু মনের আবেদন, অনুভূতি ও সংঘাত সমালোচক রুচিসম্মত ও সুসংযত শিল্প দৃষ্টির মাধ্যমে দেখতে প্রয়াস পাবেন। সমালোচনার বিশেষ দৃষ্টিকোণ অবশ্য সমালোচকের নিজস্ব মানসিক প্রবণতায় নির্ভর করে।

যুগে যুগে সমালোচনার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয়। একই শিল্পবস্তু নতুন রূপে ও রঙে-রসে ও ঢঙে প্রতিফলিত হতে পারে। ফলে আজ যে শিল্পের মূল্য নিতান্ত অল্প কাল তা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। আবার কখনও কখনও যা শিল্পমূল্যে অনুপম বলে প্রখ্যাত হয়েছে, আরেক যুগে তা হয়ত বিচারে নিতান্ত সাধারণ পর্যায়ে বলেও বিবেচিত হতে পারে।

কার্ল গুস্তাভ জং 'সাইকলজি এ্যান্ড লিটারেচার শীর্ষক বইতে বলেছিলেন : 'মহিমান্বিত শিল্পবস্তু স্বপ্নের শামিল—তা যতই আপাত প্রকাশী হোক না কেন। শিল্পে নিজস্ব শিল্পীসুলভ ব্যাখ্যার সবটুকু একবারে ব্যক্ত হয় না; কিছু না কিছু গোপনীয় থেকেই যায়। কারণ তার মধ্যে নিছক ব্যক্তির ভূমিকার চাইতে ব্যক্তিমানসের ভূমিকাই অধিক প্রাধান্য লাভ করে।'

সাহিত্যও আবার তিন প্রকারের—জ্ঞানমূলক সাহিত্য, শক্তি ও শিল্পমূলক সাহিত্য এবং ইতিহাস ও দর্শনমূলক সাহিত্য। বিচিত্র সাহিত্যের সমালোচনাও

www.pathagar.com

বিভিন্ন হতে বাধ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান, শক্তিমত্তা, শিল্প ও ইতিহাসের চত্বরে যুগে যুগে যে আবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হয় তার ফলেই শিল্প ও সাহিত্যের সমালোচনা ও সাহিত্যের সমালোচনাও বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে।

কার্যতঃ দেখা যায় যে, সমালোচককে প্রায়ই জনমতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হয়। সমকালীন ভাবধারা চিত্তবৃত্তির আন্দোলন তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সাধারণ লোকে কেবল সে শিল্পবস্তুই বুঝতে পারে যার সম্বন্ধে তার একটা স্বাভাবিক সংযোগ ও পরিচয় আছে। নতুন আনকোরা জিনিস তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে বা তার প্রশ্নের বহর বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে বস্তু তার মনে খটকা লাগায় তা হৃদয়ঙ্গম করার মত মানসিক প্রস্তুতি বা ক্ষমতা সাধারণ রসপিপাসু মনে থাকে না। সমালোচককে এ-দিকটাতেও দৃষ্টি দিতে হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদেরও দেশকালের মনের মুকুর হবার সাধ নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যেই প্রচলিত বস্তু-উপকরণ ও আঙ্গিককেই তাঁকে বহন করতে হয়।

অবশ্য সাহিত্যিক পুরাতনের চৌকাঠ পেরিয়ে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বা শব্দের ব্যবহারে নতুন সংমিশ্রণ-প্রণালীর অবতারণা করতে পারেন ও শব্দ-চয়নে অধিক বাস্তবধর্মী হতে পারেন। আর প্রচলিত শব্দের সার্থক ব্যবহার চালু করে নতুন শৈল্পিক ও সাহিত্যিক আবহ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তা যেন নিছক ফোটোগ্রাফী বা প্রতিবিম্বনে পর্যবসিত না হয়। সার্থক শিল্প সাহিত্য যেমন একাধারে শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হবে, তেমনি শিল্পী মনের সুস্পষ্ট ছাপ তাতে রূপ পাওয়া চাই। আর তা যেন সাধারণের অবোধ্য বা দুর্বোধ্য হয়ে না ওঠে। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, শিল্প-সাহিত্যে নতুন রীতি ও আঙ্গিক প্রবর্তনের পন্থাটি যতই সুসংযত ও সুঠাম হোক না কেন, জনমতের দাপটে নতুন শিল্পী-সাহিত্যিককে অনেক সময়েই যশখ্যাতির দুয়ারে পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে।

বিশেষ করে যা পুরোনো তা-ই ভাল আর যা নতুন তা-ই খারাপ, এটা যে সব দেশের মানসিক কাঠামোর মোদ্দা কথা।

বুদ্ধিদীপ্ত, অনুভূতিপ্রবণ, সদাজাগ্রত ও প্রভাবশীল পাঠক-সমাজের অস্তিত্ব ও উন্নত রুচি শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরেই শিল্পের সমকালীন প্রভাব নির্ভর করে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই সমালোচক নতুন ইতিহাস তৈরির কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

সুবিপুল শিল্পকর্মে এমন অনেক উপকরণ থাকতে পারে যা গণমনে কোন সাড়া জাগায় না। কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল ও শাশ্বতের গুণ-চিহ্নিত শিল্পবস্তুর অভিনবত্ব সাধারণ রসপিপাসুদের মনে দাগ কাটতে বাধ্য। হাত মিষ্টি হলে শিল্পী যে কোন উপকরণ

www.pathagar.com

দিয়েই সোনা ফলাতে পারেন। নিপুণ শিল্পীকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যে মুন্সিয়ানা থাকে তাতে শিল্পবস্তু সহজেই খোলে। বাংলা প্রবন্ধ সমালোচনার ক্ষেত্রে এ দিক দিয়ে এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। 'ক্ষিপ্রতা' নামক বস্তুটি বাংলা গদ্য সাহিত্যে নেই। আর কোন প্রাবন্ধিক বা ঔপন্যাসিক যদি ভাষাকে কিছুটা চলমান করবার প্রচেষ্টা চালালেন তো আর রক্ষা নেই। সরস গল্প পাঠ করবার একটা শৌখিন অভ্যাস সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ পাঠক প্রবন্ধগুলো বাদ দিয়েই পত্র-পত্রিকার সদ্ব্যবহার করেন। প্রবন্ধ পাঠকের সংখ্যা এমনিতেই সামান্য—তার উপর যদি আবার কোন প্রবন্ধকার 'মৌলিক কথাগুলো মৌলিকভাবে' বলার চেষ্টা করে থাকেন, তবে তো আর কোন কথাই নেই। বিশেষ করে যদি চলতি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হয়ে থাকে, তবে তা আমাদের দেশের পাঠকের মনে নিদারুণ আঘাত হানে। সে আঘাত সামলে নিয়ে বিষয়বস্তুটি সম্যক বুঝে নেবার মত ধৈর্য্য ও মানসিক কাঠামো আমাদের এখনও তৈরী হয় নি। আরবি, ফারসী, ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় যে কথা হয়ত একটি বাক্যে প্রকাশ করা যায়, বাংলায় কখনও হয়ত বা তা প্রকাশ করতে অতিরিক্ত বাক্যের প্রয়োজন হয়। এ-ক্ষেত্রে কোন লেখক যদি একটি বাক্যেই তা প্রকাশ করে ফেলেন, তবে বাঙালি পাঠক ভারী মনঃক্ষুণ্ন হন। কিন্তু এ কথা তো স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ভাষাকে আরও অধিক পরিমাণে চলিষ্ণু ও গতিমান করতে হলে বিদেশী শব্দ ও ভঙ্গী মানিয়ে শানিয়ে ব্যবহার করতেই হবে। দেখতে হবে যাতে লেখকের আঙ্গিক সবল ও রচনাভঙ্গী সহজবোধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজকেও বেশ কিছুটা শিক্ষিত ও উন্নতমনা হওয়া চাই।

সমালোচনা বস্তুটি যেমন শিল্পীর মনকে অপেক্ষাকৃত পরিণত-বুদ্ধি করে তোলে, তেমনি নব নব চিন্তা ও ভাব আস্বাদনে সাধারণ মানুষের মনও সমৃদ্ধ থাকা চাই। শুধুমাত্র সাহিত্য-সভার হিড়িক সৃষ্টি না করে সুকুমার মন দিয়ে নয়া সৃষ্টিকর্মে হাত দিতে হবে—বই কেনা, পড়া ও চিন্তা করা আমাদের অভ্যাসাধীন করতে হবে।

একটু সংস্কৃতঘেঁষা ভাষা ও একটু আরবী-ফারসী বা ইংরাজীর ব্যবহার থাকলেই তা দেখে নাক সিটকানো নিতান্ত অযৌক্তিক।

আসলে অবিমিশ্র পবিত্র ভাষা বলে দুনিয়াতে কোন পদার্থের অস্তিত্ব নেই। বাংলা ভাষার ইতিহাস পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষার মত মিশ্র ও শংকর ভাষা বড় একটা চোখে পড়ে না। তাতে কিন্তু আমাদের ভাষা দুর্বল হয় নি, বরং সবল ও সুন্দর হয়েছে।

নিঃস্বার্থ মন নিয়ে চিন্তার জগতে ও সৃষ্টির রাজ্যে যা কিছু সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর তাকে উদঘাটন করতে হবে। কোন কুসংস্কার যেন এ-কাজে বাধ না সাধে।

www.pathagar.com

সাহিত্যকে আজ নিছক শৌখিন পর্যায় থেকে ও শ্লোগানসর্বস্বতা থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনের অনুভূতি, বাস্তব সমস্যা ও বুদ্ধিদীপ্ত উদ্দীপনার সঙ্গে সাবলীলভাবে সংযুক্ত করে আনতে হবে। ভাষা অহেতুক ঘোরপ্যাঁচ ও রগ চটকানো থেকে যত দূরে থাকতে পারে ততই মঙ্গল। শিল্প ও সমাজ উভয় দিক থেকেই সমালোচকের দায়িত্ব অপরিসীম। সমালোচকই কবি শিল্পীদেরকে আঙ্গিক ও উপকরণের ধরন ধারণ সম্পর্কে সচেতন করে দেন, তাঁদেরকে ধৈর্য্য, স্থৈর্য ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাওয়ার উদ্দীপনা যোগান।

অবশ্য শিল্পীর পক্ষে অতিরিক্ত সমালোচনা চৈতন্য সৃষ্টির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। শুধু সমালোচনা সম্পর্কে বলি কেন, নিজের সম্পর্কে অতি-চৈতন্য শিল্পীমনের ইতি টেনে দেয়। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে অনিশ্চয়তার সমুদ্রে শিল্পীর হাবুডুবু অবস্থা হয়। আবার সমালোচনার ক্ষেত্রে সমালোচক যদি ছক-কাটা পদ্ধতি ও গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে নবাগতদের সম্পর্কে নিছক অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তবে নব শিল্পের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ইতর রসিকতার কথা বাদ দিয়েই বলা যায়, সমালোচনার ক্ষেত্রে যদি বা হাস্যরস ও শ্লেষের দরকার হয়েই পড়ে, তাতে যেন নিষ্ঠুর বিরূপের ছোঁয়াচ না লাগে।

সমালোচকের মনের ওপর এ দিকটা অনেকাংশেই নির্ভর করে। পূর্বে বলেছি, শিল্পবস্তু বিভিন্নকালে ও পরিবেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ বৈজ্ঞানিক যুগে সাহিত্যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির প্রয়োগ করা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আশঙ্কা এই যে, অতি-বৈজ্ঞানিকতা ও বৈজ্ঞানিক কাঠিন্য শিল্পগত পেলবতা ও সৌকুমার্যের অবলুপ্তি ঘটাতে পারে। নিছক বিজ্ঞানের মাধ্যমে শিল্পের যথার্থ বিচার ও মূল্যায়ন অসম্ভব ব্যাপার। তাই শিল্প ও শিল্পী মনের সঙ্গে সমালোচকের নিবিড় আত্মযোগ রাখাটা হবে সমালোচকের সবচাইতে বড় গুণ।

সমালোচক দেখবেন যেন শিল্পীর মনে অনর্থক বেদনার উদ্রেক করা না হয়। সাহিত্যিক ও শিল্পগত উৎকর্ষের কথা চিন্তা করে, সৃষ্টিশীলতার খাতিরে সমালোচককে এ-সংযম আয়ত্ত করতেই হবে।

'সমালোচনার জন্যে সমালোচনা'—এমনিধারা মনোবৃত্তি থেকেও তাঁকে দূরে থাকতে হবে। শিল্পী ও সমালোচক উভয়েরই একটা মনন ও জীবন-দৃষ্টি থাকে। আর সে পাথেয় সম্বল করেই তাঁদের চলতে হয়। সে দৃষ্টি সমালোচনা সম্পর্কে শিল্পী-সচেতন হোন আর না হোন, তা'ই তাঁকে চালনা করে নিয়ে চলে তাঁর অজানতেই। অতি চৈতন্যের কথা বা সাইনবোর্ড ঝুলানোর কথা না হয় না'ই

www.pathagar.com

বললাম, জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও শান্ত সুমিত ধারণা বিদ্যমান না থাকলে শিল্পকর্মে অহেতুক মানসিক দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধী পীড়ন রেখায়িত হয়। জীবনবোধের অনির্বাণ আকুলতা থেকে দীপ্তিমান রশ্মি এসে পড়বে সার্থক শিল্পকর্মে। বিচ্ছিন্ন খেয়াল-খুশী মাফিক জীবন বৈচিত্র্যের উদঘাটন, অপ্রশান্ত চঞ্চল দৃষ্টিতে মহৎ শিল্প সৃষ্টি বা সাহিত্য রচিত হয় না।

বৈচিত্র্যের মাঝেও চাই সংযোগের পথ আর ঐক্যের মাঝে বৈচিত্র্যের অনুভূতি। আঙ্গিকসর্বস্বতা থেকেও সমালোচককে দূরে থাকতে হবে। কোন কোন সাহিত্যিক সমালোচকদের মত 'pattern tracing' নিয়ে যেতে থাকলে যান্ত্রিক পদ্ধতির মাঝেই শিল্পের প্রাণবস্তু হারিয়ে যায়।

মানস-প্রকৃতি সঠিকভাবে বিন্যস্ত না হলে, সত্যনিষ্ঠায় তীব্র প্রাণশক্তি জাগে না। শিল্পীর দিক থেকে শিল্পসৃষ্টির সব কারুকার্যই ব্যর্থ হয়। অতীত দিনে শিল্প রোমান্টিক গুণবিশিষ্ট ছিল, তা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নয়। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই নতুন গোঁড়া'মী দূর করতে হবে। বিজ্ঞানের জ্ঞান কম থাকলেও শিল্পকর্মের প্রসারে তা মোটেই বাধা হয় না। যে কোন ধরনের জীবনদৃষ্টিই হোক না কেন, তা যদি জীবন্ত ও গতিশীল হয় তবে সহজ মনুষ্যত্বের দৃষ্টি তাতে থাকবেই। আর সুন্দর শিল্প সৃষ্টিতে মানবিকতার প্রভাব অনস্বীকার্য। শিল্প ও সাহিত্যকে সমাজ থেকেই মালমশলা সংগ্রহ করতে হয়। জীবনের অন্তহীন বিস্ময়, চিরনতুন জিজ্ঞাসা, অনুচ্চারিত রহস্যই সাহিত্যে নব নব রূপে রূপায়িত হয়। কিন্তু সাহিত্য যদি অতিমাত্রায় সমাজপ্রবণ হয়ে পড়ে তবে শিল্পকর্ম ব্যাহত হতে পারে ও সার্থক শিল্প বা সাহিত্যের সৃষ্টি কোন দিনই সম্ভব হয় না। সত্যিকার শিল্পে বস্তু ও মানবাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। এক-একটি বিশিষ্ট পরিবেশে শিল্পীর আংশিক বা সমগ্র সত্তাটি শিল্পকর্মে ধরা পড়ে। সামনের স্থূল জিনিস ছাড়া যে আর কিছু বুঝতে চায় না—সে শিল্পী হোক বা সমালোচক হোক ক্ষমার অযোগ্য, প্রকৃত সমালোচককে এ অবস্থা ফেরানোর জন্যে সাধনা করতে হবে। আর এ ব্যাপারে সমালোচকের দায়িত্বও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে বিষয়বস্তু বা উপকরণ ও শিল্পবস্তু আঙ্গিক ইত্যাদি এ-দুটো দিক থাকে। প্রত্যেক শিল্পবস্তুকে সমাজ থেকেই তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। আর শিল্পী চলতি আঙ্গিক অনুসরণ করুন আর না করুন নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ শিল্পকর্মে এসে পড়বেই। যে সামাজিক অবস্থা বা উপযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য বা শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল কালে তা বিস্মৃত হতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালের মূল্যবোধ দিয়েই সাহিত্যের বিচার হয়ে থাকে। সমালোচনার নিরংকুশ সাধারণ মাপকাঠি বা নিয়ম নেই। তবু এ কথা বলা যায় যে, শিল্পীর সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পবস্তুর বিচার করা উচিত। এজন্যে যেমন শিল্পবস্তুর চিরন্তন দিকটাকে কিছুটা আলাদা করে রাখতে হয় তেমনি তার সামাজিক মূল্য যাচাই করারও প্রয়োজন হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। চিত্তবিনোদন যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গুণ এ কথা স্বীকার করি। নিছক পরীর গল্প বা এমনিধারা কোন কিছুর অবতারণা করে আমোদ দেওয়া সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হতে পারে না। সমালোচককে প্রকাশ ও শিল্পগত সমালোচনা ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কীয় আলোচনাকে একীভূত করতে হয়। এ ব্যাপারে প্রকাশভঙ্গী ও রসানুভূতি জাগ্রত করবার শক্তির ওপর অযথা অধিক মূল্য দেয়া ঠিক হবে না। জীবনের তাৎপর্যই প্রতিভাত হয় শিল্পে। শিল্পকলাই জীবন-প্রাচুর্যের উপায়। তবে শিল্প স্বয়ং জীবন-প্রাচুর্য বহন করে কি না সে বিচারসাপেক্ষ। অতিকথনের কথা ছেড়ে দিয়ে বলা যায়, সমাজ চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসার সমস্যাটি শিল্প সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যেতে পারে না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে শিল্পীর বলিষ্ঠ চেতনা ও মানুষের প্রতি গভীরতর সংবেদন থাকবেই। কিন্তু এ যেন তাঁর প্রধান কাজ না হয়ে পড়ে। শিল্পগত বা সাহিত্যিক প্রকাশের পেছনে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা দর্শন থাকতে বাধ্য। সাহিত্য যেমন নিছক সাময়িকত্ব কাটিয়ে শাশ্বতের পর্যায়ে উন্নীত হবে, তেমনি নিছক প্রোপাগাণ্ডার স্তর পেরিয়ে জীবনের জীবন্ত ছবি এর মধ্যে রূপ পাবে। ব্যক্তিগত আনন্দের সাথে সামাজিক কল্যাণ এ পথেই সম্ভব হতে পারে। এমনও হতে পারে যেখানে কোন এক ব্যক্তির কবিতা হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ভালমন্দ ধরবার ক্ষমতা নেই। এমনিভাবে যখন সাহিত্যে ভাষায় শক্তিমত্তার প্রাধান্য বেড়ে চলে তখন শোভনতা, শালীনতা ও সুবিবেচনা পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। স্বভাবতঃই মানুষ জীবন-ক্ষেত্রের প্রকৃত ও সুপরিচ্ছন্ন সাফল্যের মাপকাঠিও জানতে চায়। জৈবিক সত্তা এ সামাজিক সত্তাকে চিনতে আকুলি-বিকুলি করে।

এ-কথা ভেবেই তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'সাহিত্য থেকে রাজনীতি ও সামাজিক নিয়মকানুনের আলোচনা বাদ দেয়ার অর্থ হলো, তার পটভূমি, স্থান ও সময়কে বাদ দেয়া। কোন মহান শিল্প এ পরিবেশে নির্মিত হতে পারে না। এ যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁর সাহিত্যের এলাকা বাড়াতে ও তাকে নবজীবন দান করতে অনিচ্ছুক।'

আবার কেবলমাত্র শিল্পকে উপভোগ করতেও মানুষের মন পিপাসার্ত। জৈবিক সত্তা ও সামাজিক সত্তার পারস্পরিক সংঘাতের কোন ছক-কাটা থিওরী উদঘাটন শিল্পের বিষয়বস্তু নয়—তাতে ব্যক্তিমনের ভূমিকা, আন্তরিকতা ও শিল্পনিষ্ঠা ব্যাহত হতে পারে।

শিল্প-সাহিত্যে কলাকৌশলপন্থীরা নিছক শিল্পগত দষ্টিকোণ ও মূল্যমান প্রয়োগ করতে চান। তাঁরা বলেন, কতগুলো বিশেষ ব্যক্তির জন্যে শিল্পের দ্বার উন্মোচিত, অন্য কারুর এর ত্রিসীমানায় আনাগোনা করার অধিকার নেই।

www.pathagar.com

মতবাদ বা দর্শন হোক না কেন তা যেন হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে, জীবন যেন শেষটায় ষোলকলায় পূর্ণ হতে পারে।

কিন্তু নিছক আঙ্গিক ঔজ্জ্বল্য শিল্পীকে তাঁর সামাজিক দায়িত্বের কথা ভোলাতে পারে না। আনন্দ পরিবেশন যে শিল্পের অন্যতম প্রধান আবেদন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ নিরপেক্ষ শিল্পের আবেদনও সীমায়িত।

সমাজ বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার মূল্য সাহিত্যে ততটুকুই যা বাস্তব ও বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রেরণা থেকে উদ্ভূত। এজন্যে সমালোচকের বস্তুনিষ্ঠ ক্ষুরধার দৃষ্টি ও সক্রিয় অনুভূতিপ্রবণ মন থাকা চাই।

সত্যিকার সমালোচক ভালভাবেই জানেন তাঁর জ্ঞানের সীমানা ও পরিধি কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়নে সমাজ-বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও ইতিহাস জ্ঞানের অবদান মোটেই কম নয়। শিল্প-সাহিত্যে অতি রোমান্টিক ও সাময়িক দিকগুলো বাদ দিলে একটা সর্বজনবোধ্য শিল্প মূল্য বা চিরন্তনত্ব ফুটে ওঠে যা সব যুগে ও সব কালেই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে পারে।

নিতান্ত গোষ্ঠিগত আনুগত্য পেরিয়ে শিল্প যখন ব্যক্তিতে ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে গিয়ে পৌছায় তখন শিল্পের স্ফুরণ দ্রুতায়িত হয়—জীবনধারা ও জীবন-দৃষ্টি গভীর একাত্মভূতিতে সমৃদ্ধ হয়। স্বীয় জীবনবোধ সম্পর্কে আত্মপরিচয় লাভ করবার পর দরদ ও বিশ্বস্ততার সাথে শিল্পী ও সমালোচক উভয়কেই কাজে নামতে হয়। কেবল পুরাতনের জাবর না কেটে বর্তমান ও আগামীর সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে অতীতকে সঙ্গে নিয়ে সুস্থ ও নমনীয়তার গুণে সমৃদ্ধ গভীর আবেগে সামনের পানে অগ্রসর হতে হয়। এ গভীর পরিবর্তনের যুগ শিল্পী সাহিত্যিক কমবেশি বিদ্রোহীমনা ও শান্তিভ্রষ্ট মানুষের মনে মহিমা, হৃদয়ের ঐশ্বর্য চিরন্তন, অনুদ্ধত ও পুষ্ট। যুগে যুগে অমরত্বের পীযুষধারায় তা অভিষিক্ত। ঘৃণা সন্দেহ ও অবজ্ঞা যাই আসুক না কেন, শিল্পীমন তাতে হতাশ হয় না। গভীর রহস্যে ভরা ডগমগ মন নিয়ে বেদনা ও প্রতিভার আসরে নব নব সৃষ্টির পথে শিল্পী অগ্রসর হন। মতের অমিল হলেও সবার কথা শুনবার সহজ প্রবৃত্তি ও স্বচ্ছ সারল্য তাঁর থাকে। সত্যিকার শিল্পীমনে ও সার্থক শিল্পকর্মে এমন হৃদয়ের সৌরভ ও মোহনীয় গুণ আছে যার সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতা আঘাত দিয়েও প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আর যে শিল্পবস্তু আমাকে খুশী করেছে তার সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও তাকে আমি খাটো করে দেখতে পারি না। প্রকৃত সমালোচকও তা করতে পারেন। কারণ কালের দরবারে তার যে কায়েমী আসন পাতা!

www.pathagar.com

১৬.

সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য

মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে তমদ্দুন বা সংস্কৃতির জন্ম হয়। তমদ্দুনের অগ্রগতিতে সাধনা ও অভিজ্ঞতা এ দুটো জিনিস সমানভাবে পাশাপাশি কাজ করে চলে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি সাধনা সাপেক্ষ। কষ্ট করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যা অর্জন করা গেল, তা বিস্মৃত হলে পর যে সারবস্তুটুকু বেঁচে থাকে, তাই হল মানব-সভ্যতার অন্তর্নিহিত নির্যাস—আর তাকেই বলতে হবে তমদ্দুন। সংস্কৃতি কথাটা সে কারণে 'রিফাইনমেন্ট' অর্থে ব্যবহার করতে প্রয়াসী; আবার কেউবা মানব কল্যাণমুখিনতাকে তমদ্দুনের আসল জিনিস বলে তুলে ধরেন। কারো কারো মতে, বুদ্ধিমত্তার কায়েমী আসন পাতা রয়েছে তমদ্দুনের মাঝে : কোনও বিশেষ যুগের ও দেশের জনসাধারণের বুদ্ধির মুক্তি ও মানসিক স্ফুরণের মান সে যুগের ও দেশের সাংস্কৃতিক মূল্য নির্ধারণ করে।

মানব মনের অন্তর্নিহিত শক্তি, কৌতূহল ও প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনসত্তা তমদ্দুনের মধ্য দিয়েই প্রকাশের সুযোগ পায়। তমদ্দুন হল ভেতরের মানুষটির বাহ্যিক রূপ। অতীতে সেরা শিল্পকলা, কাব্য, ভাবসম্পদ ও ঐশ্বর্য মন্থন করে, বর্তমান মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনকে সাবলীল ছন্দে, সুন্দর গান ও মহত্তররূপে ছন্দিত, নন্দিত ও রূপায়িত করার মধ্যেই রয়েছে তমদ্দুনের সর্বোতমুখী ও সর্বাঙ্গীন ভূমিকা।

মোটামুটি তমদ্দুনকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি : (১) আদর্শিক বা সার্বজনীন আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন ও (২) আদর্শহীন বা আকস্মিক তমদ্দুন। আদর্শগত তমদ্দুনকে আবার দু' পর্যায়ে ভাগ করা চলে : (ক) বস্তু ও আত্মার সমন্বয়গত তমদ্দুন, (খ) বস্তুগত তমদ্দুন। ইসলাম ও অন্যান্য সার্বজনীন ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে যে তমদ্দুন গড়ে ওঠে তাকে প্রথম বা (ক) পর্যায়ভুক্ত ও ফ্যাসিজম, নাৎসীজম ও মার্কসীয় সাম্যবাদ বা কমিউনিজমকে দ্বিতীয় বা (খ)

www.pathagar.com

পর্যায়ভুক্ত করা যায়। আবার আদর্শহীন তমদ্দুনকে (ক) জাতিভিত্তিক ও (খ) স্থানভিত্তিক এ দু'ভাগে ভাগ করা চলে (জার্মান সংস্কৃতি মূলতঃ জাতিভিত্তিক ও আধুনিক ভারতীয়, ব্রিটিশ ও মার্কিন সংস্কৃতি স্থানভিত্তিক)। আমরা তাই চার রকমের তমদ্দুন দেখতে পাচ্ছি : বস্তু ও আত্মসমন্বয়গত তমদ্দুন, বস্তুগত তমদ্দুন, জাতিভিত্তিক তমদ্দুন ও স্থানভিত্তিক তমদ্দুন।

আদর্শমূলক তমদ্দুন ও আদর্শহীন তমদ্দুনে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। আদর্শগত সংস্কৃতিতে আদর্শকে সচেতনভাবে সমাজ জীবনে রূপায়িত করা অপরদিকে আদর্শহীন তমদ্দুনে জাতি ও স্থানকেই সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তিরূপে গণ্য করা চলে। জাতি ও স্থানকে এখানে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সমাজ সংগঠন করা এ তমদ্দুনগুলোতে খুব বেশি বড় ব্যাপার নয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে সবরকমের আদর্শহীন সংস্কৃতিকে সুবিধাবাদী সংস্কৃতিও বলা যেতে পারে। আবার একান্তভাবে বস্তুভিত্তিক সংস্কৃতি আদর্শবাদী হলেও আত্মজ্ঞানের অভাবে ও মানব-চেতনাকে পরিপূর্ণরূপে বস্তুগত বলে মনে করার দরুন শেষ পর্যন্ত সুবিধাবাদী সংস্কৃতিতে পর্যবসিত হতে পারে। মার্কসবাদ এরূপ একটি বস্তুভিত্তিক তমদ্দুন। এ জীবনদর্শন অনুসারে জীবনসংগ্রামের প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের সমগ্র প্রচেষ্টার নাম হল সংস্কৃতি। 'জীবন সংগ্রামের প্রকৃতির ওপর অধিকার' বলতে বুঝায় উৎপাদন শক্তি ও তার বিভিন্ন আকার প্রকারের হেরফের। এ মতবাদ অনুযায়ী উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের মাঝে সংস্কৃতির বিবর্তনের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। উৎপাদনের পদ্ধতিতে সংস্কৃতির মালমশলা হিসেবে ধরে না নিয়ে, এ শক্তিতে মার্কসবাদে এক একচ্ছত্র নীতি বা 'প্রিন্সিপল' হিসেবে ধরে নেওয়া হয় ও তথাকথিত বিজ্ঞান মারফত এই পদ্ধতি মানবতা ও মানব অধিকারকে ছাপিয়ে নৈতিক বা 'ম্যরাল' মান নির্ণয়ে তৎপর হয়ে থাকে।

ইসলামী জীবনদর্শন যে তমদ্দুনের জন্ম দিয়েছে, তা হল একটি আদর্শভিত্তিক তমদ্দুন। তবে আদর্শগত তমদ্দুন বলে কোন মতেই একে সংকীর্ণ বা কুপমণ্ডুক সংস্কৃতি বলা যায় না। কারণ ইসলামী জীবনদর্শন সব দেশ, কাল, দর্শন ও তমদ্দুন থেকে বিনয়ের সাথে যা কিছু সুন্দর, মহান, চিরন্তন ও কল্যাণকর, তাকে সাদরে বরণ করে নিতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে বারে বারে। তবে যে সব ভাল জিনিস গ্রহণ করা হল, তাকে ইসলামের ভাবধারায় সমৃদ্ধ ও তওহীদবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত করে তুলতে হয়। ইসলামী সংস্কৃতি সব মানুষের, সব জাতির, সব দেশের ও কালের সংস্কৃতি। সেজন্যে এই সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও দেশের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন জাতি, দেশ ও ভাষা হল তমদ্দুনের অপরিহার্য

www.pathagar.com

মালমশলা। কিন্তু এই সংস্কৃতির মূলনীতি ইসলামী জীবনদর্শন ও মানবতার ওপরে নির্ভর করে; জাতি ও দেশ, বর্ণ ও ভাষা এ সংস্কৃতির মূলভিত্তি নয়। ইসলামী জীবনদর্শনের মূল্যবোধগুলোই ইসলামী তমদ্দুনের মূলভিত্তি—যার ওপরে নির্ভর করে তার বিরাট সৌধ ও শাখা-প্রশাখা গড়ে। যে তমদ্দুন আদর্শহীন, তাতে মূল্যবোধের কোন বিশেষ স্বীকৃতি আমরা দেখতে পাই না। আর তার পেছনেও কোন সচেতন ও সংবেদনশীল বিকাশ ও বিবর্তনও দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই বোঝা গেল যে, আদর্শিক সংস্কৃতির মাপকাঠি পার্থক্য বিস্তর। ইসলামী সংস্কৃতি মূলতঃ আদর্শিক, কার্যতঃ সমাজতান্ত্রিক আর আদর্শহীন তমদ্দুন মূলতঃ আকস্মিক, কার্যতঃ সমাজতান্ত্রিক। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে দুটো সংস্কৃতির বাহ্যিক সাদৃশ্যই তাদের পারস্পরিক সমতা সপ্রমাণ করে। যেমন যুক্ত প্রদেশের ও কাশ্মীরের হিন্দু ও মুসলমান আর আরব দেশের খ্রিস্টান ও মুসলমান। কিন্তু আদর্শিক সাংস্কৃতিক বিচারে এই মানদণ্ড ও পদ্ধতি একেবারেই কৃত্রিম। কোনও এক দেশের আদর্শগত সংস্কৃতি অপর এক দেশের আদর্শগত সংস্কৃতির বাহ্যিক দিক থেকে পৃথক হতে পারে (আর এর ফলে সাধারণ সমাজতান্ত্রিক বিচারে তারা দুই সংস্কৃতিভুক্ত বলে গণ্য হবে); কিন্ত যদি তারা মূলতঃ একই জীবনদর্শনের মূল্যবোধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তারা একই আদর্শিক সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হবে। যেমন সিরিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইসলামী সংস্কৃতি জাতিভুক্ত আর বর্তমান চীন ও রাশিয়া কমিউনিস্ট সংস্কৃতির গোষ্ঠিভুক্ত। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মূল্যবোধ এক হলে, কালচার ও তমদ্দুনের বাইরের দিকটা কোনও কোনও বিষয়ে একরকম হতে পারে। আবার দেশ, কাল, বর্ণ ও ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে সে মূল্যবোধের প্রকাশ-ভঙ্গীর বিভিন্ন রূপ হতে পারে। এ সত্যতা না বুঝতে পেরে, অনেক মুসলিম জাতির বাহ্যিক পার্থক্য দেখে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাদের ভিন্ন মনে করা হয়েছে; আর পায়জামা, টুপি ও পানি দেখে হিন্দু-মুসলমানের একই সংস্কৃতি, এমনিধারা অনেক ফতোয়া জাহির করা হয়েছে।

আল-কুরআনের মতে, মূল্যবোধই কোনও একটি সংস্কৃতির ভেতরকার আসল রূপ নির্ধারণ করে। জাতি, ভাষা, বর্ণ বা দেশগত দিক থেকে নয়, কেবলমাত্র এই মূল্যবোধের বিচারেই ইহুদী, মুসলিম অন্যান্য অনেক জাতিকে ধর্মীয় কিতাবে সেরা জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু তওহীদবাদ ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করে এরা যদি সুবিচার ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে না পারেন, তবে বুঝতে হবে, না আছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব না হয়েছে তাদের হাত দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের সত্যিকার রূপায়ণ। একজন মুসলমান পৌত্তলিক ও নাস্তিক কেবল শেরোয়ানী পরিধান করার ফলে, আদর্শিক

www.pathagar.com

সংস্কৃতির মাপকাঠিতে, একই সংস্কৃতিভুক্ত বলে গণ্য হতে পারেন না। আল-কুরআন এ-কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেন : মহান আল্লাহ্, মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন (সূরা রাহ্মান ৫৫ ঃ ১০৪)। সে হিসেবে দুনিয়ার সব ভাষাই ইসলামী সংস্কৃতির ভাষা।

প্রতিটি ভাষা আল্লাহ্র দেয়া শক্তি থেকে উদ্ভুত। তওহীদজাত সমাজব্যবস্থা গঠনের আহ্বান নিয়ে সমগ্র মানবজাতির জন্যেই এসেছে এই কুরআন। রসূল (সা.) বলেছেন : 'আমি সমগ্র মানবজাতির জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।' তবে প্রাথমিক দিকে আরববাসীকে তিনি অজ্ঞানতা থেকে নিয়ে এলেন আলোর পথে। তাই বলা হল : 'কুরআনকে আমরা তোমাদের নিজের ভাষায় সহজ করে তৈরি করেছি, যাতে তোমরা সাবধান-বাণী শুনতে পাও' (৪৪ ঃ ৫৮ লুক্মান)। কুরআনের মতানুসারে, মাতৃভাষাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন। আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গম্বরগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাষার ভেতর দিয়েই ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। 'আমরা একজন রসূলও পাঠাই নি, যিনি তাঁর গোষ্ঠির নিজের ভাষার মারফত প্রচার করেন নি, যাতে করে তাঁরা আল্লহ্র কালাম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।' (১৪ ঃ ৪-ইব্রাহীম)।

ভাষা ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও মহিমা ঘোষণা করে। তাঁর (আর) নির্দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'আসমান-জমিনের সৃষ্টি আর বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্য। এর মধ্যে সব মানুষের জন্যে রয়েছে অগুণতি নিদর্শন।' (৩০ ঃ ২৭-২৮ আয্যুমার)। সব ভাষাই ইসলামী ভাষা এবং ইসলামের জীবনদর্শন যে কোনও একটা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা হবে ইসলামের তমদ্দুনী ভাষা। কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের আওতায় বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়, মানবতার উদ্বোধন ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের নামই হল ইসলামী সংস্কৃতি। আল্লাহ্ বলেন : 'বিভিন্ন জাতিকে পারস্পরিক আদান-প্রদান-পরিচিতি ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার জন্যেই পয়দা করা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র সেই জাতিই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে, যারা সৎ ও মহৎ।' কোনও একটি ভাষায় কথা বলাই ভালো, আর অপর একটি ভাষায় কথা বলা খারাব—এ মতবাদ ইসলামবিরোধী। উগ্র গোষ্ঠিবাদ ও জাতীয় অন্ধতার ফলে উগ্র জাতিগত অন্ধতাকে অনেক দিন ধরে ইসলামের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, এ মানসিকতার সঙ্গে ইসলামী জীবনদর্শনের কোনও রক্ষা হতে পারে না। কারণ ইসলামে কোন একটি ভাষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নয়, নীতিজ্ঞান ও তার বাস্তব রূপায়ণই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র নিরিখ।

www.pathagar.com

ইসলামী তমদ্দুন জাতিগত অন্ধতা মানে না— 'ওরিজিন্যাল' ও 'কনভর্টেড' মুসলমানে এ সমাজব্যবস্থার আওতায় কোনও পার্থক্যই স্বীকার করা হয় না। রক্ত, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে মুসলমানের ঐক্য নয়—আদর্শের দিক থেকেই মুসলমান এক সূত্রে গাঁথা।

সংস্কৃতির বিকাশে সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এক-একটি জাতি তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রকাশ করার সুযোগ পায়। প্রাচীনকালে, ব্যাকরণের সঙ্গে মিলিয়ে যা পড়া হত, তাকে বলা হত সাহিত্য। সাহিত্যের এই ধাতুগত ব্যাখ্যা এর অন্তর্নিহিত ভাবটার প্রকাশ করতে পারে না। কথার মধ্যে যে শিল্পজ্ঞান আছে, যে রসবোধ আছে, তা হল সাহিত্যের অর্ধভাগ। কল্পনা হল সাহিত্যের প্রকাশ ধর্ম। সৃষ্টির আবেগে যে মানব-সংগীত কথার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তা'ই দেখা দেয় সাহিত্যরূপে। উপদেশ বর্ষণ সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবে সাহিত্যে যদি কোনও উপদেশ থেকে যায়, তা ইঙ্গিতে ইশারায়, আকারে-প্রকারে প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে ফুটে উঠবে এমন একটি সাবলীলতা ও অপরূপতা, যার নাম এককথায় দেয়া চলে কান্তা সম্মিত। যে জাতির জীবন লক্ষ্যহীন, যার কিছু পাবার নেই, তার বলবারই বা কী থাকে? যে জাতির কোনও জীবনবোধ নেই, যার জীবন আদর্শহীন, তার সাহিত্যিক স্ফূরণ হবার নয়। কারণ সাহিত্য মানুষের জীবন-সাধনা ও জীবনপ্রবাহের নব নব রূপায়ণ।

ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণাকে অযথা জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে—সেটি হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে ধর্ম বিশেষভাবে পরিপন্থী। কারণ ধর্ম মানলে নাকি সাহিত্যিকের রসকল্পনা বিশিষ্ট শ্রেণী-প্রত্যয়ের ওপরে উঠতে পারে না, বুদ্ধিদীপ্তির অভাব ঘটে ও সমাজ-জীবনে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক নীতি পুরোহিততন্ত্র ও ধর্ম এক জিনিস নয়। সে সমাজকেই ধর্মীয় সমাজ বলা হয়, যেখানে সার্বজনীন ধর্মীয় নীতিগুলো সামাজিক চাহিদা ও পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ধর্ম এ কথা প্রমাণ করতে চায় না যে, সমাজে শোষণ নেই। মানবসমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকা আর শোষক শ্রেণী থাকা এককথা নয়। শোষণ ও শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করলে যেমন সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা কায়েম করা যায় না, তেমনি সমাজনীতি ও সামাজিক কার্যপদ্ধতিতে নিছক শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসাভিত্তিক করে গড়ে তুললে কি উঁচুদরের সাহিত্য, কি উঁচুদরের সমাজ কোনটিই জন্মলাভ করতে পারে না। তবে সমাজের ও সাহিত্যের, যেটুকু উচ্চঙ্গের ও যেটুকু মঙ্গলময়, সেটুকু অর্জন করা সম্ভব হয়, রসবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিভালব্ধ জ্ঞানকে শ্রেণী প্রত্যয়ের ওপর তুলে ধরেই। তাই সাহিত্য সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে গেলে যেমন বাস্তবগ্রাহ্য মন চাই, তেমনি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির প্রয়োজনও স্বীকার করতে হবে। সাহিত্যে এ দৃষ্টিকোণের স্বীকৃতির মাঝে কেবলমাত্র শ্রেণীবিচার যথেষ্ট নয়। কেবল রসসৃষ্টির ব্যাপারে কেন, সামাজিক উৎকর্ষের জন্যেও এ উপলব্ধি ও মানসচেতনা অপরিহার্য। আর সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ এ মানসিকতাকে কোন মতেই খর্ব করে না। কারণ এ মূল্যবোধের মাঝে রয়েছে মানবতার স্থায়ী আসন।

হরহামেশা এ কথা বলা হয় যে, ধর্মের আওতায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব নয়—কারণ প্রতিভার বড় গুণ হল বৈচিত্র্যও অস্বীকার করার নেতিবাচক বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি। আসলে সার্বজনীন ধর্মের মূল্যবোধ বাস্তবে কাজে লাগান হলে এই বৈচিত্র্য মৃতকল্প হয়ে যাবার কোনও কারণ নেই । সার্বজনীন ধর্মের মূলনীতিগুলো এত ব্যাপক ও সার্বজনীন যে এর আওতায় মানুষের প্রতিভা নব নব রূপে, রসে, আকারে প্রকারে আত্মপ্রকাশ করার ভরসা রাখে। মানুষের জীবনবোধ সার্বজনীন না হবার ফলে ও বাস্তবজীবনে রূপায়িত না হবার ফলেই বরং সাহিত্য ও সংস্কৃতি পঙ্গু, সংকীর্ণ ও মৃতবৎ হয়ে পড়ে। সার্বজনীন ধর্মের দৃষ্টিতে সব জীবনদর্শনকেই এক-একটি 'ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয় ও সার্বজনীন ধর্ম হল এক প্রকারের সার্বজনীন জীবনাদর্শ। তাই ধর্মকে এখানে কেবল নীচুদরের লোকদের কালচার মনে করার প্রবৃত্তি নেই বা কালচারকে উঁচুস্তরের ধর্ম মনে করে চিন্তার কুয়াশা সৃষ্টিরও প্রয়াস নেই। ইসলামে পুরোহিততন্ত্র স্বীকৃতি পায় নি। ধর্মকে আমরা যদি পুরোহিততন্ত্র হিসেবে মনে না করি, তবে উঁচুস্তর ও নীচুস্তর সব স্তরের লোকেরই ধর্ম বা জীবনবোধ আছে ও কালচার বা তমদ্দুন আছে এবং তাদের সংস্কৃতিতে ধর্ম বা জীবনবোধ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তবে সে জীবনদর্শন, সার্বজনীন ধর্ম বা জীবনবোধের অনুসারী কিনা সে প্রশ্ন বিচারসাপেক্ষ।

'ধর্ম' কথাটিকে নীতি বা মূল্যবোধ অর্থে গ্রহণ করলে ও সে মূল্যবোধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পালন করলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৌণিকতার কোনও সম্ভাবনা নেই; বহু ভঙ্গিম সাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রসার আর অসীম কৌতূহল ও বিস্ময় দৃষ্টির উৎকর্ষ একান্তরূপেই সম্ভব। ধর্মকে শুধু মানলে হয় না, জীবনবোধের মাধ্যমে 'জানতে ও জয় করতে' হয়, সেটাই আল্-কুরআনের সাংস্কৃতিক চিন্তার বড় কথা।

তারপর প্রকৃত ধর্মাদর্শের প্রবণতা মানুষকে বিচ্ছেদের দিকে কিছুতেই টানতে পারে না। কারণ ধর্মের আদর্শ উদার, মানবিক ও সার্বজনীন। এ আদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার ফলেই বিচ্ছেদ, কলহ ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। অজ্ঞানতার ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায্য সাম্প্রদায়িক অধিকারের মধ্যে

www.pathagar.com

পরস্পর পার্থক্য নির্ণয় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের আদর্শিক পার্থক্য নির্ণয় করে দিলে, সার্বজনীন ধর্মাদর্শ মানুষকে এক করে, ভাগ করে না। যদি বলা হয় যে, ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং ধর্ম চাই না; তবে প্রশ্ন ওঠে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ভাব ও চিন্তা নিরপেক্ষ হতে পারে কি না। সব মানুষই কমবেশি চিন্তাশীল। তাই কোন আদর্শ না থাকা মানুষের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। বুদ্ধিমত্তা মানুষের একটি অপরিহার্য গুণ। আর বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বের ফলে মানুষের মধ্যে চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয়। তথাকথিত 'ধর্ম' না চাইলেও জীবনবোধ বা ধর্ম মানুষকে মানতেই হয়। তবে সে জীবনবোধকে হয়ত দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। ধর্ম হয়ত সে মানতে চাইল না, কারণ ধর্মকে সে পুরোহিততন্ত্র বলে ধরে নিল। কিন্তু ধর্মের স্থানে নতুন নতুন দর্শন এসে শিকড় গজায়। গণতন্ত্র এলো, তার রকমের অন্ত নেই; সমাজতন্ত্র, তার আবার হরেক কিসিমি। তাই বলে কি জোর করে সব বিভেদ দূর করে কোন একটা দর্শন বা ধর্ম মানুষের ওপর চাপিয়ে দেব? আসল কথা হল, সব ধর্ম ও দর্শনকে বেঁচে থাকার অধিকার দান করতে হবে। তাদের বিকৃতি দূর করতে হবে। আর তাদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে নিজ নিজ সার্বজনীন ধর্মের মানবিক দিকগুলো বড় করে তুলে ধরতে হবে। সার্বজনীন ধর্মে এ-মানবিকতার অভাব নেই, কারণ জ্ঞানের সাধনা ও অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনের প্রতি উদারতা এর একটা মূল্যবান নীতি—এই মানবিকতার (উগ্র গোষ্ঠিবদ্ধতার নয়) ওপরে ভিত্তি করে মানব অধিকারের স্বীকৃতি ধর্মীয় সমাজব্যবস্থার মূল নিরিখ। চলিষ্ণু জগৎ ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা এ জীবনবোধের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ জীবনব্যবস্থায় ধর্মের ব্যাখ্যায় ধর্মব্যবসায়ীদের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করা হয় না। কারণ ইসলাম 'রিসালাতের' নীতি মারফত মানুষের বুদ্ধি ও আত্মার মুক্তি ঘোষণা করেছে ও বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত রাখতে দিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। তবে যে পরিমাণে বুদ্ধির লম্ফন কুর্দন মানবতা ও সাধারণ মানুষের অধিকারগুলোকে লঙ্ঘন করে যায়, সে পরিমাণে বুদ্ধির চাইতেও ইসলামী দর্শনের মূল্যবোধ-অনুগ ও মানবিক হওয়া বাস্তবক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ইসলাম বুদ্ধির মুক্তি ও মানসিক স্ফূর্তি চেয়েছে, কিন্তু এর কুর্দন কোলাহল বরদাশত করেনি। অবশ্য এ-কথা সত্য যে, আমাদের দেশের অজ্ঞ সাধারণ ও ধর্মব্যবসায়ীগণ ইসলামের বহুবিধ বুদ্ধিদীপ্তিকেও অনেক সময়ে ইসলাম-বিরোধী বলে ফতোয়া দিতে ছাড়েন নি। মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন না করে হৃদয়ের মুমুক্ষা ও চিন্তার বিপ্লব মূলতঃ ইসলামের অনভিপ্রেত হতে পারে না। ইসলামী সাহিত্যের সহজ স্বীকৃতির মাঝে রয়েছে বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুতা নিয়ে আসার তাগিদ—রুশিয়ার পীটার দি গ্রেট এর বা তুরস্কের সুলতানের মত তমদ্দুনিক শুদ্ধিকরণ নয়।

www.pathagar.com

এ কারণে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে কেউ যদি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রত্যাশা, করেন, তা হবে নিতান্ত স্বাভাবিক। তাকে শরিয়তের হুবহু প্রবর্তনা বললে ভয়ানক ভুল করা হবে। কারণ ধর্মের সার্বকালীন মূল্যবোধের পেছনে রয়েছে মানবচিত্তের চিরন্তন স্পন্দন। যে সদাজাগ্রত চিত্ততা ইসলামী সংস্কৃতির নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত, তাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বা জাতিতে গোল বাধতেই পারে না। যিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম পালন করেন, তিনি ধর্মের আপাতবিরোধিতার মাঝেও ঐক্য খুঁজে বার করেন ও সবার সঙ্গে মিলতে পারেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল কারণ হল ধর্মের আসল রূপ, মানবতা, সার্বজনীনতা ও ত্যাগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। নিজের ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা এক সঙ্গে বিদ্যমান থাকা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

তাই বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রগতির যুগে আমাদের শুধু তথাকথিত 'ধর্মপ্রাণ' হলে চলবে না (ধর্ম অবশ্য মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ রূপ যা সর্বযুগেই বহুমূল্য)। আমাদেরকে আজ প্রাণধর্মী ও ধর্মপ্রাণ দুই-ই হতে হবে এক সঙ্গে। বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করে আমাদের সমাজের জীবনবোধের ওপর ভিত্তি করে এক প্রাণসঞ্চারী নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে গোরস্থান মানসিকতা ও মোল্লাতন্ত্র বর্জন আমাদের প্রধান কর্তব্য।

ধর্ম ও রেনেসাঁ

ইসলামী জীবনদর্শন ও সংস্কৃতিতে যে জীবনবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা কখনই রেনেসাঁ-বিরোধী হতে পারে না। প্রচলিত নীতি-বিরোধিতা কখনও কখনও রেনেসাঁর সংকেত দেয়, তবে তা কিছুতেই রেনেসাঁর মূল্য বিচারের মানদণ্ড নয়। কোনও একটা জীবনদর্শনের নীতি ও মূল্যবোধ যদি প্রাণবন্ত, সজীব ও সংবেদনশীল হয়, তবে তার মধ্যে চিন্তা, কার্য ও আনন্দের নব নব অভিযান নিছক অসম্ভব কষ্ট—কল্পনা নয়। সাহিত্য ও শিল্পকলার মারফত মানবমনের চিন্তা ও স্পন্দনের নব নব বিস্তৃতি শেষ পর্যন্ত যদি প্রকৃত রেনেসাঁ ও সমাজকল্যাণ আনতে চায়, তবে তার পেছনে একটা সুষ্ঠু জীবনবোধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইতালীতে জীবনবোধের একান্ত অস্পষ্টতা ও ইংল্যান্ডে জীবনবোধের অযুত স্বীকৃতির ফলে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফল যে এ দু'দেশে ভিন্নরকম হয়েছিল, তা সব ঐতিহাসিকেরই জানা আছে। ইতিহাস এ কথাও প্রমাণ করেছে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর পেছনে রয়েছে ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। ইসলাম ধর্ম নামে কথিত হলেও এ প্রেরণা প্রতিভার নব নব উন্মেষের নামই রেনেসাঁ—যার মধ্যে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সংগঠনী-দৃষ্টি ও সার্থক বিবর্তন লুকানো থাকে। তবে সে সংগঠন, পরিবর্তন ও বিবর্তন শেষটায় সমাজকল্যাণে পৌঁছানো চাই ও মানবিকতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া চাই।

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ

ইসলামী জীবনদর্শনের সার্বজনীন মূলনীতির ওপরে ইসলামী তমদ্দুন প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল্যবোধ এই তমদ্দুনের প্রাণ। সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সহস্র প্রেরণা রয়েছে এ-সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলামী জীবনদর্শনকে আল কুরআনে বিশালাকার বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধর্মের বাণী একটা বৃক্ষের মত যার শিকড় থাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর শাখা প্রশাখা আসমানে উঁচু করে থাকে। (সূরা ইব্‌রাহীম, ১৪ ঃ ২০)

তওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ব), মালিকিয়াত (আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব) ও খিলাফত (মানুষের প্রতিনিধিত্ব) এই তমদ্দুনের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ্ এক ও তিনিই একমাত্র উপাস্য ও তাঁর ওপরে আর কেউ নেই কোনও শক্তি নেই। তিনি শুধু মুসলিমের প্রভু নন—সমগ্র নিখিল বিশ্বেরই তিনিই প্রভু। জাতি হিসেবে কেবলমাত্র মুসলমানেরাই তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নন। সব জাতি ও ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর ঈমান, আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ, সততা, সাধুতা ও মানবকল্যাণের ওপরই নির্ভর করে। প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি ও সে হিসেবে সমান অধিকারের দাবীদার। সব মানুষ পরস্পর ভাই ভাই ও একই আইনের অধীন। এ বিষয়ে শাসক বা শাসিতের মধ্যে কোনও তফাত নেই। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতার অস্তিত্ব নেই। এই জীবনদর্শনের বস্তু ও আত্মার কোন বিরোধও স্বীকৃত হয় নি— উভয় দিককেই দেয়া হয়েছে সমান গুরুত্ব। মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে সুষ্ঠু ও সুবিচারমূলক সমাজ গঠনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথাই ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, রিবা' বা সুদ এবং সর্বপ্রকারের অর্থনৈতিক শোষণ ঘোর পাপ ও মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক কল্যাণের (অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি) সীমার মধ্যে থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করা চলে। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্যে ইসলাম বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা বা যাকাতের বিধান দিয়েছে। ইসলাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যেতে জানিয়েছে উদাত্ত আহ্বান। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও নিরাপত্তা ইসলাম স্বীকার করে—এ অধিকার কারো ছিনিয়ে নেবার অধিকার নেই।

'রিসালাত' বা নবুয়তের নীতি দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছে যে, দুনিয়ার সব জাতির ভেতরেই রসূল এসেছেন ও হযরত মুহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র শেষ রসূল। এই নীতির দ্বারা মানবজাতির ঐক্য ও বুদ্ধিমত্তার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামের মতে সত্য ও জ্ঞানের উপলব্ধিতে কোনও জাতির একচ্ছত্র অধিকার

www.pathagar.com

নেই। মানব-সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, রিসালাতের নীতির মধ্যে সমগ্র মানুষের সংস্কৃতির ঐক্য, পরস্পর নির্ভরশীলতা ও মানবমহিমার স্বীকৃতি রয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে এখানে উদার দৃষ্টিকোণ ও মানসিকতার ভেতরে দেখি মানবতার অযুত স্বীকৃতি।। যদিও এই সাংস্কৃতিক বিচার-বুদ্ধি ও মূল্যমান মুসলিম সমাজের সামাজিক দুর্গতি, অর্থনৈতিক অরাজকতা ও গোষ্ঠিগত অন্ধতার মাঝে আটকে গেছে, তবু মুসলমানগণ দুঃখের নির্মম মুহূর্তে তওহীদ ও রিসালাতে আশ্রয় নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন, শত বাধাবিপত্তি জয় করতে পারেন। তওহীদ ও রিসালাতের নীতি বুঝতে পারলে মুসলিম-মানসের নিছক নেতিবাচক ভাবধারা অন্তঃমুখীনতা দূর হয়ে যাবে ও ইসলামী জীবনদর্শনের মূল উদ্দেশ্য সুষ্ঠু সমাজ সংগঠনের দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারব। উপমহাদেশের মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস থেকে জানতে পারা যায় যে, বিজয়ীরা সবাই এক জাতির লোক নয়—কিন্তু তারা একই সূত্রে গ্রথিত, তারা সবাই মুসলিম, এই ছিল তাদের পরিচয়। তুর্কী, আফগান ও মুগল নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও ইসলামী জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির এক-একটা বিশিষ্ট অংশরূপে তারা নিজেদের মনে করতেন। তওহীদ ও সাম্যনীতি এ সব জাতিকে কমবেশি ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় এনেছিল।

ইসলামী সংস্কৃতি এ-কথা দাবী করে না যে, কেবলমাত্র এর মধ্যেই মানুষের সব সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলাম শুধু এ-কথাই বলতে চায় যে, কতকগুলো সার্বজনীন মানবিক নীতি (তা যে নামেই হোক) না মানলে মানুষের মানসিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দুনিয়ার সব ভাষা ও সংস্কৃতিকে ইসলামী তমদ্দুনে সম্মানের চোখে দেখা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারার সার্থক অনুপ্রবেশ ইসলামে কাম্যও। এজন্যেই ইসলামে মৌলিকনীতি অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক চাহিদা ও পরিবেশ মাফিক নীতিকে (প্রিন্সিপল্‌স) বাস্তবে রূপায়িত করতে বলা হয়েছে। এর নাম 'ইজতিহাদ'। ইসলামের জীবনদর্শনকে আধুনিক যুগে রূপায়ণের উপযোগী করে তুলতে হলে ও আধুনিক মানুষকে ইসলামের জন্যে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে যেমন একদিকে জ্ঞানের মারফত ইসলামের সামাজিক রূপায়ণ প্রয়োজন তেমনি শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমাদের মূল্যবোধ অনুগ করে ঢেলে সাজাতে হবে। অধ্যাপক ইলিয়ট স্মিথ বলেন যে, ভাগ্য গুণে খৃষ্ট-জন্মের চার হাজার বছর পূর্বে মিসরে মানব-সভ্যতার পত্তন হয় ও সেখান থেকে তাইগ্রীস নদের তীরে, ভারতে, চীনে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। একে বলা হয় সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রত্যয় (ইভল্যুশনিস্ট থিয়োরী)। অপরদিকে অধ্যাপক টয়েনবি বলেন যে, অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলেই কোনও একটা সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

www.pathagar.com

একে বলা হয় সংস্কৃতির সঞ্চারশীল প্রত্যয় (ডিফিউশনিস্ট থিয়োরী)। রিসালাতের মারফত ইসলাম গৌণভাবে এই সঞ্চারশীল প্রত্যয়কেই সমর্থন করেছেন।

আধুনিক দুনিয়ায় সমগ্র মুসলিম জাতির একজন শাসক বা খলীফা ঘোষণা করলে বা সাধারণ মুসলিমের রোমান্টিক ঐক্যের (যার আংশিক প্রয়োজন কোন দিনও ফুরিয়ে যাবে না) কথা প্রচার করলে কোনও ফায়দা হবে না। দেশে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের সমাজ-নীতির দ্বিধাহীন রূপায়ণের মারফত ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অতঃপর মুসলিমের সামাজিক (সমাজ ব্যবস্থাগত) ও আধ্যাত্মিক এই উভয় মিলনের সেতু রচনা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন তথাকথিক রাজতন্ত্রগত 'মুসলিম রাষ্ট্রের' সঙ্গে খিলাফতভিত্তিক গণতন্ত্রী অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সমঝোতা ও সত্যিকার মিলন অনেক দিক দিয়েই অসম্ভব ব্যাপার।

ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধ থেকে আমরা এ সত্যেরই ইঙ্গিত পাই। এখানে ঘটেছে বস্তু ও আত্মা, সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিসত্তার সমন্বয়। দুনিয়ার সব কাজই মুসলিমের ইবাদত, যদি তার ভেতরে জীবন সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবকল্যাণ নিহিত থাকে। দুনিয়ার কাজ করা দুনিয়াদার হওয়া নয়—আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকার নামই দুনিয়াদার হওয়া। সমগ্র প্রকৃতিতে রয়েছে সত্যের নিদর্শন। সে শক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে, আহরণ করতে হবে। কারণ এ বাস্তব জগতই পরকালের সত্য ক্ষেত্র। 'আক্‌ল (বুদ্ধি) 'মুহব্বত' (প্রেম) ও মারিফাতের (সাধনা) মাধ্যমে 'ফালাহ' (সাফল্য) লাভ করাই ব্যাপক অর্থে ইবাদাত ও ইসলামী তমদ্দুনের বাস্তব পন্থা। এমার্সনের ভাষায়, সংস্কৃতির যে বিশেষ গুণ সামাজিক সংযোগ ও আত্মগত নির্জনবাসের মধ্যে এক মাঝামাঝি পথ, তা ইসলামী সংস্কৃতিতে পুরোপুরি মেলে : To establish balance between society and solitude such as will not wither away culture but will make it effective and fruitfull—সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির কারবার। স্রষ্টার ও সৃষ্টির সম্পর্ক ছাড়াও মানুষের সমাজ-জীবন খাদ্য আহরণ ও অর্জনের পন্থা যৌন-জীবন, রাষ্ট্রনীতি এবং শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ক এক মানবোচিত পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যান্য দার্শনিক আদর্শের (গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইত্যাদি) চাইতে মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ ইসলামে নেই বললেই চলে (পাশ্চাত্য দেশগুলো রাজনৈতিক, গণতন্ত্র, সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও কমিউনিস্ট চীনের গণতন্ত্রী স্বৈরবাদ)। ইসলামে শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ রাজনৈতিক বিবর্তন সম্পর্কে মতবিরোধ ইসলামী জীবনদর্শনের কোনও মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এ-দুটো দল গড়ে ওঠে নি। আর এ জীবনদর্শনের

www.pathagar.com

মৌলিকনীতি ও সমাজদর্শনে কোন অস্পষ্টতা নেই। সুদূরপ্রসারী শক্তির কাছে মুসলমান প্রার্থনা করেন আর সে-শক্তির অনু প্রকাশের মধ্যে গবেষণায় রত থাকেন যা হল এক ধরনের প্রার্থনা।

কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুদের মত সে বৃহৎ শক্তির অনুপ্রসারী এক-একটি দিককে আদি-সত্তার প্রকাশের সমগ্র রূপ বলে মনে করেন না, তাই তাকে পূজা না করে—করে অনুশীলন। ইসলামী সংস্কৃতির এই সর্বমুখিনতার ফলে আরবদের মধ্যে ইসলামের প্রেরণায় শিল্পকলা ও বিজ্ঞানচর্চার পরিপূর্ণতা ও স্ফুরণ একই যুগে সম্ভব হয়েছিল। কুরআন একটা বিজ্ঞানের কিতাব নয়—বিজ্ঞানের সত্য প্রচার করাও কুরআনের কাজ নয়। ইসলাম দিয়েছেন বিজ্ঞানের প্রেরণা। সে প্রেরণা সার্থক হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভবে। মানুষের মত আদিসত্তা আল্লাহ্ কোনও ব্যক্তি নন—তিনি সেই মহান শক্তি, যিনি একই সঙ্গে একদিকে সুদূর প্রসারী (স্টানসেনডেন্টল) অপরদিকে অনুপ্রসারী (ইম্যানেন্ট)। তাই তাঁর থেকে ইসলামী জীবনদর্শনের দার্শনিক ভিত্তি ও সর্বাঙ্গীণ (নিছক বস্তুগত নয়) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম হয়।

ইসলামী সাহিত্য

সাহিত্য মানবহৃদয়ের প্রাণধর্ম। মানবমনের ভাবাবেগ, অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্বজনীন। তাই আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে যে, সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য বললে সাহিত্যের অপমান করা হয়. আর ইসলামকে করা হয় হেয়। প্রকৃতপক্ষে এ মনোভাবের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য ও ইসলাম—এ দুটোকেই বোঝার ভুল। সাহিত্য তো সবই এক—তবু রুশ সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, আইরিশ সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, খৃস্টান সাহিত্য, ইহুদী সাহিত্য. হিন্দু সাহিত্য ইত্যাদি পরিচিতি বর্তমান। যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজি সাহিত্যকে ঐ নামে অভিহিত করেন, তা কি সাহিত্যের অবমাননা করা না সাহিত্য সম্পর্কে সত্যভাষণ? ইসলাম মুসলিমের দৃষ্টি সংকীর্ণ করে শুধু ধর্মীয় কিতাব পাঠ করতে বলে নি—দুনিয়ার সেরা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মন্থন করতেই বার বার প্রেরণা দিয়েছে।'জ্ঞান মুসলিমের হারানিধি।' যে দেশেরই বা যে জাতিরই হোক না কেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের উপেক্ষা করা চলবে না। আবার অন্য সাহিত্যকে তাড়িয়ে দেবারও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস পারস্পরিক নির্ভরতার ইতিহাস। সাধারণভাবে, ইসলামী সাহিত্য বলে একটা জিনিস আছে ও এক এক দেশের ভাষার মাধ্যমে এর বৈচিত্র্য প্রকাশ ও 'বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য বলতে বুঝতে হবে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশমূলক সাহিত্য। এ-সাহিত্য আবার

www.pathagar.com

দু' পর্যায়ের—(ক) ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কীয় সাহিত্য; (খ) প্রথমতঃ ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের মারফত (উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ) এ জীবনদর্শনের বিচিত্র বিকাশ; দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের জীবনের ছবি যে সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করে; —এ জীবন অবশ্য কেবলমাত্র মুসলমানের জীবন নয়—মুসলমানের সঙ্গে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের যে সম্পর্ক তার মধ্যে নিহিত রয়েছে; এ-সম্পর্ক নিয়ে মুসলমানের জীবন যে সাহিত্যে প্রতিভাত হয়, তাকেও ইসলামী সাহিত্য বলা যেতে পারে। এর মধ্যেও থাকবে নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের অযুত সম্ভার। তৃতীয়তঃ মুসলমানের লেখা সাহিত্য। কিন্তু যেহেতু মুসলমানের লেখা হলেই তাতে ইসলামী জীবনবোধ ও মুসলিম জীবনধারার বিকাশ নাও হতে পারে, সে কারণে প্রথমতঃ ধর্মীয় সাহিত্য ও ব্যাপক অর্থে ইসলামী জীবনবোধের প্রকাশ ও মুসলিম জীবনের ছবি যে সাহিত্যে থাকবে সে সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যের মানদণ্ড হিসেবে ধরতে হবে। অবশ্য এ মাপকাঠিতে বিচার করলে স্বাভাবিকভাবে মুসলমানের অনেক লেখাই এসে পড়ে। তবু এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ-দিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমান লিখলেই তা ইসলামী সাহিত্য হয় না। কোনও ক্ষেত্রে হিন্দু বা খৃস্টান লেখকের হাত দিয়েও ইসলামী সাহিত্য বের হতে পারে। আবার উর্দু ভাষায় লেখা হলেই তা ইসলামী সাহিত্য হয় না ও বাংলায় লিখলেই তা হিন্দু সাহিত্য হয় না। সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের বিকাশের বিস্তর অবকাশ রয়েছে।

ইসলামী সাহিত্যের ওপর জোর দেয়ার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, যাঁরা এ সাহিত্যের স্বীকৃতি চাইছেন, তাঁরা বাইরের দুনিয়ার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির সঙ্গে কোন সংযোগ রাখবেন না, প্রতিবেশীর খবর নেবেন না। বাইরের সংযোগেই তো হয় প্রাণশক্তির বিচিত্র উদ্বোধন। ইসলামী জীবনদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সাহিত্য মন্থন ও উপভোগ করা বিচিত্র সাহিত্য রচনা করাতে কোন বাধাই নেই। অন্য সাহিত্যের রসাস্বাদন করা, মন দেয়া নেয়ার বিষয় ইসলামী সংস্কৃতির চেতনার এলাকার মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা আদান-প্রদানের ওপরই নির্ভর করে। তবে রসাস্বাদন করা আর কোনও একটি সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নীতিবোধ জীবনদর্শন হিসেবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা একেবারেই পৃথক ব্যাপার।

তবে এ-কথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, লব্ধ জ্ঞানকে নিজস্ব জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সার্থক সৃষ্টি হয় না। সেজন্যে ইসলামী সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি সাহিত্যের সম্যক স্বীকৃতি নিছক অমূলক আত্মবদ্ধতা নয়। এর দ্বারা অবশ্য এ

www.pathagar.com

বোঝাতে চাই না যে, পুঁথি সাহিত্যের হারাধন উদ্ধার করলেই জাতীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত হবে। কারণ পুঁথি-সাহিত্য বাংলা মুসলিম সাহিত্যের একদিক মাত্র। তবে শেক্সপীয়ার যদি ইংরেজি ভাষা ও খৃস্টান ঐতিহ্য বাদ দিয়ে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে লিখতে শুরু করতেন, তবে তা হত নিতান্ত অস্বাভাবিক। তাই বাংলা সাহিত্যের ইসলামী দিকের কথা যখন বলা হয়, তখন আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অস্বাভাবিকতা, শূন্যতা, হীনমন্যতার সম্পর্কে সচেতন করে দেয়া হয় ও আমাদের স্বকীয় জীবনবোধের স্বাভাবিক স্ফূরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় মাত্র।

সাহিত্যিক কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্যে বা নীতিবাক্য প্রচার করবার জন্যে সাহিত্য রচনা করেন না। সাহিত্যে লোকশিক্ষার বিভিন্ন উপাদান থাকলেও তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রস সৃষ্টি করা। তবে জীবনের সমগ্র বিষয় বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শ্রেণী সংগ্রামের কথা সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা চলে না। যে সমস্ত বিষয় মানব-মনের গভীরে লুক্কায়িত আছে, যা সমস্ত মানবতার মূল ও যার মৌলিক ও একক সার্থকতা আছে তার মধ্য দিয়ে মানবের স্বরূপ প্রকাশ করা সাহিত্যিকের লক্ষ্য। তবে সাধারণভাবে সাহিত্যের মৌলিক সার্থকতা নির্ধারণে নিজস্ব জীবনবোধের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। একথা স্বীকার করার অর্থ অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যকে ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ করা নয়, ইসলামের বিপন্নবাদের দোহাই নয়, অথবা হিন্দুসাহিত্য বা বিশ্বসাহিত্য পাঠ নিষিদ্ধ এমন কথাও নয়। জগতের প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মানবের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখেও ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। সাহিত্যকে তাই শুধু রম্য ও রসোত্তীর্ণ হলেই চলে না, তাকে মানবতাবোধোত্তীর্ণও হওয়া চাই। জীবনের সব ছবিই সাহিত্যে পাংক্তেয় নয়। যে আলেখ্য রূপে-রসে-গুণে মধুর ও মানবজীবনে সত্য ও কল্যাণকর, কেবলমাত্র তাই সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে। দেশ-সমাজ-কাল এই সব আপোক্ষিকতাকে লঙ্ঘন করে। সকল মানবসমাজের কতকগুলো নীতি আছে, যা সাহিত্যের ও শিল্পের রসোত্তীর্ণ—তার ছোঁয়ায় অপরূপতা লাভ করে। উঁচুদরের সাহিত্য অসুন্দর ও অকল্যাণকর হতে পারে না। দুর্নীতি প্রচার রসোত্তীর্ণ হলেও তা উচ্চ স্তরের সাহিত্য নয়। সাহিত্য জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে জীবনকে মহিমান্বিত করে। সাহিত্যে যদি মানবতার অপমান নৃশংসতার উদ্রেক বা হিংসার প্রশ্রয় থাকে, তবে তা রসোত্তীর্ণ হলেও বিকৃতমনা ব্যক্তি ছাড়া আর কারও ভাল লাগে না। আবার সাহিত্য যদি কেবলমাত্র আদেশ উপদেশ ভারাক্রান্ত হয় ও তাতে রসবোধ না থাকে, তবে তা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে না। ইকবালের 'ওঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও', রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত

www.pathagar.com

পৃথ্বী' শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, মানবতার মূর্ত প্রকাশ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের গানগুলো ভালো লাগে। অবশ্য এক-এক সংস্কৃতির আওতায় মানবতাবোধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়। বর্তমান যুগে নৈতিক মূল্যমান সম্বন্ধে স্থির ধ্যান ধারণার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্যে সাহিত্যের সারাংশকে জীবনে গ্রহণ করতে হলে নিজ নিজ জীবন-বোধের মানদণ্ডের বিচার করে তবে স্বীয় জীবনে গ্রহণ করা শুধু স্বাভাবিক নয়, বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ-সম্পর্কে টি. এস. ইলিয়ট তাঁর 'Religion and Literature' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

'We shall certainly continue to read the best of its kind (literature) of what our time provides, but we must tirelessly criticise it according to our own principles. The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards though we must remember that whether. It is literature or not can be determined only by literary standards.

সাহিত্যের সাধনায় ইসলামী সংস্কৃতির বিশ্বমুখিনতা অব্যাহত রেখে একে নব নব বৈচিত্র্যে প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্যের আকর্ষণী ক্ষমতা রসাস্বাদন ও সমাজ-কল্যাণে ব্যয়িত হবে। তাই ইসলামী সাহিত্যের স্বীকৃতির স্পৃহা ইসলামের মারফত ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে মানবতা প্রকাশেরই বিনীত প্রচেষ্টা মাত্র। এদিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যে তিনটি স্তর আছে— (১) রসবান সাহিত্য, (২) মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য ও (৩) নিজস্ব জীবনবোধের মারফত মানবতাপ্রকাশী রসবান সাহিত্য। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে এই তৃতীয় স্তরের মাপকাঠিকে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের তথাকথিত খোলস ও সাফাই বাদ দিয়ে ধর্মের সারাংশটুকু গ্রহণ করতে হবে। ধর্মীয় লেবেল দেখেই আমরা যেন তাকে গ্রহণ না করি ও প্রকৃত ধর্মীয় বলে মনে না করি, বা আকস্মিকভাবে ধর্ম বা জীবনাদর্শকে আমাদের বিবেচনার বাইরে না রাখি। আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের শেষ উদ্দেশ্য যে মানবকল্যাণ, তা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আর অন্যান্য সাহিত্যের শিল্প-সৌষ্ঠব ও ছন্দ-বৈচিত্র্য গ্রহণ করতেও আমাদের যেন কোনও আপত্তি না থাকে।

বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তি মুসলমান

মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজির পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খৃস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদরের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলেও ইসলামের তওহীদ ও সাম্যনীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হল যা বাংলা ভাষার প্রথম স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ। এ-ভাষা হিন্দু মুসলমানদের ভেতর সমানে প্রচলিত ছিল। দলিল পত্রাদিতে এর স্পষ্ট নজির রয়েছে। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে মুজাফফর শাহ ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সুযোগে হাবসী দাসগণ বিদ্রোহ করে; তখন বাংলার হিন্দু মুসলমান এক হয়ে বিচক্ষণ ও মানবপ্রেমিক চরিত্রবান হোসেন শাহকে (১৪৮৩—১৫১৯) গৌড়ের অধিপতি নির্বাচিত করলেন। তিনি মগ্‌দের পরাস্ত করেন ও তাঁর আমলেই কামরূপ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তাঁর করতলগত ছিল। হোসেন শাহের হৃদয় ছিল উদার, সরল ও একাত্মবোধদীপ্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন করলেন। তাঁর পূর্বে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় তরজমা হয় নি। তাঁর সভাতেই বাংলা কাব্যের গোড়াপত্তন হল। তিনিই প্রথম বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রবর্তন করলেন। ফারসী ভাষায় পারদর্শী হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে চললেন। এ-ভাবে এক মহানুভব মুসলমান শাসনকর্তার মহানুভবতায় ও ইসলামের তওহীদ, সামাজিক সাম্য ও মানবিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার জন্ম হল। হোসেন শাহের প্রেরণায় বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হল। এ সময়ের অনুবাদক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মালাধর বসু (বা গুণরাজ খাঁ যিনি ভাগবতের অনুবাদ করেছিলেন) গোপীনাথ বসু (বা পুরন্দর খাঁ), বিজয়গুপ্ত (পদ্মপুরাণের লেখক), কবীন্দ্র পরমেশ্বর('পরাগলী মহাভারত'-এর লেখক) ও শ্রীকর নন্দীর (মহা-ভারতের অশ্বমেধ পর্বের লেখক) নাম উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'মনসামঙ্গল', 'ভারত পঞ্চালী, এ সব গ্রন্থও এ আমলে রচিত হয়। উত্তর ভারতের মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান যেমন উর্দু ভাষা, তেমনি বাংলা দেশে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ দান হল বাংলা ভাষা। এ-ভাবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ বিকাশে মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করলেন। শাহ মুহম্মদ সগীর ও আলাওল বাঙালি মুসলিম সাহিত্যের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র।

হোসেন শাহ্‌র নাম বাংলা সাহিত্যের স্ফুরণে অমর হয়ে রয়েছে। অবশ্য এ আমলের পূর্বেও মুসলমানদের লেখা বাংলা কিতাব পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানের হাতে যে বিরাট পুঁথি-সাহিত্য গড়ে উঠত তা বহুলাংশে আত্মরক্ষামূলক। বৈষ্ণববাদের প্রভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তন এবং পলাশীর যুদ্ধ কেবল বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক পতন আনে নি, তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয় একই সঙ্গে এসে পড়ল। মুসলমানের এ পরাজয় হিন্দুরা সাদরে বরণ করে নিলে ও সন্তুষ্টচিত্তে ব্রিটিশের শাসন মেনে নিলেন। নিজেদের সুযোগ-সুবিধা তারা খুঁজে পেলেন ব্রিটিশের শাসনে। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুসৃত নীতির ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম হয়ে গেল। এ-ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানের অস্তিত্ব মুছে গেল। ফারসী ভাষাও মুসলিম আইনের স্থানে ইংরেজ ভাষা ও আইন রাষ্ট্রীয় ভাষা ও আইন হওয়ায় মুসলমানগণ লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে সরে দাঁড়ালেন। অবশ্য শাসনকার্যে সুবিধার জন্যে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে কিছুদিন তথাকথিত 'মৌলভী' তৈরির মহড়া চলল। তবে ইসলামের প্রাণধর্ম ও জীবনদর্শনের কোন শিক্ষা সেখানে ছিল না। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করে সেখানে তথাকথিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন করা হল। পলাশীর পরবর্তী যুগের মুসলিম অসহযোগের সুযোগ হিন্দুরা খুব ভালভাবেই গ্রহণ করলেন. আর মুসলিমেরা ডুবে গেলেন সামাজিক, অর্থনৈতিক নৈরাশ্যের অন্ধকারে।

অতঃপর বাংলা ভাষার বিকাশও মুসলমানের হাত থেকে সরে গেল। এর স্থান দখল করলেন হিন্দুঘেঁষা খৃস্টান মিশনারী ও হিন্দু সাহিত্যিকগণ। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারী কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড খৃস্টধর্ম প্রচারের তাগিদে যে বাংলা ভাষার প্রবর্তন করলেন, তাতে হিন্দুত্বের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একচ্ছত্র হিন্দু যুগ শুরু হল; এল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। হিন্দুত্ব ও বাঙালিত্ব এক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু বাংলা সাহিত্য বলে চালানো হল বহুদিন। ফলে আদি থেকে বাংলা সাহিত্যের যে একটা মুসলিম ধারা ছিল, তা বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেল। বাঙালির জীবন বলতে হিন্দু বাঙালির জীবনই বোঝানো হত। বাংলাদেশের মুসলমানও যে বাঙালি, এ-কথা সবাই এক রকম ভুলেই গেল। 'মুসলমান' কথাটি বাঙালি হিন্দুর কাছে অবাঙালি বলে ঠেক্‌তো।

বাংলা ভাষা হিন্দু ও মুসলমানের কাছে ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রীয় জীবন এক হলেও যে সাংস্কৃতিক জীবন আলাদা হতে পারে, বাংলার হিন্দু মুসলমানই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুঁথি-সাহিত্য থেকে মুসলিম জনগণ অফুরন্ত প্রেরণা পেয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে বাংলা ভাষার জনক মুসলমানের নিকট থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দূরে সরে গেল। এ বিবর্তন হিন্দু-ব্রিটিশ আতাতের অনিবার্য ফল।

www.pathagar.com

ভারতচন্দ্র ও কবি কঙ্কনের মধ্যে যে ভাষা দেখতে পাই, তাতে মুসলিম প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। বর্তমানকালে জনসাধারণের কাছে অপ্রচলিত কৃত্রিম ভাষাই হয়েছে সাহিত্যের বাহন, আর সে যুগে প্রচলিত ভাষাই ছিল সাহিত্যের ভাষা।

বাংলাদেশ ও ইসলামী সংস্কৃতি

মুসলিম অসহযোগের অবসানে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আলীগড় আন্দেলনের মারফত ইংরেজি শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মুসলিমের সহযোগ ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসে যোগদান না করেও স্বীয়সত্তা বজায় রেখে সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। পরাজয়ের যুগেও (১৭৫৭–১৯০৫) ভারতীয় মুসলমান তাঁদের স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। ১৮৩৩ সন থেকে ১৮৬৪ সন পর্যন্ত চলল মুসলিম হতাশার যুগ। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে হিন্দী ও দেবনাগরী সম্মেলন হয়। এতে হিন্দীকে যুক্ত প্রদেশের সরকারি ভাষা করার প্রচেষ্টা চলে। অতঃপর মুসলমানেরা 'রয়্যাল কমিশন অব এডুকেশনের' কাছে উর্দুব সপক্ষে এক স্মারকলিপি পেশ করেন (১৮৮২)। ১৮৯৮ সনে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর এ কাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। ১৯০০ সনের ১ এপ্রিল তারিখে প্রাদেশিক গভর্নরের ঘোষণায় দেবনাগরী সরকারি দফতরে গৃহীত হয়। এ সময়ে নওয়াব মুহসিন উল মূলক আলিগড়ে এক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন। সরকারের নিকট এক স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। নওয়াব ভিকার উল মূলককে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দেন। লক্ষ্ণৌতে একটি উর্দুরক্ষা সমিতিও গঠিত হয় (১৯০০—১৮ আগস্ট) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া মুসলিম অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয় বিবেচনায় ১৯০১ সালে বিভিন্ন স্থানের মুসলমান মিলিত হয়ে মুসলিমের রাজনৈতিক, সামাজিক সমিতি গঠন করে। এ-ভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত মুসলিম রেনেসাঁর প্রথম যুগের সূত্রপাত হল। অতঃপর সিমলা ডেপুটেশনের মারফত মুসলমানের তরফ থেকে দাবীদাওয়া পেশ করা হয়। এর অনেক পূর্বে (১৮৯৩) শ্রীতিলকের গো-রক্ষা সমিতি ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে। হিন্দু পুনর্জন্মবাদ বা 'রিভাইভালিজম' স্বতন্ত্র মুসলিম চেতনার জন্ম দেয়।

অন্যদিকে ইসলামের সঙ্গে সংস্পর্শে অনেক আগে থেকেই হিন্দু মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রাজপুতানা ও বিজয় নগরে ধর্মবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইসলামের প্রভাবে হিন্দু সমাজব্যবস্থা শক্তিশালী হতে থাকে। সূফীদের প্রভাবে হিন্দু বৈষ্ণববাদের জন্ম হয়। নানক, কবীর, রামানন্দ. শ্রীচৈতন্য, জয়দেব, মীরাবাঈ, নামদেব (মহারাষ্ট্র), জ্ঞানেশ্বর (গুজরাট) প্রমুখ সাধকের আবির্ভাব হয়। গীতার

www.pathagar.com

ভক্তিবাদ ইসলামের তওহীদের স্পর্শে জনপ্রিয় হয় ও দেশজ ভাষাগুলো নবজীবন লাভ করে। শ্রীশঙ্করাচার্যের নৈর্ব্যক্তিক দর্শন পরিত্যক্ত হয় ও তার স্থানে ভক্তিবাদ হিন্দুর দার্শনিক চিন্তার প্রধান বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের প্রভাবে বাঙালি হিন্দুর আত্মিক উন্নতি হয়, চিন্তাধারা মানবতা দ্বারা সজীব ও সমৃদ্ধ হয় আর চিন্তাও গভীর এবং বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক দিকে হিন্দুরা যথেষ্ট লাভবান হয়—সমাজে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব পাকাপাকিভাবে শিকড় গজিয়ে বসে। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ ও বঙ্কিম সাহিত্যে হিন্দু ঐতিহ্যের গুণকীর্তন হিন্দু সমাজকে ইসলামের প্রভাব সামলে নিয়ে আত্মস্থ করতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

অনাত্মীয় শিক্ষা ও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে-ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির পর্যুদস্ত হয়। পাকিস্তান লাভের পর বাঙালি মুসলমানেরা যে নতুন আবাসভূমি পেয়েছিল তা শুধু অর্থনৈতিক কারণেই তাঁরা লাভ করেন নি। মুক্ত আবহাওয়ায় মুসলিমের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ইসলামী জীবনদর্শনের সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণের জন্যেই এই অঞ্চলের বাঙালি মুসলমানেরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান ও ইসলামী রাষ্ট্র চেয়েছিলেন এই জন্যে যাতে করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কোনও মানুষকেই আর নিপীড়ন সহ্য করতে না হয়। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে তাঁরা সেই রাষ্ট্র বোঝেন, যেখানে মানবতার অনুসারী ইসলামী নামের মূলনীতিগুলো অপরিবর্তনীয়—কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতিগুলো রূপায়ণে আসে আপেক্ষিকতা ও বিবর্তন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা হয় প্রগতির নামে নয় রাজতন্ত্রদের নামে 'ইসলাম ইসলাম' ধুয়া তুলে ইসলামের প্রকৃত মানবিক নীতিগুলো ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে এক বিরাট অস্পষ্টতা ও কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু ইসলামী সমাজ গঠন না করলে ইসলামী রাষ্ট্র পাওয়া কখনই সম্ভব হয় না। আর এই সমাজ গঠনের ব্যাপারে সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে যে সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ ছিল, সে সম্পর্কে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক মহাকবি ইকবাল ১৯৩৭ সালের ২০ মার্চে কায়েদে আজমের নিকট লিখিত তাঁর এক পত্রে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন :

'ভারত এবং ভারতের বাইরের দুনিয়াকে এ-কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলিম জনসাধারণের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক সমস্যা ভারতীয় মুসলিমের পক্ষে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কোন ক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

www.pathagar.com

এর অনেক বছর পূর্বে (১৯০৩ সালে) মুসলিম রেনেসাঁর অগ্নিযুগের মহাপুরুষ জামালুদ্দীন আফগানী কলকাতায় তাঁর জাগরণের বাণীতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেন।

বিশ্বসাহিত্যে আজ অন্তর্দাহ ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাংলা ভাষার কিনারায় তার ঢেউ এসে লেগেছে। ফলে মূল্যবোধের দিক থেকে এক বিরাট শূন্যতা আমাদের সাহিত্যকে পেয়ে বসেছে। বাংলা বিভাগের ফলে বর্তমানের বাংলাদেশের সাহিত্যে এই শূন্যতা আরও মারাত্মক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ইউরোপ এতদিন ধর্মকে যাজকতন্ত্র মনে করে বসেছিল। ক্রমে ক্রমে তার সে ভুল ভেঙে যাচ্ছে। ইউরোপের শিক্ষার্থীরা, সাহিত্যিকেরা শিখেছেন প্রচুর। কিন্তু সৃষ্টিশীল প্রতিভার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যুবকদের প্রগতিমুখী গতিশীলতা থেমে গেছে—শ্লোগানকেই তারা জীবনের চরম বাণী ঠাউরেছে। 'লন্ডন ইয়ারবুক অব এডুকেশন' থেকে আমরা এ কথার ইঙ্গিত পাই। এ 'ইয়ারবুকে'র Education and the Social Crisis in Europe' শীর্ষক এক পুস্তিকায় আমরা জানতে পারি :

'Mere appeal to the intellect has already proved wanting. The beginning of a true intellectual discipline and of genuine religious emotion and experience has become manifested, even when the thread of tradition has been broken. The actual trend of education is in the opposite direction. The spirit of revolt is disappearing whose place is being taken by selfdiscipline'.

আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ সংগঠন করতে অগ্রসর হই, তবে আগে চলার ধাপ্পা দিয়ে আমাদের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তা হবে প্রগতি নামে বিকৃতির ও পরের ধনে পোদ্দারি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভিত্তির সহজ স্বীকৃতির মাঝেই রয়েছে আমাদের সাহিত্যিক শূন্যতা, দাসত্ব ও হীনমন্যতার অবসান। কারণ আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপরেই বাংলাদেশের ভিত্তি। সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহনশীলতা, স্থৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদেরকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি

বাঙালি মুসলিমের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা পাড়তে গেলেই বলা হয় যে, বাংলার মুসলমানেরা কখনও দেশকে ভালবাসতে পারল না। কথাটি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এই মুসলমানই যদি পরমুহূর্তে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিকে তথাকথিত বাঙালিত্বের বাঙালি সংস্কৃতিকে একান্তরূপে গ্রহণ করত, তবে তাঁরা একদিনেই স্বদেশপ্রেমিক হয়ে যেতেন। আসলে গোলমালটা এখানেই। এ কথা সত্য যে, মুসলমানের কাছে আদর্শ ইসলাম মানবতা, দেশজ আদর্শ ও নীতির চাইতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইসলামের আদর্শ মানবতার আওতায় দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে—নিজের দেশকে ঘৃণা বা দেশের জনসাধারণকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে কোনদিনই বলে নি। খাঁটি মুসলমানের কাছে (এবং সব ধার্মিকের কাছে) তার আদর্শগত সংহতি, তাদের দেশের সংহতি তাদের দেশের সীমানার চাইতে বড়। কারণ সে আদর্শ জাতিগত অন্ধতা দূর করে সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।

ইসলামী জীবনদর্শন-সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই আদর্শ মুসলমানকে তার নিজের দেশের সমস্যাকে অবহেলা করে অলীক কল্পনা করতে বলে নি। কিন্তু ইসলামে মহত্ত্ব, মানবতা ও সুবিচারের আদর্শ দেশজ পার্থক্য, সংকীর্ণতা চরমবাদের ঊর্ধ্বে। দেশকে বা দেশাত্মবোধকে ইসলাম কোনদিন অস্বীকার করে নি বা নষ্ট করে দিতেও চায় নি। বিভিন্ন দেশ জাতি বর্ণ ও ভাষা ইসলাম স্বীকার করেছে। কিন্তু দেশ বা জাতির মাধ্যমে উগ্র বা চরম নীতিবোধ ('দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে শ্রেয়'; 'আমার দেশ যা করে সব ভাল') কখনও স্বীকার করে নি। মুসলিম বাদশাহের সঙ্গে জড়িত না থেকে ইসলাম যদি কেবলমাত্র মুসলিম দরবেশ-সূফীদের শান্তিপূর্ণ প্রচারের মারফত রূপায়িত হত, তবে ইসলামের মানবিক দিকটা উপমহাদেশে—গভীরতর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করতে পারত।

মুসলমানের মন যে অনেকখানি আরব-অভিমুখী হবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমানের আদর্শ ইসলাম অভিমুখী। গভীর নৈরাশ্যের যুগে আরবমুখিনতা মুসলিম চিন্তাধারায় বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে এবং এ থেকে মুসলমানেরা পেয়েছেন গভীর প্রেরণা। আত্মস্থ হয়ে মুসলমানেরা যদি ইসলামের মৌলিক জীবনবোধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন তবে দেখবেন যে, ইসলাম দেশের সমস্যাকে অবহেলা করতে কোনও দিনই বলে নি। তাই নৈরাশ্যজনক ও দুঃখবাদী নীতিবাচক ভাবধারা পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে একদিকে যেমন প্রকৃতি, মাঠ, নদী, বন, নারিকেল, সুপারি, কোকিল, শালিক, ডাহুক প্রভৃতি মনকে আন্দোলিত করে, অন্যদিকে তেমনি উট, খেজুর, মরুদ্যান, লু হাওয়া, আখরোট, বাদাম, খুবানী আমাদের মনে সমানভাবে দোলা দেবে। দুটোকেই এক

www.pathagar.com

সঙ্গে পাশাপাশি রাখা চাই। নারিকেল সুপারি বাদ দিলে বাস্তব জীবনকে অবহেলা করা হবে ও ইসলামকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে না। আবার মরুর লু হাওয়া থেকে আমাদের মনকে একেবারে সরিয়ে রাখলে মুসলমানের মানসিক ঐতিহ্যকে মারাত্মকভাবে অস্বীকার করা হয়। ইসলামের ও মানবতার আওতায় চিরজাগ্রত মন নিয়ে আজ আনন্দ, প্রেম ও কল্যাণের উপলব্ধি চাই—ইসলামের ভিত্তিতে গতিশীল সংগঠন চাই, নিছক কৃত্রিম পুনরুজ্জীবনে (রিভাইভ্যালিজম) বিশেষ কোনও ফায়দা হবে না। মোল্লাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা তথাকথিত ধর্মীয় লেবেলের প্রচার মারফতেই আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠা নয়। ইসলামের সমাজনীতির সঙ্গেই বাস্তব সমাজব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করতে হবে। আমরা যখন ইসলামী সমাজের কথা বলি, তখন আমরা অতীতে ফিরে যাই না—ইসলামের মূল আদর্শ ও বিচিত্র সম্ভাবনার কথা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে আমরা অফুরন্ত প্রেরণা পাই। পেছন দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি, কিন্তু পিছু হ'টি না। আগামীর পানেই কেবল আমাদের পথ চলা।

আকাশচারী দিব্যদৃষ্টি ও বস্তুনিষ্ঠ অনুভূতি এ দুটোকে এক করে আজ অগ্রসর হতে হবে। জীবনের বৈচিত্র্য ও গভীরতার মাঝে প্রাচুর্য খুঁজে বের করতে হবে। জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে বাসনা সৃষ্টির প্রয়োজন— আর এই পরিপূর্ণতা আছে জীবনবোধের সঙ্গে বিশ্ববৈচিত্র্যের তুলনায় ও সামঞ্জস্য বিধানে। বাংলাদেশে মুসলিম সংস্কৃতি দেশকে কোনদিনই বাদ দেয়নি। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখতে পাই, ইসলামের প্রভাবেই বাংলার প্রাণমন জনগণের জীবনের দিকে ও লৌকিকতার দিকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। মুসলমানেরাই বাংলা ভাষার আদি জনক। অবশ্য নানা কারণে এ ভাষা মুসলমানের হাত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এই কারণে সংকীর্ণ গোষ্ঠিবাদে বিশ্বাসী মুসলমানেরা বলেন যে, বাঙালি মুসলমান হতে পারেনি।

কোন একটি দেশে বাস করে সে দেশের রাজনৈতিক জাতীয়তা গ্রহণ করতে ইসলাম কোনদিনই বাধা দেয়নি। ইসলাম জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ তখনই বাদ দিতে চেয়েছে যখন তার জাতীয়তা ও গোষ্ঠিপ্রেম মানবতা, ইনসাফ ও ইসলামকে উল্লঙ্ঘন করে গেছে। নিজের ভাষার মাধ্যমে ধর্মজ্ঞান লাভ করতে ও কুরআন শরীফ পড়তে কোন বাধাই নেই। (অবশ্য মুসলিমের ঐক্য সাধনে আরবি ভাষার অবদান স্বীকার করতেই হবে।) বহুবিবাহ বা পোশাকের শালীনতাকে অবরোধে পর্যবসিত করার জন্যে ইসলাম দায়ী নয়; মোল্লাতন্ত্র তো ইসলাম স্বীকার করে নি বা

www.pathagar.com

ফেজ মাথায় দিলে কেবল মুসলমান হয়, এটাও ইসলামের নীতি নয়। তবে ইসলামী আদর্শের ওপর জোর দেবার অর্থ হল, ইসলামের চোখে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের চাইতে সততা ও সামাজিক সুবিচারের শ্রেষ্ঠত্বই অধিক মূল্যবান। প্রকৃত ধর্মীয় রাষ্ট্র (খৃস্টান, ইহুদী, হিন্দু বা ইসলামী যা'ই হোক না কেন) আর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

বলা বাহুল্য, ইসলাম রাজনৈতিক জাতিত্ব ও আদর্শগত জাতিত্ব উভয়ই স্বীকার করে। রাজনৈতিক জাতিত্ব স্বীকার না করলে দেশের সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান করা যায় না। আবার আদর্শগত জাতিত্ব স্বীকার না করলে দেশজ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানবতা ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার বাংলাদেশের মত কোনও দেশ যদি সার্বজনীন আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এ রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকারগুলো দেশ বা দেশজ জাতীয়তাবাদ থেকে আসবে না—আসবে মানবতা থেকে, ইসলামী আদর্শ থেকে। মাটির বাঁধন ইসলাম অস্বীকার করে না। প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র রাজনৈতিক সংগঠনে দেশজ আর জাতীয় ও আদর্শিক ব্যাপারে মানবতামুখী ও সার্বজনীন। আর সব দেশের মুসলমানের মধ্যে যে সংহতি ও একাত্মবোধ রয়েছে, তা এই মানবতা-সঞ্জাত আদর্শিক ঐক্যের ফলেই জন্মলাভ করেছে। মানবিক পরিসীমার মাঝে জাতীয়তার স্বীকৃতি ইসলামী জীবনাদর্শের বিরোধী নয়। দেশকে ভালবাসতে ইসলামে কোন বাঁধাই নেই। কিন্তু তথাকথিত দেশতন্ত্রের যাঁতাকলে মানবতার অপমান দেশের নামে বিধর্মী বা বিজাতীয়ের অপমান ইসলামে বরদাশত করা হয় নি। আর এই হিসেবে দেশকে বড় করার বিরুদ্ধে ইসলামের অভিযান, তাতে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই। তবে একথা সত্য যে, মুসলিম পরাজয়ের যুগে মুসলিম মানসে বায়বীয় আরব মুখিনতা ভীড় করেছে, আদর্শগত জাতিত্ব ও মানবতার স্থানে অন্ধ গোষ্ঠিবাদ অধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে 'রিসালাতে'র নীতি থাকায় প্রত্যেকটি সত্যিকার মুসলিম বিশ্বাস করেন যে, দুনিয়ার সব জাতির ভেতরেই আল্লাহর নবী এসেছেন ও তওহীদ, মানব-ঐক্য ও ন্যায়বিচারমূলক সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিতও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই নবীদের অনুসারী জাতিগুলো মূলতঃ 'রিসালাতের' অনুসারী হওয়ায় তাদের সবারই সংস্কৃতি সার্বজনীনতার পরে স্থাপিত ছিল। তাই ইসলামী জীবনবোধ সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র উগ্র দেশাত্মবোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানবতা ও মখলুকাতের কল্যাণের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

বাঙালি মুসলিমের সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিকতামুক্ত ও তওহীদ সঞ্জাত। এর কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। হযরতের (সা.) জীবদ্দশায় তাঁর

www.pathagar.com

কয়েকজন শিষ্য ভারতের মালাবর উপকূলে চেরুমল-জেরুমল নামে হিন্দু রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও শারাফ বিন্ মালিক নামক একজন আরবীয় মুসলিমকে ভূমি প্রদান করেন ও ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন। সিংহলের রাজাও ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ইসলামের অন্তর্নিহিত উদারতায় মুগ্ধ হন। আরবীয় বণিকেরা সমগ্র মালাবর উপকূলে ও দাক্ষিণাত্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ৭১১ সনে মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন। বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলজীর আগমনের অনেক পূর্বেই আরব বণিকদের দ্বারা ইসলাম চট্টগ্রামে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। Richard Symonds-এর 'The Making of Pakrstan'-এ অধ্যাপক আহমদ আলীর প্রবন্ধে (১৯৭ পৃষ্ঠা) রয়েছে :

The culture that developed in Bengal was entirely different from that of the Hindus. The ports of the country especially Chittagong had come under the influence of the Arabs as early as the 7th Century A. D. and many of the Arab voyages and traders had left a permanent impress upon the area. Islam, therefore, took root very early in this respective soil.

বাঙালি মুসলমানেরা ইরানী ও তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি গড়তে চেয়েছিল। সাম্যধর্মী আরব বণিকেরা পাল রাজাদের আমলে বাংলার কূলে কূলে ব্যবসা করতেন। বিখ্যাত আরব সওদাগর আল্ হোসায়নী জাহাজ দিয়ে নসরত শাহকে মগদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। উদারমনা মুসলিমদের আগমনকে বৌদ্ধরা মুবারকবাদ জানান। বৌদ্ধ দোঁহার মধ্যে মুসলিম তমদ্দুনের অনেক মাল মসলা পাওয়া যায়। এ থেকে নিশ্চিত প্রমাণ মেলে যে, বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি মূল আরবি-ইসলামী বাঙালি সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত এবং রাজসিকতা ও গোষ্ঠিগত অন্ধতামুক্ত এই সংস্কৃতি মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশী, শক্তিধর্মী ও বাস্তব প্রাণশীল।

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে (খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) কয়েকজন প্রচারক (মু'মিন) বাংলাদেশে আসেন। এদের নেতা ছিলেন হযরত মামুদ ও হযরত মুহায়মিন। দ্বিতীয়বার প্রচার করতে আসেন হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত হোসেন উদ্দীন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা বই-কিতাবও থাকত না। তাঁরা রাজক্ষমতার সাহায্যও নিতেন না। তাঁদের প্রচার পদ্ধতির একটা

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তাঁরা এদেশের চলতি ভাষার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করতেন! অল্পসংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরি করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এঁরা গ্রামে বাস করতেন ও সফল করে ধর্ম প্রচার করা এদের কাজ ছিল। এরপর আরও পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলাদেশে এসেছিল। এদের বলা হত 'আবিদ'। এরা বিভিন্ন স্থানে 'খান্‌কা' বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে ধর্ম প্রচারকার্য চালিয়ে যেতেন। পাঠান আমলে বাংলাদেশ পাঠান বসতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে রণভাই-এর উপকূলে এক জাহাজডুবি হয়। এই ডুবির পর যাঁদের প্রাণ রক্ষা পায়, তাঁদেরকে আরাকানরাজের নিকট উপস্থিত করা হয়। রাজা এদের নিকট ইসলাম ধর্মের বিবরণ শুনে মুগ্ধ হন ও কয়েকটি পল্লীতে তাঁদের বসবাসের অনুমতি দেন। নবম, চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক মুসলমান ওলী বাংলায় আসেন। শাহ সুলতান, মাহিসাওয়ার, বাবা আদম শহীদ ও বায়জীদ বোস্তামীর নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী, শেখ বদর আলম ও জালালুদ্দীনের নাম করা যেতে পারে। চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু দরবেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন। আখি সিরাজউদ্দীন, আলাওয়াল হক ও হযরত নুর কুতুবুল আলমের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। খানজাহান (বাগেরহাট), খান গাজী (ত্রিবেণী) ও শাহ ইসমাঈল গাজী একাধারে দরবেশ ও সেনানায়ক ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের এই সব ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান থাকার ফলে বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি রাজসিকতা ও সংকীর্ণতার দোষমুক্ত ছিল। এদিক দিয়ে দেখলে আলীগড়ী ও লক্ষ্ণৌ-এর তমদ্দুন থেকে এর পার্থক্য বিস্তর। এ-সংস্কৃতি মূলতঃ গ্রামীণ ও খুলাফায়ে রাশিদীন ও তুর্কী বীরদের গাঁথা এর মর্মবাণী। রাষ্ট্র তুর্কী ও মুগলপ্রভাব থাকায় যদিও বাংলার সমাজব্যবস্থা ইসলামীরূপে গড়ে ওঠে নি, তবু সমগ্র বাংলাদেশ ও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে তওহীদবাদ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালি মুসলিম তাই একান্তভাবে গণনির্ভর।

জীবনবোধ ও সাহিত্য

বাংলাদেশের সাহিত্যিক সংকট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর পেছনে অনেকগুলো শক্তি কাজ করছে—বিশ্বসাহিত্য সংকট, বাংলাদেশের সাহিত্যের পশ্চিমবঙ্গ মুখিনতা, সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তা, কৃষ্টিধারার বিপর্যয়, সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশ, চিন্তা ও ইতিহাস চেতনার অভাব, পাঠক সমাজের অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও আর্থিক অসচ্ছলতা—এগুলো বাংলাদেশের সাহিত্যে

www.pathagar.com

জনসাধারণের জীবনবোধের অস্বীকৃতির কারণ। এর ফলে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক শূন্যতা, জীবনবোধের অপরিণত উপলব্ধির পলায়নী মনোবৃত্তি ও লক্ষ্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে, তা এ সংকটের জন্যে মূলতঃ দায়ী। আমরা যদি চারদিকে তাকিয়ে দেখি তবে দেখব যে, আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্নই রয়েছে। কিন্তু সে পরিমাণে আমাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি নিতান্ত স্বল্প পরিলক্ষিত হয়। আমরা যদি এ কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি তবে আশা করা যায়, সাহিত্যের এ নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব, এতিম অবস্থা ঘুচে যাবে। মওল্যবোধের ব্যাপারে পরাশ্রয়ী না হয়ে নিজস্ব জীবনবোধের ওপর ভিত্তি করে ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাসকে স্বীকার করে সংগঠনীমূলক ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করা নিছক পুনরুজ্জীবনের (Revivalism) ব্যাপার নয়, যদি তার মধ্যে সুষ্ঠু সমাজ চেতনা, মূল্যবোধ ও সাহিত্যিক প্রতিশ্রুতি থাকে। অনেকে বলেন— 'আমাদের সাহিত্য ও সমাজের ভিত্তি যে ইসলামী হবে তা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, তা নিয়ে এত বাক বিতণ্ডা কেন?' কথাটা সরল মনের পরিচায়ক। কিন্তু সত্যিকারভাবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ও বিচিত্র সমস্যাকে ইসলামের মারফত মুকাবিলা করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারণা ক'জনের আছে? তাই এ-সম্বন্ধে জ্ঞান দান করার অবকাশ শেষ হয়ে যায় নি। কোন জাতি নিজস্ব জীবনবোধকে উপেক্ষা করে প্রগতির পথে বা উজ্জ্বলতাময় সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। সাহিত্যে যা প্রাণবন্ত, তা একান্তভাবে একটি বিশেষ সংস্কৃতির বা যুগধর্মের ব্যাপার নয়, তবু তা সব সময়েই প্রকাশ পায় একটি সংস্কৃতি ও যুগধর্মের মাধ্যমে। একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

আমাদের সাহিত্য সংকট খণ্ডিত জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি সাহিত্যে চশারের পর তথাকথিত ধর্মের কড়াকড়ি যেমন প্রকৃত ধর্ম ও জীবনদর্শনকে খণ্ডিত করেছিল তেমনি বিজ্ঞানত্বের বাড়াবাড়ির ফলে আজ মানুষ খণ্ডিত দর্শনের দাস হয়ে পড়েছে। ফলে সাহিত্যিক মন তার স্বভাব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। গোটা বস্তুসত্তা ও মানসসত্তা প্রতিষ্ঠিত না করলে মহৎ সাহিত্য হয় না। সমগ্র সার্থক সাহিত্যের পেছনে যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, আদর্শ, দর্শন ও জীবনবোধ থাকে তার সম্পর্কে ধোঁয়াটে ধারণা সাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে টলস্টয় তাঁর 'Art' শীর্ষক বইতে (Oxford University Press. 1924, P. 375) বলেন :

'It does not, however need much experience to percieve that man cannot live with chaos that results

www.pathagar.com

when they have no sure chart or general theory by which to steer their college through life. In other words a man is material or spiritual, he has always more or less a religious perception.

আমাদের যে নিজস্ব জীবনবোধ রয়েছে, তার সুস্পষ্ট সাহিত্যিক রূপ দিতে পারলে জীবনের আনন্দ ও সাধারণ সত্যের উপলব্ধি বাদ দিতে হবে না। কারণ আমাদের জীবনদর্শন শুধু বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধিতে নয়, বৈশিষ্ট্যের মাঝেও সম্ভব বৈচিত্র্যের সমারোহ। দুনিয়ার সব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের জ্ঞানাহরণের জন্যে ইসলামী জীবনদর্শনের রয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা। আর ইসলামে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তা নীতিগত, স্বার্থপরতা, নিপীড়ন ও চরমবাদের বিরুদ্ধে তওহীদ ও মানবিকতার উদ্বোধন, বুদ্ধির শাসন—মুক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ নয়।

আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু, কিন্তু তা বহুলাংশে হিন্দু-সাহিত্যের অনুকৃতিমাত্র। মুসলিম-সাহিত্যের এই অনুকরণপ্রিয়তা দূর করে নিজস্ব সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক সাহিত্যে অণুবীক্ষণিক মনের প্রয়োগ চলছে; সুতরাং এ সাহিত্য শাশ্বত সৌন্দর্য বাদ দিয়ে মন-বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত। এ-সাহিত্যে আকস্মিকভাবে অস্পষ্ট জিনিস প্রতিভাত হয়েছে, কিন্তু মানুষের সহজ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি চিত্রিত হয় নি। সাহিত্যের এ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করে সুস্থ সবল জীবনের সহজ প্রকাশ আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। একেত অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার কুয়াশা আমাদের জীবন ও জীববোধের আসল রূপ সম্পর্কে একটা ঘোলাটে ভাব তৈরি করেছে; তাছাড়া ইসলামী সমাজও আমাদের দেশে এতদিন কায়েম হয় নি। কাজেই সাহিত্য, তমদ্দুন ও সমাজের সঙ্গে আমাদের জীবনদর্শনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অপরিসীম। বাঙালি মুসলিমের যে স্বতন্ত্র মানসিকতা, হৃদয়বৃত্তি, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা এবং সংস্কৃতি চেতনা রয়েছে, তার ফলে হিন্দু সাহিত্যিকের লেখা সাহিত্যে কিঞ্চিৎ আনন্দ পাই, কিন্তু সেখানে আমরা নিজেদেরকে খুঁজে পাই না। বাংলাদেশের সাহিত্যে মুসলিম জনসাধারণের মূল্যবোধ, কৃষকের জীবন, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার ও কিসসা-কাহিনী, তওহীদের বাণী ও সংস্কারকে রূপ দেয়াই হবে সঙ্গত ও শোভন। সাহিত্য মুসলিম রূপ লাভ করেও তার বিশ্বজনীন রূপ অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। এ-কথাটা বুঝতে না পেরে আমরা যে সাহিত্য রচনা করেছি; তাতে আমরা অনেকগুলো মুসলিম নামধারী চরিত্রের নামকরণ করেছি; কিন্তু হাটের-মাঠের খাঁটি মাটির মানুষের

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ বড় একটা পাইনি, সংগ্রামী মুসলিমের সন্ধান পাই নি। জাতীয় জীবন ও আদর্শ বিস্মৃত হলে, তথাকথিত সাহিত্যিকের হাতে হয় সাহিত্যের অনাসৃষ্টি। দেশের জনগণের জীবনবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হলে আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিজের প্রতি অশ্রদ্ধ নিয়ে কেউ প্রগতির পথে পা বাড়াতে পারে না। আত্মপরিচয়েই জাতি আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় লাভ করে। জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিছক কল্পনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে না। শুধু কল্পনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হওয়ায় আমাদের সাহিত্য কৃত্রিম হয়েছে ও মানুষের মনের গভীরে রেখাপাত করতে পারে নি। আমাদের সাহিত্যে শুধু বুদ্ধির দীপ্তি থাকলেই চলবে না—সহানুভূতি ও বাস্তবতা এ দ'টোকেই এক সঙ্গে পাওয়া চাই—যার মধ্যে থাকবে সীমাহীন বৈচিত্র্য. এক কথায় জীবনের সমগ্র রূপটি।

বলা বাহুল্য হবে না, আমাদের শিল্প সাহিত্য যেমন একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত, পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণ হবে, তেমনি তা আমাদের জীবনবোধ দ্বারাও শান্তি, সুসংহতি, সুমতি, সংযম ও সর্বাঙ্গীণতা লাভ করবে। তবেই আমাদের সাহিত্য স্বগৌরব ও সৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বল হতে পারবে। অবশ্য জগতের সব দেশের সাহিত্য থেকে তরজমা করে আমাদের নিজের করে নেয়া দোষের তো নয়ই, আমাদের জীবনদর্শন মতে ইবাদতের শামিল বলে মনে করা হয়। ইসলামের মতে সত্য কখনও এক জাতির একচেটিয়া নয়। ('রিসালাতের') নীতিবোধ ও বিশেষ মতবাদ যেমন সাহিত্যিক উৎকর্ষের মাপকাঠি নয়, তেমনি যে সাহিত্যে মানুষের জীবনবোধ প্রতিফলিত হয় না, যা ইতিহাস সম্পর্কহীন তা শুষ্ক, কৃত্রিম ও প্রাণহীন। সাহিত্য হবে আনন্দের বার্তাবাহী জীবন সমস্যার সমাধান, কিন্তু প্রাণহীন সাহিত্য পায় না পাঠক আর পাঠক পায় না সাহিত্য। সেজন্যে কেবল কলাকৈবল্য (Arts for arts sake) জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইতর-রসিকতা ও সস্তা উচ্ছাস দিয়ে আমরা আমাদের হতাশাব্যঞ্জক মৃতকল্প ভাবধারা, আত্মদৈন্য, সংশয় ও অপ্রত্যয় কতদিন আর লুকিয়ে রাখব? আমাদের সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে আমার আরজ এই যে, তাঁরা যেন নিছক ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সাহিত্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের গুণ বা দোষ আরোপ না করেন। কারণ ইসলামী হোক বা মার্কসবাদীই হোক—লেখা ভাল হলেই তা উৎরাতে পারে। তবে জীবনদর্শন হিসেবে কোন সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি আমরা গ্রহণ করব, সেটা স্বতন্ত্র কথা।

বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাষা কি হবে, সে সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা ভাল মনে করি। আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য যে মূলতঃ গ্রামীণ হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জনগণের বোধগম্য ভাষাই এ সাহিত্যে রূপ পাবে। তাদের

www.pathagar.com

জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, প্রতিচ্ছবি তাদের জবানীতে প্রকাশিত হওয়া চাই। সাহিত্যে থাকবে আনন্দের, ইহ্সানের ও মুহব্বতের সবুজ সাক্ষর। জনগণের সে সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান এক সঙ্গে মিশেছে—কিন্তু সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তওহীদবাদ। আমাদের সাহিত্যে যে ভাষা চলতি আছে, তাকে যেমন বাদ দেয়া যায় না, তেমনি হুবহু অনুসরণ করাও নিরাপদ নয়। আমাদের বাড়িতে, দহলিজে, কথা বার্তায় যে ভাষা স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে, সে ভাষার সঙ্গে চলতি সাহিত্যিক ভাষার এক সহজ সমন্বয়েই আমাদের নিজস্ব নতুন সাহিত্যিক ভাষার জন্ম হবে। (এজন্যে অবশ্য আমাদের ভাষাকে অযথা আরবি, ফারসী শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত করতে বলছি না।) এ উদ্দেশ্যে এই নতুন সাহিত্যিক ভাষার পরিভাষা ও অভিধান প্রণয়ন অপরিহার্য। ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে এ ভাষাকে চালু করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকেও যথাসম্ভব এ ভাষার প্রচলন করার প্রয়োজন। সিনেমা ও রেডিও মারফত এ-ভাষাকে জনপ্রিয় করারও বিস্তৃত অবকাশ রয়েছে। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনায় সন্ধানী দৃষ্টি রাখলে এ কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

সঙ্গীত, চারুকলা ও চলচ্চিত্র সম্পর্কেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। হযরতের (সা.) কথা ও জীবনীর সবটুকু (সুবিধামত অংশ বিশেষ নয়) যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব যে, তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত সব শিল্পকলা পরিহার করতে বলেন নি। তিনি স্বয়ং সঙ্গীত ও সৌন্দর্য-প্রিয় ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত যখন মানুষকে কর্মহীন, অলস, সমাজবিরোধী ও নীতিজ্ঞানহীন করে দেয় তখনই তিনি সঙ্গীতের বাড়াবাড়িতে আপত্তি তুলেছেন। আমরা কিন্তু এই বাড়াবাড়িকেই সাধারণ নিয়ম ধরে নিয়েছি। সৎ ও ধার্মিক লোক যে শোভন-সুন্দরভাবে নিজেদের ও অপরের সঙ্গীত-পিপাসা মেটাতে পারেন, এ সম্ভাবনা আমরা একদম বাদ দিয়ে রেখেছি। তার ফলে মানব মনের সাধারণ বৃত্তিকে আমরা নষ্ট করেছি, আর জনসাধারণ কোন রকমে নিকৃষ্ট সঙ্গীত কুড়িয়ে কোন রকমে মনের ক্ষুধা মিটিয়েছে। সঙ্গীতমাত্রই যে ইসলামে হারাম হতে পারে না, তা মুসলিম মরমী সাধকেরা ও ইমাম গাজ্জালী সপ্রমাণ করেছেন। মানুষ অন্য মানুষকে যাতে পূজা না করে, সেজন্যেই রসূলে আকরাম (সা.) মানুষের ছবি আঁকতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু সব শিল্পকে পরিত্যাজ্য বলে মনে করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তারপর আসে চলচ্চিত্রের কথা। চলচ্চিত্রকে একেবারে বাদ দেয়া যায় না—চলচ্চিত্রের সংস্কার করে তার মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি-সাধনার প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষাবিষয়ে চলচ্চিত্রের বিরাট অবদান রয়েছে। টলস্টয় বলেন : 'সব শিল্পকে নিষেধ করা

www.pathagar.com

অসম্ভবকে সম্ভব করার উদ্ভট পরিকল্পনা। শিল্পের অনুপস্থিতিতে মানবজীবন দুঃসহ। তবে ইউরোপের মত যে কোনও আর্টকেই মেনে নেয়া যায় না।'

শিল্প মানুষের আচারকে সুসংহত করে, মানুষের মনের ঐশ্বর্য প্রকাশ করে, সামাজিক সম্পর্ক সুষ্ঠু ও সুসংযত করে, মানবজীবনের বিভিন্ন দিকে রশ্মিপাত করে, ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে ও সামাজিকতার সৃষ্টি করে। শিল্প আমাদের জীবনাদর্শ প্রচারের এক বিরাট হাতিয়ার। শিল্পের মারফত আমরা আমাদের জীবনবোধকে মানুষের মনের পরতে পরতে পৌঁছে দিতে পারি। ইসলামী সমাজগঠনে শিল্পকলার ভূমিকা কোন দিনই অস্বীকার করা যায় না।

সাহিত্যে প্রগতির পথ

সাহিত্যে প্রগতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হল একদিকে মুসলিম জনগণের অহেতুক রোমান্টিক মনোভাব ও অন্যদিকে আধুনিক মুসলিমের শ্লোগান প্রিয়তা। মুসলিম জনগণ মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম শাসক, মুসলিম সাহিত্য চেয়ে এসেছেন যুগ যুগ ধরে, কিন্তু তাঁরা দেখেন নি যে, তাঁদের রাষ্ট্রে, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ সম্যকভাবে রূপায়িত হয়েছে কিনা। আবার আধুনিকেরা মুসলিম জনগণের এ মনোভাবকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে, ইসলামকে বুঝতে, চিনতে ও রূপায়িত করতে অপারগ হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে নিজস্ব জীবনবোধের উপর শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মন্থন করতে হবে। তারপর এই সাধনাকে নিজের জবানীতে স্বতন্ত্রতায় স্বকীয়ত্বের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। সত্য চিরদিনের। কিন্তু সে সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখে নিজের জীবনবোধ ও আঙ্গিকের মারফত প্রকাশ করা চাই। দেশের মাটির আকর্ষণ, ইতিহাসের ধারা ও বিশ্বসংযোগ অক্ষুণ্ন রেখে সংযম ও স্থৈর্যের মারফত জাতির অসীম বাসনা অযুত বেদনা ও অতন্দ্র সাধনা বিকাশ লাভ করবে। মানুষের কাছে যা মূল্যবান কিন্তু বাইরে থেকে চোখে পড়ে না তাকে উদঘাটন করতে হবে। নিজস্ব প্রাণমনকে অবলম্বন করেই হবে আমাদের সৌন্দর্যের ও অমরত্বের সাধনা। এজন্যে ইতিহাস শিক্ষা-প্রণালীর রদবদল করতে হবে। অত্যাচার হিন্দু বা মুসলমানের একচেটিয়া নয়। অজ্ঞানতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে সমাজ জীবন থেকে দূর করতে হবে। জীবনের সাধনায় জীবন গঠনের উপাদানে শরীক হওয়া আমাদের চিরন্তন অধিকার। জগতের জন্যে আমাদের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় নি। মানুষে মানুষে মিলনের আসল বস্তুটি মুখের নয়—বুকেরও। যাঁরাই

www.pathagar.com

সত্য-সুন্দরের অভিসারে যাত্রা করেছেন, তাঁরা যে দেশের বা যে জাতিরই হোন, তাঁদের সবাইকে আমরা যেন সশ্রদ্ধ সালাম জানাতে শিখি। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সংঘাত চলছে, তার ফলে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্র এখন শৃঙ্খলা ও আত্মশক্তি খুঁজে পায় নি, নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু মানসচেতনা জাগে নি। সাহিত্য অতীত নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না, কিন্তু অতীতকে সঙ্গে নিয়েই চলবে। কারণ মানুষের রসবোধ ও জীবনবোধ অতীতের সঙ্গেই যুক্ত। অতীতকে শুধু সংগ্রহ করলে হবে না, তাকে উপলব্ধি করে সাধারণ জীবনে কার্যকরী করতে হবে। সত্য ও কল্যাণের সন্ধান করতে হবে। নিছক অতীতমুখী মানসিকতা ত্যাগ করে, পরম সহিষ্ণুতা ও নিজস্ব জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে সাহিত্যে নতুন মোড় নিতে হবে। নিজেদের প্রচেষ্টার সামান্যতা দেখে যেন আমরা ক্ষুণ্ন না হই। একটি জীবন্ত জাতির জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিও গতিশীল এবং বলিষ্ঠ হতে বাধ্য। কিন্তু এ সহজ সত্য নয়, সাধনা ও অনুশীলনসাপেক্ষ। চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও সংযম চাই। ইসলামের সমগ্রতা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের সামনে, সত্যিকার মুসলিম অন্য জাতিকে ঘৃণা করে না। আমরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির যে পথের কথা বলেছি, সেই পথে চললে বাঙালি মুসলিমের মধ্যে মনীষার ও শক্তিশালী মধ্যবিত্তের আবির্ভাব অসম্ভব-কল্পনা নয়। আমাদের জীবনবোধ অন্ধ গোষ্ঠিবাদ বা একটি ভাষার সীমায় আবদ্ধ নয়। জীবনবোধই মুসলিমকে এক করেছে ও জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। আমাদের জীবনবোধের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সমস্যার সমাধান ও সাহিত্যে তার প্রাণধর্মী প্রকাশ অপরিহার্য। দুনিয়ার সব ভাষার মারফতেই এ জীবনবোধ বিকাশলাভ করতে পারে। অহেতুক আরবি হরফ ও আরবি ফারসী আমাদের জীবনবোধের একমাত্র বাহন মনে করার হীন সংকীর্ণতার ফলে আমাদেরকে চিন্তাশীল লোকদের বিদ্বেষ কুড়োতে হয়েছে।

জীবনের পারিপার্শ্বিকতার দিকে জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে স্বকীয় আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে আমাদের জীবনবোধ ঢেলে সাজাতে হবে। এই জীবন্ত জীবনবোধই হবে আমাদের সাহিত্যের জীয়নকাঠি। মুসলিম মানসের সে ঔদার্য, ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। স্বীয় দুঃখ-কালিমাকে লুকিয়ে না রেখে সেগুলো সাধারণ্যে প্রকাশ করে, অনুশীলন করে, আত্মস্থ হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবেই আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নবজীবন লাভ করে স্বগৌরবে প্রদীপ্ত হবে ও আমরা নতুন পথে অগ্রসর হতে পারব।

www.pathagar.com

গ্রন্থ-সূত্র

১. Cooley. C ; H. : Art, Science and Sociology.
২. আল্-কুরআন ঃ ৯০ ঃ ১২ ; ৪৭ ঃ ৪; ৯ ঃ ৬০।
৩. আল্-কুরআন ঃ ২৪ ঃ ৩৩।
৪. Dozy : History of Muslim Spain, Vol. II.
৫. Wadia : The Message of Muhammad, London, 1922. P. 192, 117.
৬. Dr. James Bonar : Philosophy and Political Economy : London, 1922, P. 45.
৭. R. H. Tawney : Religion and the Rise of Capitalism-এর শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৮. 'আমরা কোন্ পথে' শীর্ষক প্রবন্ধ।
৯. Rabbl, F. : The Origins of the Mussaimans of Bengal, Calcutta, 185, P. P. 106, 47, 53, 63.
১০. Beverley : The Census Report ; 1872.
The Friend of India, October : 11, 1838.
১১. O' Malley : India's Social Heritage. Oxford, 1934.
Risley : The Peoples of India, London, 1915, P. 214. Eastern Anthropologist, Vol. 9, No. 2. III.
Sociologus, 1958, P. 173.
১২. American Journal of Comparative Law, 1957, P. 505, 517.
১৩. Int. to Rodwell's Trann. of the Holy Quran, 1907, P. IX. Sedillot : Historie des Arabe Pans, 1853.
Briffault : The Making of Humanity. P. 202.
Devenport, J. : Muhammad and the Teachings of the Quran, 1945, P. 59.
Syed Ameer Ali : The History of the Saracents.
Lecky : History of Rationalism in Europe. Vol. II. P. 206.
Daper : History of the Intellectual Development in Europe. Vol. I, P. 33.
Hegel : Philosophy of History, New York, 1893, P. 241.
Encylopedia Britannica. Vol. VII, P. 265.
১৪. Albert Champdor : Saladin le Plus Pur H' Ero del' Islam Paris, 1956.
Riesler. J. C. : La Civilisation Arabe. Paris, 1955.

www.pathagar.com

ISBN 984 8747 74 5
9 789848 747745
www.pathagar.com